



দ্য চিটাগং ইউনিভার্সিটি
জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ

THE CHITTAGONG UNIVERSITY
JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES

সংখ্যা ৩৭ ২০২১ • Vol. XXXVII 2021



দ্য চিটাগং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ

**THE CHITTAGONG UNIVERSITY
JOURNAL OF ARTS
AND HUMANITIES**

কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ
Faculty of Arts and Humanities

Vol. XXXVII, 2021, Published in February 2025
সংখ্যা ৩৭, ২০২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এ প্রকাশিত

Published by
Registrar
University of Chittagong

Copyright:
University of Chittagong

Printed by:
MAA Art Press

Cover Design:
Uttam Kumar Barua

Price
Tk. 600.00
US \$ 20.00

ISSN 1993-5536

This journal is an official publication of the Faculty of Arts and Humanities, University of Chittagong. Opinions expressed in the essays are authors'; they do not reflect the views either of the editor or of the university.

দ্য চিটাগং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ
সংখ্যা ৩৭, ২০২১

নির্বাহী সম্পাদক

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক

সম্পাদনা পর্ষদ

- ড. এম.এম. রিজাউল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর জেরীন চৌধুরী, ইংরেজি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর ড. সালমা বিনতে শফিক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর ড. আকিকুল হক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর ড. সাবিনা নাগিস লিপি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চ.বি.
ড. মুহাম্মদ সোলাইমান, সহযোগী, অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চ.বি.
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন ভূঞা, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব শাবনী মল্লিক, সহযোগী অধ্যাপক, আই.এম.এল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর ড. কুন্তল বড়ুয়া, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর জাহেদ আলী চৌধুরী, চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ড. আব্দুল করিম, সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর ড. জ্ঞান রত্ন শ্রমণ, পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ড. লিটন মিত্র, সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ড. ফাওজীয়া ফালেহা সাদিদা, সহযোগী অধ্যাপক, আই.ই.আর. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক, সভাপতি, বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

The Chittagong University Journal of Arts & Humanities

Volume XXXVII, 2021

Executive Editor

Dr. Mohammad Mahbubul Hoque

Members:

Dr. M.M. Rezaul Islam, Department of Bangla

Professor Zareen Choudhury, Department of English

Professor Dr. Salma Bint Shafiq, Department of History

Professor Dr. Akikul Haque, Department of Philosophy

Professor Dr. Sabina Nargis Lepe, Department of Islamic History & Culture

Dr. Mohammad Solaiman, Department of Arabic

Professor Dr. Mohammad Joshim Uddin Bhuiyan, Department of Islamic Studies

Mr. Srabani Mallik, Institute of Modern Languages

Professor Dr. Kuntal Barua, Department of Dramatics

Professor Jahed Ali Chowdhury, Institute of Fine Arts

Dr. Abdul Karim, Department of Persian Language & Literature

Professor Dr. Gyana Ratna Sraman, Department of Pali

Dr. Liton Mitra, Department of Sanskrit

Dr. Faozia Faleha Sadida, Institute of Education and Research

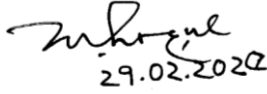
Professor Dr. Mohammad Mahbubul Hoque, Department of Bangladesh Studies.

সম্পাদকীয়

কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের জার্নালের ৩৭তম সংখ্যাটি বাংলা, ইংরেজি, আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত মোট ২১টি প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হলো। প্রবন্ধগুলোর বিষয়বস্তু ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি, নাট্যকলা ও চারুকলা, ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষা এবং ধর্মতত্ত্ব। বর্তমান সংখ্যাটি আমার সম্পাদনায় চতুর্থ অনলাইন (www.jah.cu.ac.bd) সংস্করণসহ প্রকাশিত হলো।

জার্নাল প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণের যথাযথ সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রবন্ধ প্রকাশের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং প্রবন্ধ মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সদস্যদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আরবি বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শায়া'আত উল্লাহ ফারুকী ও ইংরেজি বিভাগের জনাব গোলাম হোসেন হাবীব (জি.এইচ. হাবীব) তাঁদের ব্যতিক্রমী ব্যস্ততার মধ্যেও জার্নাল প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাকে উৎসাহিত করেছেন; তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে। এ জন্য আমি সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে জার্নাল যথাযথভাবে প্রকাশিত হবে।



২৭.০২.২০২৫

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক

নির্বাহী সম্পাদক

দ্য চিটাগং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ, ৩৭তম সংখ্যা, ২০২১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্য চিটাগং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ
The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

সংখ্যা ৩৭, ২০২১ (ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ প্রকাশিত) Vol. XXXVII, 2021 (Published in February 2025)

সূচিপত্র:	পৃষ্ঠা
বাঙালি মননে সুফি প্রভাব ড. এফ. এম. এনায়েত হোসেন	১-১৪
প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতায় ছাপাইশিল্পের চর্চা ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার চারুশিল্পীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার উৎস: মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন	১৫-২৬
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রবৃত্তি আসক্তির নিরাময়: একটি পর্যালোচনা ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন নূরী	২৭-৪৬
সন্ধির ব্যাকরণিক গঠন ও উপাদান বিন্যাস ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ ভূঁইয়া	৪৭-৫৮
কুরআন গবেষণায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভির কৃতিত্ব ড. মুহাম্মদ শফিউল্লাহ কুতুবী	৫৯-৭০
আব্দুর রহমান জামি ও তাঁর হাফত আওরাজ ড. আব্দুল করিম	৭১-৮২
বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: স্কুল ফিডিং কার্যক্রম মোঃ জাকির হোসেন	৮৩-৯৮
মামুনুর রশীদকৃত ওরা কদম আলী: নিম্নবর্গের মানুষের উত্থান শাকিলা তাসমিন	৯৯-১০৬
ভাসের ত্রয়ীনাট্যকৃতিতে বিধৃত সমাজব্যবস্থা ড. লিটন মিত্র	১০৭-১১৮
পঞ্চ মহাযজ্ঞ: সনাতনী সমাজব্যবস্থায় ঋণমুক্তির বিধান রাজপতি দাশ	১১৯-১৩০

বাঙালির ধর্মীয় সংস্কৃতি ও সমন্বয়বাদী ধারা মো: আবু বকর ছিদ্দিক	১৩১-১৪০
মোগল সম্রাটদের কবরে ফারসি শিলালিপি : একটি সমীক্ষা আলতাফ হোসেন	১৪১-১৫৪
সাইমন জাকারিয়ার নাটক সীতার অগ্নিপরীক্ষা: পৌরাণিক চরিত্র সীতার বিনির্মাণ ফারজানা আফরীন রূপা	১৫৫-১৬৪
পরিবেশ নীতিবিদ্যার উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও গুরুত্ব : একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ নাসরিন আক্তার	১৬৫-১৭৬
ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্রে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন নীলকান্ত বিশ্বাস	১৭৭-১৮২
উপকথায় অন্তরিত জনজীবন : প্রসঙ্গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কালকেতু উপাখ্যান' কাকলী পাল	১৮৩-১৯২
New Way of Resolving Fact-Value Dilemma Muhammed Amir Uddin	১৯৩-২০০
Narrative Production of Bilingual Children from Class Three to Class Six: A Comparative Study between English and Bangla Srabani Mallik	২০১-২১৬
منهج جامع البيان في تاويل القرآن للإمام ابن جرير الطبري [“জামিউল বয়ান ফী তাবিলিল কুরআন” রচনায় ইমাম তাবারীর অনুসৃত পদ্ধতি] ড. মোহাম্মদ আমির হোসাইন	২১৭-২২৬
ویژگی‌های ادبیات معاصر فارسی (Features of contemporary Persian literature) ড. মো. নূরে আলম	২২৭-২৩৮
مقاومة العنف ضد المرأة في ضوء الإسلام: دراسة تحليلية ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রতি সংহিংসতা প্রতিরোধ: একটি বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা ড. মুহাম্মদ সোলাইমান	২৩৯-২৪৮

বাঙালি মননে সুফি প্রভাব

ড. এফ. এম. এনায়েত হোসেন *

প্রতিপাদ্যসার: সুফিবাদ ইসলামের মরমী গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং পবিত্র কুরআন হাদিসের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দার্শনিক মতবাদ। আধ্যাত্মিক সত্যের পথে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সুফিবাদের উদ্ভব। এ মতবাদ অনুযায়ী জ্ঞান বা উপলব্ধি বলতে ঐশীপথ নির্দেশক আত্মোপলব্ধিকে বুঝানো হয়। যেসব ধ্যান-ধারণা নিয়ে ইসলামের ইতিহাসে সুফিবাদের আবির্ভাব, সেগুলোর মর্ম ও নির্যাস কুরআন ও হাদিসেই নিহিত। তাই একথা নির্দিষ্ট বলা যায় যে, কুরআনের সঠিক অনুশীলন এবং এ নিয়ে গভীর ধ্যান-অনুধ্যান থেকেই ইসলামী মিস্তিসিজম বা মরমীবাদের উদ্ভব ও বিকাশ। আল্লাহর প্রেম ও ধ্যানসহ সুফিদের অনুসৃত যাবতীয় অনুশীলন কুরআনের পারলৌকিক ও অনুধ্যানিক দিক থেকেই উদ্ভূত। হাদিসে উল্লেখ আছে, “আল্লাহকে তোমাদের এমনভাবে উপাসনা করা উচিত যেন তোমরা তাঁকে প্রত্যক্ষ করছ।” জগতে নিজেদের নিছক আগন্তুক বা পথিক হিসেবে বিবেচনা করার জন্য মুসলমানদের প্রতি মহানবী (স.) নির্দেশ এবং শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের বাইরেও ধর্মের আরও একটি অতিরিক্ত উৎকর্ষের (ইহসান) দিক রয়েছে বলে হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, যা সুফিবাদের প্রতি মহানবী (স.) এর সমর্থনের ইঙ্গিত বহন করে। সুফিবাদ বলতে আমরা জীবন ও মূল্যবোধ বিষয়ক এমন একটি আদর্শকে বুঝব যা কুরআন ও হাদিসে উপস্থাপিত এবং যা মুসলিম জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়সমূহ সেই আদর্শ থেকে বিকশিত। একথা অনস্বীকার্য যে, কুরআনে বিধৃত মূল্যবোধের মৌল ধারণাবলি সুফির জীবনী ও কর্মে প্রতিফলিত যা সাধারণ মানুষের জীবন ও মূল্যবোধবিষয়ক মৌলিক আদর্শকে নির্দেশ করে।

১.১. ভূমিকা:

কুরআনের নীতি ও শিক্ষার ওপর ইসলামী জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠিত। কুরআনে মহান আল্লাহপাক মানুষের জন্য যে আদর্শ আচরণবিধি উপহার দিয়েছেন, তাই পরিচিত ‘শরীয়ত’ নামে। শরীয়ত একটি পূর্ণাঙ্গ আইনব্যবস্থা, যাতে রয়েছে মানুষের গোটা জীবন ও কর্মকাণ্ডের সঠিক দিক নির্দেশনা। মানুষের ইহজাগতিক ও পারলৌকিক, পার্থিব ও ধর্মীয় দিক অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং শরীয়তের লক্ষ্যই হলো এ দুটি দিককে একতাবদ্ধ করে মানব জীবনের ঐক্য ও অখণ্ডতাকে সুরক্ষা করা। বাঙালির কৃষ্টি, সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতি, দর্শন এমনকি রাষ্ট্রীয় চিন্তা-চেতনায় সুফি প্রভাব অপরিসীম। বাংলাদেশের এমন কোনো গ্রাম বা শহর খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে সুফিদের আগমন ঘটেনি বা তাঁদের মাযার শরীফ গড়ে ওঠেনি। ইসলামের ন্যায় ও সুনীতিভিত্তিক সুষম আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপর জোর দেয়া এবং ইসলামী আকীদা মোতাবেক ধনী-গরিব নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনের পথ অনুসন্ধান চালানো সুফিদের কাজের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য, সুফিদের কার্যকলাপ কেবলমাত্র ‘খানকা’র আঙ্গিনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং বাংলার ঘরে-ঘরে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকায় এঁদের প্রভাব ছিল চোখে পড়ার মত। কালেরপ্রবাহে সুফি ভাবধারার সাথে এ দেশীয় সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এমনকি দর্শনের একটি নিবিড় যোগসূত্র গড়ে উঠেছে যা এ দেশের নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতির ওপর প্রভাব ফেলেছে ব্যাপকভাবে। সুফিগণ ইসলামের সূচনাকাল থেকেই কুরআন, সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করছেন এবং তদানুযায়ী নিজেদের আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় মগ্ন থেকেছেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্তিবিচার ও

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীন মতামত প্রকাশের ওপর কুরআন ও হাদীসে যে দ্ব্যর্থহীন তাগিদ দেয়া আছে সুফিগণ সে মতে পুরোপুরি আস্থাশীল থেকে সাধারণ মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করেছেন। এ সব মহা- মনীষীর অনুসৃত নীতি, পথ ও আদর্শ সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির উপাদান হিসেবে বিবেচিত। সুফিগণ আল্লাহকে চেনা, জানা ও তাঁর নিকটবর্তী হবার তাগাদা নিজের মধ্যে অনুভব করেন এবং তাঁর (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের জন্য মাধ্যম অনুসন্ধান করেন (আরো দেখুন-সূরা মায়িদাহ, আয়াতঃ ৩৫)। এ লক্ষ্যে সুফিগণ ভারতীয় উপমহাদেশসহ মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে ইসলামী আকীদা প্রচারে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন এবং খোদার অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত থেকেছেন। কুরআন, রাসুল (স.) এবং পরবর্তীতে হযরত আলী (রা.) এর শিক্ষার মধ্যেই সুফিবাদের মূল অঙ্কুর নিহিত। সুফিবাদের উৎপত্তির ইতিহাসে এ কথা স্বীকৃত যে, হিজরির প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে সুফিবাদের বীজ বপন করা হয় এবং তা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়ে বর্তমানে মানবতাবাদী দর্শনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। সুফিদের মানবতাবাদী আদর্শের কারণে তাঁদের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে এ অঞ্চলের অসংখ্য মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সুফিদের কদর করেন, তাঁদের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশা করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সুফি ভাবধারা বাঙালির সামাজিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনমান উন্নয়নসহ দৈনন্দিন কাজকর্মে কতটুকু প্রভাব ফেলেছে তার আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।

১.২. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

সুফিবাদ কথাটির সরল অর্থ হচ্ছে ‘ইসলামী মরমীবাদ’ ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ‘ইসলামিক মিস্টিসিজম’। ইসলামের দুটি দিক যথা- বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিন। প্রথমটি শরীয়তের বিধি-বিধান সম্বলিত এবং পরেরটি তরিকতের বিধি-বিধান সম্বলিত। ইসলামের অভ্যন্তরিন দিককে বলা হয় ‘তাসাউফ’, যা ইসলামের আধ্যাত্মিক সাধনার পরিচয় বহন করে। এই তাসাউফ তত্ত্বকেই বলা হয় সুফিতত্ত্ব বা সুফি দর্শন। সুফিবাদ কুরআন ও হাদিসের নির্ধারিত থেকে প্রতিষ্ঠিত এবং এটি আল্লাহর পথে সাধারণ মানুষকে পরিচালিত করার একটি সহজতর পথ মাত্র (আরো দেখুন- আল-কুরআন, ২৫:৬৯; ৫৩:৫৭)। এর চর্চা, অনুশীলন এবং প্রয়োগ মূলত নবী-রাসুলদের মাধ্যমেই সুপ্রতিষ্ঠিত। কালক্রমে এ ভাবধারা বাংলাদেশেও অনুপ্রবেশ ঘটে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার বহু পূর্ব থেকেই। উল্লেখ্য, এ অঞ্চলে প্রবর্তিত ও প্রচারিত সুফিবাদ মূলধারার ইসলাম থেকে অনেকটা সরে গেছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করে সে আলোকে জীবন গঠন ও ধর্মাচার পালনের সাথে সাথে দেশীয় নানান আচার ও অনুষ্ঠানাদী যুক্ত হয়েছে এ অঞ্চলের সুফিদের কর্মকাণ্ডে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ অঞ্চলের অনেক সুফি-সাধক ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এ দেশীয় সমাজ-সংস্কৃতি, সভ্যতাকে লালন করেছেন। ক্ষেত্রবিশেষ, তাঁদের কর্মকাণ্ড খোদাপ্রেমের পরিবর্তে সাধারণ মানুষের মনে নানান প্রশ্নের উদ্বেক করেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত সুফিদের আস্তানায় আগত ভক্তদের কর্মকাণ্ড যেমন, কবরে সিজদাহ করা, বিভিন্ন ধরনের মানত করা, গুরুর (সুফি) সান্নিধ্য লাভে উপোস (না খেয়ে) থাকা, রোগ-ব্যাদি, মহামারি থেকে রেহাই পাবার লক্ষ্যে গুরুর মাযারে বিভিন্ন উপঢৌকন দেয়া ইত্যাদি কর্মকাণ্ড মূল ইসলামিক সুফি ভাবধারা থেকে আলাদা। অর্থাৎ এ অঞ্চলে অনুসৃত সুফি অনুসারীদের এ সব কর্মকাণ্ড সুফিবাদের মূল শিক্ষা থেকে অনুসৃত নয়। বর্তমান প্রজন্মের উচিত সুফিবাদের মূল উৎস কুরআন ও হাদিসের মূল শিক্ষা গ্রহণ করে জীবন পরিচালনা করা; যাতে করে মানুষ খোদাপ্রেমে মশগুল হয়ে আল্লাহর সাথে মহামিলন ঘটাতে পারেন। এ দর্শন এ দেশের মাটি ও মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে এ অঞ্চলের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে অনাড়ম্বর, বিলাসী জীবন পরিহার এবং ইহজাগতিক অনাসক্তির প্রতীক ‘সুফি’দের প্রভাব বাঙালির সমাজ জীবনকে কতটুকু প্রভাবিত করেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। সুফিদের সমাজ ভাবনার ফলে ব্যক্তি, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা,

দর্শনচর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালির যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সূচিত হয়েছে তাও উল্লেখ করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। সুফিগণ ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি এ অঞ্চলে ভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী, দেশপ্রেমিক, মানবতাবাদী সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা করে বাঙালি মননে যে অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ঘটিয়েছেন যা এ অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলছে বলে সুধী মহল মনে করেন।

১.৩. গবেষণা পদ্ধতি:

আলোচ্য প্রবন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য ঐতিহাসিক পদ্ধতি (historical method) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে গবেষণা সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট বই, পুস্তক, জার্নাল, স্মারকগ্রন্থ, সুফিদর্শনের উপর বিভিন্ন নিবন্ধমালা ও বক্তৃতামালা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণী পদ্ধতি (analytical method)র সাহায্যে বিশ্লেষণ করে এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রবন্ধটিতে গুণগত (qualitative) পদ্ধতি অনুসরণেরও প্রয়াস রয়েছে।

১.৪. সমকালীন বিশ্ব সংকট ও সুফিবাদ:

সমকালীন বিশ্বজুড়ে যে বহুমাত্রিক সংকট বিরাজ করছে তার মূলে যতটা না আর্থ-সামাজিক কারণ রয়েছে তার চেয়ে দার্শনিক চিন্তার দৈন্যই বেশি দায়ী বলে মনে করা হয়। কারণ বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্র বিরাজ করছে দর্শনহীনতা। সমাজজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সমগ্র উপলব্ধিতে দর্শনহীনতা কাজ করছে যুগপৎভাবে। মানুষের মানবিক ও নৈতিক চেতনার উন্মেষে সুফি নির্দেশিত মত ও পথের কোনো বিকল্প নেই। এ পথ মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের বার্তা বহন করে; সুফিবাদই মানবতা, মনুষ্যত্ব ও মানবপ্রেমের প্রধান শক্তি বলে বিবেচিত হয়। একথা অনস্বীকার্য যে, মানব মনের আনন্দানুভূতি ও প্রশান্তি জাগাতে না পারলে আধ্যাত্মিক উন্নতি একেবারেই অসম্ভব। এজন্য প্রয়োজন দার্শনিক মানসিকতার পরিচর্যা তথা সুফি দর্শনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটানো। সুফিবাদ ইসলামের অন্তর্নিহিত ও আধ্যাত্মিক মরমী প্রবনতার এক স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। অন্তরের অনুভূতির মাধ্যমে পরমসত্তাকে জানার অদম্য স্পৃহাই সুফি দর্শনের মূলসূর। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনই এ দর্শনের মূল কথা। সুফিদের আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনার অগ্রগতির সাথে সাথে মানবিক ও নৈতিক উন্নয়নকেও প্রাধান্য দেয়া হয়, যা বাস্তবিক ও সার্বজনীন মানবকল্যাণ হিসেবে স্বীকৃত। সত্য, সুন্দর, কল্যাণ, কলুষমুক্ত আদর্শ ও নৈতিক চেতনাময় জীবন গড়ে তোলার উপর এ দর্শন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। ইতিহাসের আলোকে বলা যায়, বাংলা ভূ-খণ্ডে সুফি-দরবেশদের আগমন ঘটেছিল প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবদ্দশায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিবেদিত সাহাবীগণ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীতে অসংখ্য সুফি-দরবেশ আরব, পারস্য ও মধ্য এশিয়া থেকে শুধু ইসলাম প্রচারের মহতী আকাজক্ষাকে ধারণ করে স্বদেশ ও স্বজনদের মায়া ত্যাগ করে অচেনা অজানা দেশের দিকে যাত্রা করেন। তাঁদের অনেকেই এসে পৌঁছেছিলেন আমাদের এ ভূখণ্ডে। পরবর্তীতে এসব গউস, কুতুব, সুফি, অলি-আউলিয়াদের সাথে এ অঞ্চলের মানুষের এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ অঞ্চলের শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষ সুফি ভাবাদর্শে পেয়েছে সাম্য, শান্তি, উদারতা ও মানবিকতার উজ্জ্বল আদর্শ। এভাবে সুফিরা ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের নানাবিধ কুসংস্কার ও সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিয়ে অতি সহজেই তাদেরকে আপন করে নিতে পারতেন। বিনিময়ে সাধারণ মানুষও এসব মনীষীর ধ্যান-ধারণা, আদর্শ ও দর্শন গ্রহণ করে তাঁদের দেখানো জনকল্যাণমূলক জীবনব্যবস্থা তথা মানবকল্যাণের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। সুফিদের আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনার ফলে কীভাবে এদেশের মানুষের সামাজিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধিত হয়েছে তার প্রাতিষ্ঠানিক অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবী জুড়ে যে নানাবিধ সঙ্কটের

কথা বলা হচ্ছে, যে নামেই এসব সঙ্কটকে অভিহিত করা হোক না কেন এবং তা যেকোনো পরিসরেই হোক না কেন তাকে আমরা চিন্তার দৈন্য বা দার্শনিক দারিদ্র্য বলেই অভিহিত করব। এ দারিদ্র্যতার মধ্য দিয়েই সমকালীন মানুষ তার নিজেকে অন্তঃসারশূন্য, বিবেকশূন্য অপ মানুষে পরিণত করেছে। আর এ কারণে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্র লক্ষ্য করছি শূন্যতার অন্তর্জ্বালা। এ বাস্তবতা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য প্রয়োজন জীবনের প্রতিটি স্তরে সুফিতাত্ত্বিক মানসিকতার অনুশীলন। অর্থাৎ মানুষের সামাজিক সম্প্রীতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি, নৈতিক ও মানবীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সুফি প্রবর্তিত দর্শন হতে পারে একমাত্র পাথের।

প্রথাগত উদ্দেশ্যবাদ কিংবা উপযোগবাদী দর্শন এ বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তা ইতোমধ্যে বিশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ উদ্দেশ্যবাদ কিংবা উপযোগবাদী দর্শনে আমরা লক্ষ্য করি মানবজীবনকে বিধিবদ্ধ শর্তের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার প্রচেষ্টা। উদ্দেশ্যবাদ নিরেট বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে প্রলুপ্ত করে মানুষকে ইচ্ছাবৃত্তির দাস বানিয়ে রাখে। আর উপযোগবাদ ভোগ ও সমৃদ্ধিকে সর্বোচ্চকরণের প্রয়াসে মগ্ন থাকে। এভাবেই মানুষ জড়িয়ে যাচ্ছে ইচ্ছা ও কামনার বেড়াজালে। অথচ, নতুন নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রত্যায়ণ আমাদের উদ্দীপ্ত হওয়া উচিত। উপযোগবাদ তথা উদ্দেশ্যবাদের দুই শৃঙ্খলে তা অবাস্তব হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়েই সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃতি ঘটছে বি-মানবিকীকরণের। আর সমকালীন এ বৈশ্বিক সংকটের পেছনে কাজ করছে এই বি-মানবিকীকরণ। এই বি-মানবিকীকরণের প্রয়াসে রয়েছে ক্ষমতার অভীক্ষা। সুফিবাদ আমাদেরকে আত্মশুদ্ধি অনুশীলনের মাধ্যমে এই বি-মানবিকীকরণের রোষানল থেকে মুক্ত করতে সক্ষম।

১.৫. বাঙালির ভাবাদর্শে সুফি দর্শন:

বাংলাদেশ পীর-আউলিয়াদের ধর্ম প্রচারের অন্যতম ক্ষেত্রভূমি বলে বিবেচিত। এদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান বলে ইসলামী মূল্যবোধ এদের অন্তরে বেশি প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। কাজেই, এ বিশাল জনগোষ্ঠী ইসলামী আকীদার প্রতি বিশ্বাসী থেকে জগতের সব জিজ্ঞাসা ও সব সমস্যার সমাধানে ইসলাম নির্দেশিত পন্থার অনুসন্ধান চালায়। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, ‘আমি আপনাকে (মহানবি স.) পাঠিয়েছি মানব জাতির পথ প্রদর্শক হিসেবে, যাতে পথহারা মানুষ পথ খুঁজে পায়’ (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৩৪:২৭ এবং ৩৯:২১; সূরা আল মায়েদা, ৫: ২০)। আর মহানবী (স.) এর আদর্শ এমন এক সর্বব্যাপী কালজয়ী আদর্শ যা মহাপ্রলয় দিবসের পূর্ব পর্যন্ত কখনো যার আবেদন লোপ পাবে না। বিশ্ব যতই আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে ততই নতুন নতুন জিজ্ঞাসা ও সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। বাহ্যত কুরআন ও মহানবী (স.) এর সুন্যাহ’য় আধুনিক এ সব বিষয়ের সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য না থাকলেও এমন অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য ও ইঙ্গিত তাতে রয়েছে যার দ্বারা গোটা বিশ্ব উজ্জীবিত হয় কুরআন ও মহানবী (স.) এর সুন্যাহর আলোকে; ঈমান ও আমলের এক স্বতঃস্ফূর্ত ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে। ইসলামে এ প্রক্রিয়াকে ‘ইলমে তাসাউফ’ বলে বিবেচনা করা হয়। ইসলামের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই মতের কার্যকারিতা ইসলামকে কালজয়ী ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে এ আশাবাদ আমাদের সকল মুমিন মুসলমানের (Dasgupta ৩৩-৩৯)।

বাংলাদেশের এমন কোন অঞ্চল খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে বেশ পুরোনো পীর আউলিয়াদের মাযার বা মসজিদের অস্তিত্ব নেই। আর এসব পুরোনো জীর্ণ-শীর্ণ মসজিদ বা মাযার প্রমাণ করে যে এদেশে পীর-দরবেশ বা সুফিদের অবাধ যাতায়াত ছিল। এদেশের সর্ব পশ্চিম প্রান্ত থেকে সুদূর পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত এবং উত্তর থেকে সমুদ্র তীরবর্তী দক্ষিণ ভাগ পর্যন্ত সর্বত্রই পীর, ফকির, আউলিয়া ও সুফি সাধকদের প্রভাব ছিল চোখে পড়ার মত। এ সকল সুফি- দরবেশগণ ইসলাম প্রচারের ভিত্তি হিসেবে অনুন্নত গ্রামগুলোকে বেছে নিয়েছিলেন এবং এসব নিভৃত গ্রামগুলোতে বিচরণ করে ইসলামের বাণী প্রচারে ছিলেন অধিক যত্নবান। সুফি প্রভাব শুধু সাধারণ জনগণের উপরই পড়েনি, বরং এর প্রভাব ভবঘুরে ভিক্ষুক থেকে শুরু করে রাজ্যের বাদশাহের প্রাসাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (চট্টোপাধ্যায়

৪৯)। শত শত লোক প্রতিদিন পীর, দরবেশ, সুফিদের মাযার যিয়ারত করে। সুফিদের প্রভাব শুধু তাঁদের জীবদ্দশাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, বরং সুফি-সাধকদের ইন্তেকালের পরও তাঁদের আধ্যাত্মিক প্রভাব বাঙালির মনে রেখাপাত করেছে। এ প্রভাবই বাঙালিকে আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করতে অধিক সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান হওয়ায় তাঁদের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহে, কাজকর্মে, ইসলামী ভাবধারায় সুফি নির্দেশিত মত ও পথের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ এবং রাসুলের প্রতি সুফিদের বিশ্বাস অকাট্য। আধ্যাত্মিক শক্তির এ বিশ্বাসই মানুষকে আল্লাহপ্রেমে আকৃষ্ট করে সাধারণ মানুষকে সুফি-সাধকের কাতারে নিয়ে যায়। তাছাড়া বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে-মানুষে সহমর্মিতা গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা সুফি দর্শনের অন্যতম দিক। এ দর্শন এ দেশের মাটি ও মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে মিশে এ অঞ্চলের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি বিরাট অংশ দখল করে আছে। যদিও বাংলাদেশে সুফির কখনো সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে আবার কখনো অত্যাচারী শাসকদের রোষানলেও পড়েছে। এতদসত্ত্বেও এ দর্শন মুখ খুবড়ে না পড়ে বরং স্ব-মহিমায় ভাস্বর হয়ে নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলছে। এ প্রবন্ধে অনাড়ম্বর, বিলাসী জীবন পরিহার এবং ইহজাগতিক অনাসক্তির প্রতীক 'সুফি'দের প্রভাব বাঙালির সমাজ জীবনে কতটুকু ছাপ ফেলেছে তার একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। সুফিদের সমাজ ভাবনার ফলে ব্যক্তি, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, দর্শনচর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালির যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সূচিত হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে; যা এ দেশ ও জাতির সামাজিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক উন্নতির ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। সুফিগণ ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি এ অঞ্চলে সংগ্রামী দেশপ্রেমিক, মানবতাবাদী সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যা গবেষণার দাবী রাখে। যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করলে সুফি নির্দেশিত দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুফি দর্শন অনুশীলনে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও শহর অঞ্চলের মানুষের মনে যে অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং সে উন্নয়ন যে দেশের সমাজ-সংস্কৃতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে তারও একটি মূল্যায়ন রয়েছে এ প্রবন্ধে।

সুফি-সাধকগণ এমন একটি মানবিক ও প্রীতিময় সমাজ উন্নয়ননীতি গ্রহণ করেছিলেন যেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রকৃত অর্থে কল্যাণকর চিন্তা এবং ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা যথাসম্ভব রূপায়িত আছে। আমাদের বিশ্বাস, সুফিদের দেখানো নীতি ও আদর্শ গ্রহণ করে মানুষ যদি অনাসক্ত জীবনের মাঝে মহা আনন্দ খুঁজে পাবার প্রয়াসী হয় তাহলেই কেবলমাত্র ইসলামের এই 'তাসাউফ' ব্যবস্থা দেশ, সমাজ ও জাতির পারমার্থিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এভাবে দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা এমনকি সমাজ ব্যবস্থায়ও ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন ঘটবে বলে আমরা আশা করি। মানুষ সুফিদের নির্দেশিত জীবনব্যবস্থা অনুশীলনের মাধ্যমে কাজক্ষিত শান্তির চূড়ায় (আল্লাহ প্রেমে বিভোর) পৌঁছাতে পারে বলে আমরা মনে করি। তাছাড়া, বর্তমান সংঘাতময় বিশ্বে সুফি দর্শন যে মানুষের মনে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে পারে এ দিকটিকে বিবেচনায় নিয়ে সুফি দর্শনের মূল ভাবনাগুলোকে সংক্ষেপে প্রকাশ করলে দাঁড়ায়:

- মানুষের মনে আল্লাহ প্রেম সৃষ্টি করা;
- সকল মানুষকে মানবতা, ধৈর্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা;
- জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা;
- সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমে কীভাবে সমাজ শান্তির আবাসস্থলে পরিণত হতে পারে তা উদ্ভাবনে কার্যকর পন্থার নির্দেশ দেয়া;
- সুফি নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে কীভাবে ইহজাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ অর্জিত হতে পারে তা তুলে ধরা;

- সুফিদের ন্যায়, সুনীতি, সত্যনিষ্ঠা, কল্যাণবোধ ও আদর্শবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসব গুণ কীভাবে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে তা তুলে ধরা এবং
- সৃষ্ট মানুষ ও মহান স্রষ্টার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সুফি নির্দেশিত পন্থার অনুসন্ধান চালানো (Hoque ২৭-৩৫)।

মানুষের মানবিক ও নৈতিক চেতনার উন্মেষে সুফি নির্দেশনাসমূহ যে শুধুমাত্র কল্যাণ ও মঙ্গলের বার্তা বহন করে তা-ই নয় বরং মানবতা, মনুষ্যত্ব ও মানবপ্রেমের প্রধান সহায়ক হিসেবেও কাজ করে। সমাজকে গতিশীল ও কার্যকর করা; সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং রাজনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে সুফি ভাবধারা দেশের সকল শ্রেণির সমাজব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতি সাধন করতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। কাজেই বলা যায়, দেশের সকল শ্রেণির মানুষের সামাজিক জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাঁদের কাজিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা যোগানোও সুফি কর্মকাণ্ডের আওতাভুক্ত। সুফিগণ কেবলমাত্র ধর্মপ্রচার বা পরম সৃষ্টিকর্তার প্রতি ব্যক্তিগত বিশ্বাস স্থাপনের মধ্যেই তাঁদের কর্মকাণ্ডকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং সাধারণ মানুষের আত্মিক শান্তি ও নৈতিক উৎকর্ষের প্রতি যেমন সজাগ দৃষ্টি দিতেন তেমনি সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা এমনকি শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ছিলেন বেশ সচেতন। এঁরা মানুষকে শান্তির বার্তা দিয়ে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে মানব জাতিকে আহ্বান করে নূরের দিকে পথ দেখান (আরো দেখুন-আল-কুরআন, ২৪ঃ৩৫)।

১.৬. সুফিদের কর্ম ও দর্শনের তাৎপর্য অনুসন্ধানে জিজ্ঞাসা:

সুফি-সাধকদের কর্ম ও জীবন দর্শনের মধ্যে রয়েছে মানব জাতির কল্যাণের মহামন্ত্র (Shah ৬৩-৩৯)। সুফি ভাবধারা অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষ লোভ-লালসা, কৃপণতা, লোক দেখানো ইবাদত, আত্ম-অহংকার, নিজ ইচ্ছার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি মন্দ গুণগুলো পরিহার করে সদগুণ অর্জনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পারিবারিক সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি এমনকি আত্মার পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এভাবে যুগে যুগে সুফিরা ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় শান্তির বার্তা নিয়ে মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে গেছেন; জাগতিক সুখ-ভোগ ত্যাগ করে প্রেমময় আল্লাহর দাসত্বে আত্মসমাহিত হয়ে নিঃস্বার্থ জীবন-যাপনে মশগুল থেকেছেন (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ৪২১-৪২৭)। সুফিদের কর্ম ও দর্শনের তাৎপর্য অনুসন্ধানে প্রশ্নসমূহ নিম্নরূপ-

- i) সুফিদের দেখানো সমাজচিন্তা ও সমাজদর্শন কীভাবে বাঙালির পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় জীবনকে প্রভাবিত করেছে?
- ii) সুফি- পীর- দরবেশ- আউলিয়ার সৎ, ন্যায়- নীতিবান আদর্শ ও ন্যায়পরায়ণ কর্মকাণ্ড কীভাবে আমাদের নৈতিক ভিতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে সমাজ প্রগতিতে ভূমিকা রাখছে?
- iii) সুফিদের মরমী প্রবনতা, অনুধ্যানিক অনুশীলন কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও ইসলাম প্রচারে কার্যকর প্রভাব ফেলেছে?
- iv) একনিষ্ঠ সাধনাবলে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে নিবিড়তম প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনে মানুষের পথপ্রদর্শক হিসেবে সুফিরা কীভাবে আধ্যাত্মবাদী কর্মকাণ্ড করে চলেছেন?
- v) সুফি ভাবধারা কেবলমাত্র নির্জন লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং এটি কীভাবে আমাদের সমাজ সংস্কারে একটি জীবন্ত আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে?
- vi) সাম্প্রদায়িক হানাহানির পরিবর্তে অসাম্প্রদায়িক দর্শনকে ধারণ করে মানুষের সামাজিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সুফি-সাধক ও আলেম সমাজের তৎপরতা কী?

- vii) আত্মার শুদ্ধ অনুশীলনের মাধ্যমে বাহ্য ও অন্তর আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে ঐশী সত্তার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে চিরন্তন শান্তি সুফিমতে কীভাবে সম্ভব?
- viii) শান্তি তথা বিশ্বশান্তির পথে অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে সুফিদের দেখানো নীতি ও আদর্শসমূহের বাস্তবায়ন কী আদৌ সম্ভব? এবং
- ix) বিশ্বশান্তির সমস্যার সমাধানে সুফিবাদ কী কোনো ভূমিকা রাখতে পারে?

১.৭. মানবিকতা শিক্ষায় সুফিবাদ:

সুফিদের মানবিকতার আর্তি, অহিংসনীতি এবং জাত-পাত ভেদাভেদ মুক্ত জীবনদর্শন এ এলাকার নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে প্রভূত সাড়া জাগাতে সক্ষম (লুইস ৩৬-৪২)। মনুষ্যত্ব, সম্প্রীতি, সৌহার্দের অমোঘ বাণী নিয়ে সুফিরা বঙ্গে শান্তির দূত হিসেবেই কাজ করেছেন। সুফি প্রভাবেই বাঙালি সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণ-তোষণের বিরুদ্ধে চৈতন্য দেবের হাত ধরে ‘বৈষ্ণববাদ’ নামে আরও একটি মানবিক ধর্মের বিকাশ ঘটে। বৈষ্ণবদের কাছে প্রেম বা ভক্তি ছিল ‘সর্বাত্মক মিলনের’ প্রতিচিহ্ন। এই প্রেমবাদের জোরেই বর্ণাশ্রিত ধর্মের ধারক-বাহক ব্রাহ্মণ্যদের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবদের ঘোষণা ছিল-

“বৈষ্ণবদের জাতিভেদ করিলে প্রমাদে
বৈষ্ণবের জাতিভেদ নাহিক সংসারে।”

এরকম অভিব্যক্তি মনুষ্যত্বের দর্শনকেই প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং সুফি প্রভাবের বাঙালি ধারাটি সমকালীন বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠায় একটি আদর্শ হতে পারে। মানুষ যখন ষড়রিপুর জটিল-কঠিন বলয় থেকে কঠোর ধ্যান ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা নিজেকে অবমুক্ত করতে পারে, তখন তিনি সাধারণ্যে পরিচিতি লাভ করেন সাধারণ মানুষ বা আধ্যাত্মিক মানুষরূপে; এঁরাই হলেন আধ্যাত্মিক সাধক বা সুফি, যারা ছিলেন উদারনীতির ধারক ও বাহক। সমকালীন বিশ্বশান্তির আরেকটি শর্ত হলো ক্ষুধা নিবারণ ও দারিদ্র্যতা নিরসন। প্রতিদিনের পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ খাদ্য গ্রহণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অপুষ্টি, অখাদ্য, নিম্নমানের খাদ্য ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বজনগোষ্ঠীর এক বৃহত্তর অংশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৩ সালে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (WHO) ৯৩ টি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও পুষ্টিহীনতার যে তালিকা তৈরি করেছে তা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এ সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরকম দূর্বিষহ অবস্থার মুখোমুখি আজ বিশ্ব সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে। বঙ্গে সুফি আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে প্রথম যে শর্তটির উপর তারা গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো এ অঞ্চলের অনাহারে, অর্ধাহারে থাকা মানুষের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা। ‘খানকাহ’ ছিল এ খাদ্য সরবরাহের প্রধান কেন্দ্রস্থল। অনাহারে, অর্ধাহারে থাকা মানুষের খাদ্যের যোগান দেবার জন্য তাঁরা বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন। সুফিদের এ প্রচেষ্টা সমকালীন পৃথিবীর শান্তি অন্বেষণে ও মানুষের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নীতিবোধ, শ্রেয়বোধ, মূল্যবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার মাধ্যম হিসেবে সুফিবাদ এ অঞ্চলের শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদেরকে একধাপ এগিয়ে নিয়েছে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক ন্যায় হিসেবে সাম্য, সমতা ও পক্ষপাতহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, মানুষের নিশ্চিত জীবন-যাত্রার প্রতিশ্রুতিকে উর্ধ্বে তুলে ধরার দায়িত্বটি কেবল সুফিদের দেখানো পুণ্যতর জীবনচর্চার ও মননশীলতার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব (Sharif ১৯-২৬)।

১.৮. সামাজিক কর্মকাণ্ডে সুফি প্রভাব:

বাংলার আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠা সুফি দরবেশদের খানকাগুলো ছিল সাধারণের আধ্যাত্মিক উন্নতি, ধর্মীয়চর্চা এবং মানব কল্যাণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। এগুলো বাংলার জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। সুফিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলার হিন্দু সামাজ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সুফিদের প্রভাবে যখন অমুসলিমরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করলো, তখন বাংলার আকাশে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। তিনি সুফিদের ন্যায় 'একেশ্বরবাদনীতি'তে আস্থাশীল হয়ে মানবতাবাদী দর্শন প্রচার করেছেন (সূরা মুতাফফিকীন, আয়াত-৩:১৩; ৬:২; সূরা আনকাবুতে, ২৫:৬৯)। সুফিরা আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি মানবকল্যাণ তথা সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করে গেছেন। এঁরা এদেশের দুস্থ, পীড়িত, নির্যাতিত মানুষের দুঃখে ব্যথিত হয়েছেন, নিরাশ ও মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চার করেছেন ও ব্যথিত হৃদয়ে সহানুভূতি দিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। সুফি-সাধকগণ খানকা শরীফ নির্মাণ, মসজিদ নির্মাণ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মক্তব, এতিমখানা প্রভৃতি নির্মাণের মাধ্যমে সমাজে আজও তাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন। নিম্নে দু'একটি উদাহরণের মাধ্যমে এ বিষয়ে আরও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশে বিস্তৃত সুফি দরবেশদের অধিকাংশই ছিলেন আলেম। তাঁরা খানকার পাশে মসজিদ বা মক্তব প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষদেরকে ধর্ম শিক্ষায় মনোনিবেশ করার চেষ্টা করেছেন আলম, (শফিকুল ১১১-১২৩)। খ্যাতিমান হানাফী ফকির ও সুফি-সাধক কাযী রুকনুদ্দীন উত্তরাঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণকে ধর্ম শিক্ষায় দীক্ষা দেবার আশ্রয় চেষ্টা চালান। এছাড়াও শাহ মখদুম রূপোস, হযরত শাহ দৌলা, হযরত শাহ জালাল(র.), হযরত শাহ পরাগ(র.) প্রমুখ এতদঞ্চলে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা স্থাপন করে হিংসা, ঘৃণা, নৈরাজ্য, শোষণ-বঞ্চনা এসব কিছু বিপরীতে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতিতে মগ্ন থেকেছেন। পরম শান্তির লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য প্রয়োজন জাগতিক শান্তিকে পাকাপোক্ত করা। আর জাগতিক শান্তির পথ ধরেই আসে পরম শান্তি। ব্যক্তির সর্বোচ্চ বিকশিত বাস্তবতা 'মূল্য ও আদর্শ' এ শান্তির পথেই ত্বরান্বিত হয়। সুতরাং শান্তি, প্রেম, আধ্যাত্মিকতা- এই তিনটি মাত্রা সুফিবাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত বলে এ আদর্শ হতে পারে সমকালীন বিদ্রোহ ও অশান্তি নির্মূলের প্রধান হাতিয়ার যা অনুসরণে আল্লাহর কৃপা লাভ করা সম্ভব (আরো দেখুন-আল কুরআন ৩ : ১৩২-১৩৪)। কথিত আছে যে, শাহ মখদুম রূপোস এ অঞ্চলের এক হতভাগা পিতাকে অর্থ সহায়তা করে তার সাতটি কন্যা সন্তানের বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন।

হযরত শাহ সুফি আবদুল লতিফ চট্টগ্রামের আমানটুলী গ্রামে বিশ্ব দরবার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি দুঃখী মানুষের সেবায় নিয়োজিত থেকেছেন। হযরত শাহ সুফি তাজ ইসলাম একটি মাদ্রাসা স্থাপন করে এতিম ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষার উপকরণ সরবরাহসহ যাবতীয় খরচ বহন করে গেছেন। হযরত মাওলানা শাহ সাহেব একজন প্রখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন। আজীবন তিনি আল্লাহর সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত থেকেছেন। তিনি বিড়াল কুকুরের মতো নীচু প্রাণিকেও আহার দিয়ে সেবা করতেন (মজিদ ১৮-২৬)। তিনি দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় শতাধিক অনাথ ও দরিদ্র বৃদ্ধার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করে গেছেন। পাক-ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন সুফি-সাধক আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি এলাকার দরিদ্র, বিপন্ন, অভাবগ্রস্ত মানুষের অভাব অনটনে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে সমাজ সেবায় অবদান রেখে গেছেন। কোনো কোনো সুফি এলাকার রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেছেন।

বড় পীর শাহ সুফি হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র) আধ্যাত্মিক কাজ-কর্মের পাশাপাশি দুঃস্থদের বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। কথিত আছে যে, তিনি এলাকায় মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তাঁর শিষ্যদের

মাধ্যমে অভাবগ্রস্ত মানুষকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতেন। তাঁর উদার মহানুভবতার কথা আজও মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। এছাড়াও বিভিন্ন সুফি-সাধক সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। অনেকে পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায়, গ্রামে-গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে নগদ অর্থ ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন (Macdonald ৮১-৮৭)। গবীর, দুঃখী মানুষকে স্বাবলম্বী করার জন্য কোন কোন সুফি বিভিন্ন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা, কৃষিকাজে প্রশিক্ষণ, সেচ প্রকল্পের অনুমোদন, টেইলারিং, হেয়ার কাটিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কার্পেটিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বুক বাইন্ডিং প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এসব সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সুফি-সাধকগণ সাধারণ মানুষের হৃদয়ে তাঁদের অবস্থান মজবুত করতে সক্ষম হয়েছেন (সাকলায়েন ১৯-২৯)।

সুফিবাদ শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করে। বিগত দুইশ' বছরের দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা সম্ভব না হলেও সুফি ও তাঁদের অনুশীলনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন। সামাজিক জীবনে মানুষ শুধু বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করে না। দার্শনিক চিন্তার বিবর্তনে অস্তিত্ববাদী প্রয়াস এ কারণে দাবী করে: 'বেঁচে থাকা' (to live) এবং 'অস্তিত্বসম্পন্ন হওয়া' (to exist) এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এখানেই নিম্নতর প্রাণির সাথে মানুষের পার্থক্য স্পষ্ট। মানুষ শুধু বেঁচে থাকে না, তার মধ্যে রয়েছে অসীম সম্ভাবনা; স্বাধীনতা ভোগ করবার অপার বাসনা, ভালো থেকে মন্দকে বিচার করার ক্ষমতা, পছন্দ করার অভীক্ষা ইত্যাদি এবং এসবের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে ওঠে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিতে। সুফিবাদও তার সমস্ত দার্শনিক প্রয়াসের মধ্যে, কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষকে দায়িত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ ব্যক্তিসত্তায় রূপান্তর করতে চায়। দার্শনিক নীটসে, হাইডেগারের মধ্যেও সুফি জীবন দর্শনেরই অনুরণন লক্ষণীয়। হাইডেগার বলেন, মানুষ পবিত্র হয়ে জন্ম নেয়, কিন্তু সামাজিক লোভ-লালসা তার আদি অবস্থা থেকে স্থলন ঘটায়, এই অনৈতিক মানুষকে তিনি বলেছেন স্থূলিত মানব (will-to live-well), আর এই বাস্তবতাকে বলেছেন 'ডেজাইন'। সুফিদর্শন আমাদেরকে এই ডেজাইন বাস্তবতা থেকে পরিত্রাণ করতে চায় (Hai ২৯-৩৫)। এ কারণে সুফিবাদ ক্ষমতার বহুমুখী আকাঙ্ক্ষা থেকে মানুষকে মুক্ত রেখে আধ্যাত্মিক শান্তির পথ সুগম করে মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার কাছে নিজেদের সমর্পণ করে (আরো দেখুন-সূরা আল-মুমিন, ৪০:১৬)।

১.৯. সাহিত্য, সংস্কৃতি, গান ও কবিতায় সুফি প্রভাব:

সুফি-সাধকগণ আকাঙ্ক্ষার প্রভুত্ববাদী দিকটিকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় সহনশীলতা, সংযম ও শান্তির বাণীকে মননে, যৌবনে ও সমাজে পরিব্যপ্ত করতে চেয়েছেন। সুফিদের জীবন-যাপন প্রণালী, চিন্তা ভাবনার মধ্যে আমরা এর প্রতিফলন লক্ষ্য করি। বাংলার মাটিতে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সুফি দরবেশদের ভূমিকা ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠার ফলে সুফি দরবেশদের চারিত্রিক গুণাবলী ও তাঁদের মানবতাবাদী কল্যাণকর কর্মকাণ্ড গোটা সমাজব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত করে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুফি প্রভাবের যে ধারা শুরু হয়েছিল তার কার্যকরী প্রভাব দেখা যায় মূলত পঞ্চদশ শতকের পর থেকে। এ সময় থেকে বাঙালি সমাজ সুফি ভাবধারাকে গ্রহণ করে সাহিত্যের বিকাশ ঘটাতে সমর্থ হয়। বিশেষ করে, লোক সাহিত্যে এ প্রভাব ছিল অনেক বেশি। কারণ তাঁরা ক্ষেত্র বিশেষ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমানভাবে শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন এবং তাঁদের মাযার ও খানকাসমূহ ছিল উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের কেন্দ্রস্থল। বাংলা সাহিত্যের চারটি ধারায় সুফি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হলো- মুর্শিদি, বাউল, পুথি ও শামা। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বৈষ্ণব কবিতার ভাবমুক্তিকে সুফি প্রভাবের ফসল বলে মনে করেন (চট্টোপাধ্যায় ৬৭)। এছাড়াও তিনি বৈষ্ণব কবিতার গল্প কাহিনীর সাথে সুফি কবিতায় ব্যবহৃত গল্প কাহিনীর সাদৃশ্য তুলে ধরেন। একথা অনস্বীকার্য যে, সুফি দর্শনের প্রভাবেই বাংলা কাব্যে মানবতাবোধের জন্ম। বড়ুচণ্ডীদাসের রচনা মানুষের মনে

প্রাণে যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তা-ও তিনি পেয়েছেন মূলত ইসলামী সংস্কৃতির ভাবাদর্শে। শুধু চণ্ডীদাশই নন বরং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মধ্যযুগের পদাবলী প্রভৃতিতে সুফি-সাধকদের ভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামী চিন্তারীতি ও ভাব তরঙ্গের মিশ্রণে এক নতুন ধারার সূচনা ঘটে।

সুফি সাধকদের গান বা কবিতা বাংলার ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রাস্তাঘাটে যেসব যানবাহন চলাচল করে সেসব যানবাহনে প্রায়শই মাইজভাণ্ডারী, মোহছেন আউলিয়া প্রমুখ সুফি দরবেশদের উপলক্ষ করে অনেক ভক্তিগীতি ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীত বাজাতে শোনা যায়। এছাড়াও বাংলার অলিতে-গলিতে, পথে-প্রান্তে, রাস্তার পাশে ছোট ছোট চায়ের দোকানসহ প্রভৃতি জায়গায় অনুরূপ ভক্তি, শ্রদ্ধার গান শুনতে পাওয়া যায় (আবদুর রহীম ১১৩-১২১; ২২৯-২৩৭)। এসব গানের ক্যাসেট সি. ডি. আকারে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। এসব মন মাতানো গান ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে রেখাপাত টেনে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে। উল্লেখ্য যে, সুফিদের এ আধ্যাত্মিক গান যদিও আরবীয় পীর দরবেশ, সুফি-সাধকদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে উদ্ভব তবুও এর প্রভাব পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সুফির আল্লাহ ও নবী প্রেমের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন থাকতে চান। তাঁরা আল্লাহর একত্ববাদনীতি ও আদর্শ, জগতের ক্ষণিকত্ব এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি শর্তহীন ভালোবাসায় নিজেকে সমর্পণ করে তদানুযায়ী সাধারণ মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল একটিই, আর তা হলো ইসলামের মূল বাণী প্রচার ও প্রসার ঘটানো এবং দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে তার প্রতিফলন ঘটানো। এভাবে সুফি দেখানো পথ অনুসরণ করে মানুষ যেমন দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল তেমনি পরবর্তী সময়ে এ অঞ্চলে বিভিন্ন তরিকার অসংখ্য ভক্ত ও মুরীদ গড়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, সুফিদের জীবদ্দশায় তাঁদের খানকাসমূহ এবং মৃত্যুর পর তাঁদের মাযারসমূহ আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত হয় এবং সুফিদের নিয়ে লেখা আধ্যাত্মিক সঙ্গীতসমূহ জনমনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এসব গান ও কবিতা এ অঞ্চলের গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, শহরে-বন্দরে সর্বত্র শ্রদ্ধাভরে বাজানো হয়। এসব মন মাতানো গান এ অঞ্চলের জনসাধারণের উপর সুফি-সাধকদের ব্যাপক প্রভাবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

১.১০. রাজনৈতিক অঙ্গনে সুফি প্রভাব:

বর্তমান বিশ্বে শক্তিদ্বারা রাষ্ট্রসমূহ অন্যান্য দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের প্রাকৃতিক সম্পদ লুটপাট করে নেবার লক্ষ্যে অশান্তি সৃষ্টি করছে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হচ্ছে। এরপরও আমরা আরো অধিক পাবার বাসনায় নিজেকে, সমাজকে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে তথা বিশ্বকে অস্থির করে তুলছি। গাণিতিক অসীমতার মতো এ অস্থিরতা চলছে। সুফিবাদ এ অশান্তির মাঝে দাঁড়াতে পারে শান্তির বাণী নিয়ে (Macdonald ৮১-৮৭)। কারণ জীবনে প্রথাগতভাবে এগিয়ে যাবার নিয়ম-কানুনকে সুফিরাই প্রথম ঘুরিয়ে দিয়েছেন। প্রথাগত কানুনসমূহ আমাদেরকে ক্ষমতালিপ্সু করে তোলে। অবিরাম উর্ধ্বমুখী আকাঙ্ক্ষার দিকে ছুটে চলার মনোবৃত্তি তৈরি করে, অর্থবিত্ত, সমৃদ্ধি এবং অর্জনকেই মনে করে জীবনের একমাত্র পাথেয়। এজন্য সুফি সাধকগণ তাঁদের কর্ম, নির্দেশনা এবং তত্ত্বের মধ্য দিয়ে জীবনের এই প্রথাগত স্বভাবকে প্রত্যখ্যান করে জীবনকে সৎ ও ন্যায়ের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে। সুফিগণ আকাঙ্ক্ষার এ প্রভুত্ববাদী দিকটিকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় সহনশীলতা, সংযম ও শান্তির বাণীকে মননে, যৌবনে ও সমাজে পরিব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন। সুফিদের জীবনযাপন প্রণালী, চিন্তা ভাবনার প্রতিচ্ছবি আজকের বাংলাদেশের অনেক মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। সুফিদের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবকল্যাণমুখী চিন্তাভাবনার জন্য ধনী-দরিদ্র, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী আজও তাঁদের দরগাহ শরীফে সমবেত হয়ে স্রষ্টার কাছে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রার্থনা করে।

সুফিরা রাষ্ট্র ক্ষমতা বলতে পুঁজিপতি রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলেননি (Ali ১১৩-১২১; ২২৯-২৩৭)। বরং তাঁরা যে ‘ইনসানুল কামেল’ বা পরিপূর্ণ মানুষ যারা ক্ষমতার রোগে আক্রান্ত মানুষ নয়। সুফিদের এই মানুষ হলো ‘পূর্ণমানব’। দার্শনিক নীটশের সুপারম্যান সেই একই অর্থ বহন করে। কিন্তু সমকালীন বিশ্ব তথা মুসলিম সম্প্রদায় যে ইসলাম চর্চা করেছেন তাতে অনুপ্রবেশ ঘটেছে ক্ষমতার বিকারগ্রস্ত রুগ্নতা। এই রুগ্নতাকে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমেই আমরা রাষ্ট্রব্যবস্থায় শান্তির পথে অগ্রসর হতে পারি। সুফিরা এই রুগ্নতা প্রত্যাখ্যানে সমর্থ হয়েছেন এবং সাধারণ মানুষকে শান্তির পথে আহ্বান করে গেছেন। নীটশের এ দর্শন ভাবনার সাথে মিশেল ফুকোর সুফিতাত্ত্বিক দর্শন ভাবনার সম্পর্ক রয়েছে। সুফিদের মতো ফুকো ক্ষমতাকে দেখেছেন ‘মানসিক ও মানবিক বিকারের প্রকাশ’ হিসেবে। সুফি-সাধকদের প্রভাব শুধু সমাজের সাধারণ জনগণের উপরই পড়েনি, বরং এঁদের প্রভাব কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এমনকি রাজনীতিবিদদের উপরও পড়েছিল ব্যাপকভাবে। ইতিহাসের আলোকে বলা যায়, এদেশে মুসলিম রাজত্ব স্থাপনের প্রথম কৃতিত্ব ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর; কিন্তু তা সত্ত্বেও সুফি-সাধকগণ কখনো মুসলমান সেনাপতিদের সহযোগিতা করে আবার কখনো নিজেরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে সমগ্র বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা করে গেছেন (Nicholson ১০৩-১০৯)। এঁদের মধ্যে বাবা আদম শাহ (র), তুর্কান শাহ (র), শাহ মখদুম রূপোস (র.), গাজী শাহ সুলতান মাহী সওয়ার (র.), হযরত শাহ জালাল (র), হযরত খান জাহান আলী (র), সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক (র.) প্রমুখ সুফি-সাধক হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে স্ব-স্ব অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, সুফি-দরবেশগণ এ অঞ্চলে মুসলিম রাজ্য বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ফলে সমগ্র উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, ও দক্ষিণবঙ্গ জয় করে সুফিরা তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্র বিস্তারে অনেকটা সফল হয়েছেন (শামসুর ৬৯; এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, খণ্ড-১ ও ২, পৃ. ৬৪-৬৭; ৫৪-৫৮)। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, সুফি-দরবেশদের প্রভাব শুধু ধর্ম প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তাঁদের কার্যকলাপ রাজনৈতিক অঙ্গনেও বেশ প্রশংসার দাবী রাখে। সুফি-সাধকদের জীবন সাদাসিধে ও সহজ সরল। তাঁরা রাষ্ট্রীয় কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চাননি। তবে রাষ্ট্রের যখনই দুঃসময় এসেছে সুফিরা তখন ইসলামের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি, অভিভাবকরূপে মুসলিম শাসকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। যেমন, হযরত নূর কুতুব আলম (র.) ইলিয়াস শাহীর শাসনামলে রাজা কংসের নির্যাতন থেকে পীর, দরবেশ, উলামা মাশায়েখদেরকে রক্ষা করার জন্য বিশিষ্ট সুফি-সাধক ইব্রাহিম শকীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এমন দুর্দিনে তিনি মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন বলে মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজ এক মহাসংকট থেকে রক্ষা পায় এবং মুসলিম সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবে ধীরে ধীরে সমাজে নব শক্তির সঞ্চার হয় ও মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত মজবুত হয় (আহসানউল্লা ৯-১৪)।

সুফি-সাধকদের খানকা হিসেবে পরিচিত সিলেটে হযরত শাহ জালাল (র) এর মাযার শরীফ, খুলনার খান জাহান আলী (র) এর দরগাহ শরীফ, রাজশাহীর শাহ মখদুম (র) এর মাযার শরীফ ও শাহ দৌলা (র) এর মাযার শরীফ, চট্টগ্রামের হযরত দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (র) এর মাযার শরীফ ও আনোয়ারা থানার তালসরা দরবার শরীফে এদেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিশিষ্ট রাজনীতিক, কূটনৈতিক প্রমুখ দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গের অবাধ যাতায়াত ছিল এবং বর্তমানেও তা প্রচলিত আছে। এসব দেশ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের পদচারণাই প্রমাণ করে যে, এদেশের সুফি-সাধকগণ তাঁদের আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা বাঙালি জাতির হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন (রশীদুল ১৫-২৯)। এঁদের আদর্শ এ জাতির আশীর্বাদস্বরূপ। কাজেই বলা যায়, বাংলার সুফি-সাধকগণ শুধু ইসলাম ধর্ম প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, বরং দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী স্বার্থসংরক্ষণে দেশের রাজনীতিতে নিজেদের

যোগ্যতা, দক্ষতা ও সামর্থ্যকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছেন। সুতরাং এটা দিবালোকের মত সত্য যে, মুসলিম রাষ্ট্রের বিস্তার ও সংহতিতে সুফি-সাধকগণ নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন যা অনস্বীকার্য (সোবহান ১৯-২৭)।

বহুত বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের সূচনাকাল থেকেই সুফি ভাবধারা এদেশে প্রবেশ করেছিল বটে, কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর সময় থেকে সুফি ভাবধারা এদেশে পূর্ণগতিতে চলতে থাকে। এছাড়াও এ সময়ে এতদঞ্চলে মুসলিম শাসন বিস্তারের ফলে এ মরমী চিন্তাধারা আরও ত্বরান্বিত হতে থাকে। মধ্যযুগে বাংলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারে এবং মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে সুফিরা অনন্য ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উগ্রতা থেকে নিম্নবর্ণের নির্যাতিত হিন্দু ও বৌদ্ধসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সুফি-সাধক, পীর-দরবেশ ও আলেমদের তৎপরতা ছিল উল্লেখযোগ্য (মুহাম্মদ নূরুল ও অন্যান্য ১০৬-১০৯)। সুফিবাদের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস থেকে এটা প্রমাণিত যে, হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে সুফিবাদের বীজ ক্রমান্বয়ে বিকশিত হতে থাকে। ইতিহাস বিবর্তনের যে যুগে গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা হতো আরবী ভাষায়, তখন থেকেই মারেকাতে ইলাহিয়া তথা আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা ও তাসাউফের চর্চা পুরোদমে চলতে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় যেকোনো সমস্যা সমাধানে সুফিদের প্রভাব ছিল অন্যান্য যেকোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক বেশি (Pradip ৯৯-১০৭)।

১.১১. অলৌকিক কর্মকাণ্ডে সুফি প্রভাব:

সুফি-সাধকদের কাজকর্মের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এঁরা অলৌকিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাধারণের মনে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালান (<http://www: encyclopedia of religion and ethics, vol- vi; part-ii <sufigeoethics.com>>)। মানুষের নানা বিপদে-আপদে তাঁরা ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বিপদগ্রস্ত মানুষ সম্ভাব্য বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবার পর সুফিদের প্রতি তারা আরও অধিক দুর্বল হয়ে পড়েন এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে (Enamul ১০৬-১০৯)। এভাবে সুফিদের খ্যাতি ও প্রভাব দিন দিন বাড়তে থাকে। সুফিগণ নৈসর্গিক এ লীলাভূমিকে শান্তির বার্তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের অনেক পীর, ফকির, দরবেশ এদেশে এসে ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে সাধারণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়া আগত সুফি-সাধকদের অনেকেই অলৌকিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাধারণের বিপদসঙ্কুল মুহূর্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ আছে যে, দেশে যখন কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিত; কিংবা যখন দেশে অনাবৃষ্টি, প্রখর রোদে দেশের শস্য ধ্বংসের কাছাকাছি ঠিক এমন মুহূর্তে সুফিগণ আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য। মুহূর্তেই আল্লাহতায়াল্লা বৃষ্টি দিয়ে সমগ্র যমিন ঠাণ্ডা করে দেন (সাইয়েদ (অনূদিত) ২; ১৯-২৬)। এসব আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের মনে সুফি-সাধকদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দেয়। সুফিদের জীবন-প্রণালী তথা বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনী সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। সবটুকু প্রমাণসিদ্ধ না হলেও এটুকু বলা যায় যে, সুফিদের আশীর্বাদ লাভের জন্য সাধারণ মানুষ সুফিদের মাযার বা খানকা শরীফে ভিড় জমাত। শুধু মুসলমানরাই নয় বরং অনেক অমুসলিমরাও এ আশীর্বাদের ছায়াতল থেকে বাদ পড়েনি। সুফি দর্শন মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে বিশ্বাসী থেকে মানুষকে প্রেমের পথে পরিচালিত করে শ্রুতির জ্ঞান লাভে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন (<http://www: encyclopedia of islam and religion, vol- iii; part-iii <sufibangla.com>>)। প্রসঙ্গত, একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করব। শাহ সুফি হযরত আবদুল খালেক গজনবী ওরফে চাল-ডাল মিঞা (র) সম্পর্কে জানা যায়, তিনি সুদূর গজনী থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড এলাকায় আস্তানা তৈরী করেন। তিনি ছিলেন শরীয়ত ও তরিকতের একনিষ্ঠ সাধক। তিনি যখন মসজিদে বসে যিকির করতেন তখন বহু দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে তাঁর সাথে যিকিরে শরীক হতেন। চাল ডাল মিঞা সকাল বেলা এক হাড়ি (জগ) পরিমাণ

চাল-ডাল রান্না করতেন। কথিত আছে যে, সংখ্যার দিক দিয়ে মানুষ যতই বৃদ্ধি পেতে থাকুক না কেন সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ রান্না করা চাল-ডালে সবাই তৃপ্তিসহ খাবার খেতে পারতেন, খাবারের কোন ঘাটতি হতো না। এতদঞ্চলের মানুষ তাঁর এ অলৌকিক কর্মকাণ্ড দেখে তাঁকে চাল-ডাল মিঞা উপাধিতে ভূষিত করেন। বর্তমানে তাঁর মাযারে বহু লোক প্রায় প্রতিদিন মানত, মিলাদ ও মাহফিলের আয়োজনসহ তাঁর মাযার যিয়ারত করেন (মনোয়ার ৩৯; আবদুল ১৭-২৬)।

১.১২. উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনার সংক্ষেপ করে বলা যায় যে, বাংলাদেশের অঞ্চলভেদে ইসলাম প্রচারে বহু দেশি-বিদেশী পীর-দরবেশদের কর্মতৎপরতা ও তাঁদের মহান জীবনাদর্শ সম্পর্কে কিছুটা হলেও প্রবন্ধটি তথ্যের খোরাক যোগাবে। পীর, দরবেশ, সুফি-সাধকদেরকে আল্লাহ প্রেরণ করছেন সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে। মানুষ এঁদেরকে অনুসরণ করবে, সৎ পথে চলবে, যিকিরে মশগুল থাকবে ফলে মানুষ যাবতীয় অন্যায়, ব্যভিচার, পাপ কার্য থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে। এভাবে সুফি ভাবধারা অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ ইহকালের যাবতীয় পাপ কার্য থেকে মুক্ত হয়ে পরকালের স্থায়ী শান্তি পেতে পারে। নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক গুণের দিক থেকে সুফিকে সাধারণ মানুষ থেকে অনেক উঁচু স্তরে উন্নীত হতে হয় এবং অর্জন করতে হয় সূক্ষ্মতর অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর অনুভব শক্তি। সর্বোপরি, সুফি-সাধকগণ তাঁদের শিষ্যদের উদ্দেশ্যে তথা সমগ্র মানুষের জন্য যে শিক্ষার কথা বলেছেন, তার ভাবার্থ হলো— (১) পবিত্র কুরআনের আদেশ-নিষেধ মান্য করা, (২) রাসুলুল্লাহ (স:) এর সুন্নতের অনুসরণ করা, (৩) হালাল খাবার খাওয়া, (৪) কাউকে কষ্ট না দেয়া, (৫) পাপ কাজ হতে বিরত থাকা, (৬) তওবা ইত্তিগফার করা, (৭) আল্লাহ ও বান্দার হক যথাযথ আদায় করা ([http://www: encyclopedia of religion <internationalsuficentre.org>](http://www:encyclopediaofreligion<internationalsuficentre.org>))। সুফিদের এ শিক্ষা তাঁদের শিষ্যদের উপর পড়েছিল ব্যাপকভাবে। সুফিদের এ শিক্ষার ফলে ধীরে ধীরে বাংলা ভূ-খণ্ডে ইসলামী শিক্ষা তথা তাসাউফের শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে এবং মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। একথা অনস্বীকার্য যে, সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে তথা আন্তর্জাতিক জীবনে যে অসভ্যতা, অনাচার, ব্যভিচার, অনৈতিকতা বিরাজ করছে তা মূলত ঐ আদর্শ-বিচ্যুত জীবন-যাপনেরই প্রতিফলন। সুতরাং এ রকম আত্মপোলক্লির প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, আঞ্চলিক শান্তি তথা বিশ্বশান্তির জন্য সুফিবাদ হতে পারে একটি ‘রোল মডেল’।

তথ্যসূত্র

Dasgupta, Shashibhusan. *Obscure Religious Cults*. Calcutta: Firma K. L. M. Ltd., 1946।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য*। মিতা প্রকাশনী, ১৯৮৭।

Hoque, Mohammad Enamul. *A History of Sufism in Bengal*. Dacca: Asiatic Societ of Bangladesh, 1975।

Shah, Iqbal Ali. *Islamic Sufism*. Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1998।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ। প্রথম খণ্ড। ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২।

মেশিগনন, লুইস. “তাসাউফ”। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২শ খণ্ড। ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯।

Sharif, M. M. *Muslim Thoughts: Origin and Achievements*. London: University Books, 1959।

আলম, এম. শফিকুল। *বাংলাদেশ দর্শন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। নকসা প্রকাশন, ২০০৭।

মজিদ, আবদুল। শরীয়ত ও তরীকত (অনূদিত ও সংকলিত)। এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ১৯৯৭।

Macdonald D. B. *Muslim Theology*. London: Blakie, 1962।

সাকলায়েন, গোলাম, *বাংলাদেশের সুফী সাধক*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ. ১৯-২৯।

Hai, S. A. *Muslim Philosophy*. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1964।

হাযারী, আবদুর রহীম। *সুফীতত্ত্বের আত্মকথা*। নবরাজ প্রকাশনী, ১৯৮৮।

Ali, Syeed Ameer. *The Spirit of Islam*, London: BlaKie, ১৯৬১।

Nicholson, R. A. *The Mystic of Islam*, London: London Books House, 1963।

রহমান, শামসুর। *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো*। নবযুগ প্রকাশনী, ১৯৬৮।

আহসানউল্লা, খানবাহাদুর। *সুফী*। আহছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ১৯৯৬।

আলম, রশীদুল। *সুফী সাধনার ভূমিকা*। সাহিত্য কুটির, ১৯৮৬।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ। প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা- বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

আমিন, মুহাম্মদ নূরুল ও অন্যান্য (সম্পাদিত)। *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম*। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১।

Lahari, Pradip. *Bengali Muslim Thought 1818-1947*. Calcutta: K. P. Bagchi and Co., 1991।

দেখুন, <http://www: encyclopedia of religion and ethics, vol- vi; part-ii <sufigeoethics.com>>

হাই, সাইয়েদ আবদুল (অনূদিত)। *ইসলামী ভাবধারা*। পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ১৯৭০।

দেখুন, <http://www: encyclopedia of islam and religion, vol- iii; part-iii <sufibangla.com>>

সাগর, মনোয়ার। *সীতাকুণ্ডের ইতিহাস : সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য*। জব্বার, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল। *এলমে তাসাউফের হাকীকত*। বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৯২।

দেখুন, <http://www: encyclopedia of religion <internationalsuficentre.org>>

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতায় ছাপাইশিল্পের চর্চা ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার চারুশিল্পীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার উৎস:

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন *

প্রতিপাদ্যসার: বর্তমান সময়ে ছাপাইশিল্পে প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের সুবাদে বিভিন্ন দেশের শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমসাময়িক চারুশিল্পীদের কাছে প্রযুক্তি নির্ভর ছাপাই মাধ্যমসহ ভাস্কর্য তৈরীতে ত্রি-মাত্রিক ছাপাইয়ের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডিজিটাল ইমেজিং প্রযুক্তির এই ব্যাপক আগ্রহ বর্তমান সময়ে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে ছাপচিত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষাকে 'মিডিয়া বিপ্লব' ও সময়ের সাথে (Non-Toxic Printmaking) বা অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পকে 'সবুজ বিপ্লব' বলা যেতে পারে। এই ধরনের নতুন করণকৌশলে ছাপাইশিল্পে ইমেজ মেকিং, পেটমেকিং, প্রিন্টিং প্রসেস, রিপ্রোডাকশন বা ম্যাস্ মিডিয়ায় সীমাহীন, সৃজনশীল উৎসসন্ধান ও সম্ভাবনা রয়েছে। 'এপ্লাইড আর্ট অ্যান্ড প্রিন্টমেকিং' একটি মূলধারার শিল্প পরিসর, সাধারণ মানুষের সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে স্যুভেনির, প্যাকেজিং, উপহার সামগ্রী, বাণিজ্যিক ছাপাইশিল্পের প্রায়োগিক প্রয়োজন বা সমাজ বিনির্মানের যাবতীয় কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও ডিজিটাল ইমেজিংয়ে রোগ নির্ণয়ের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করেছে। অটোমোবাইল, স্পেস-স্যাটল, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংসহ মানব সমাজের সার্বিক সহযোগিতার প্রেক্ষিতে ত্রি-মাত্রিক প্রিন্টিং সর্বাধিক অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে। প্রিন্টমেকিংয়ের ঐতিহ্যগত প্রাচীন ছাপাইশিল্প ও বর্তমান সময়ে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে প্রযুক্তিগত ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই প্রবন্ধে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে শিল্পকর্ম সৃষ্টি, ভাস্কর্য তৈরীতে প্রযুক্তিগত ব্যাপক ব্যবহার ও চারুশিল্পীদের জন্য নতুন উৎস ও সম্ভাবনার দিকটি আলোচনায় প্রাধান্য পাবে। ছাপাইশিল্পে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা যেমন, ত্রি-মাত্রিক ছাপাই পদ্ধতি: কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন (CAD), কম্পিউটার এইডেড ম্যানুফেকচারের (CAM) উপর ভিত্তি করে মুদ্রিত ফর্ম, প্লাজমা আর্ক কাটিং (PAC), কম্পিউটার নিউম্যারিক্যাল কন্ট্রোল (CNC) এবং রেপিড প্রোটোটাইপ (RP) প্রযুক্তি বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। একই সাথে প্রিন্টমেকিংয়ের 'ভার্চুয়াল এবং ফিজিক্যাল' উপায়ের মধ্যে বিশেষ সমস্যার সমাধান বা যোগসূত্র তৈরি করবে; যেমন উভয় প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তনের ফলে একটি দ্বিমাত্রিক ছাপাইশিল্প থেকে ত্রিমাত্রিক ছাপাইশিল্পে উত্তরণের বিভিন্ন ধাপে সমস্যা ও সমাধান, সর্বোপরি সম্ভাবনার বিস্তার দিকনির্দেশনা এবং উভয় প্রক্রিয়াতে অপার সম্ভাবনাসহ ছাপাইশিল্পের নব উৎস ও প্রযুক্তিগত আমূল পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্যকে সাদরে আহ্বান করার পরামর্শ থাকবে।

তথ্য প্রযুক্তির বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট, ই-মেইল, ভয়েস-মেইল, এসএমএস, এসএনএস এবং ই-বুক ইত্যাদি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশ্বময় প্রসারিত হয়ে তথ্য প্রযুক্তির জন্য কাগজবিহীন যোগাযোগের মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে প্রচার মাধ্যম প্রচলিত আছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে পৃথিবীর সবত্র দ্রুত প্রচার প্রচারণার জন্য ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যমে টিএফটি, এলসিডি, এলইডি স্ক্রীন ডিসপ্লে অত্যাধুনিক ছাপাই শিল্পের ডিজিটাল পেট মেকিং স্তর হিসেবে বহুল পরিচিতি লাভ করেছে। ঐতিহ্যগত ফিজিক্যাল প্রিন্টমেকিং ছাড়া ডেস্কটপ-ল্যাপটপ কম্পিউটার, এনড্রয়েড মোবাইল, ট্যাব, আইফোনসহ অন্যান্য টিএফটি, এলসিডি, এলইডি স্ক্রীন

* অধ্যাপক, ছাপচিত্র শাখা, চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসপ্লেতে বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করে ইমেজ তৈরী পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন দ্রাবক কালি বা ইঙ্ক ভিত্তিক মুদ্রণ যন্ত্র বা প্রিন্টারের সাহায্যে যে কোন সারফেসে প্রিন্ট নেয়া সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রয়োজনের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক মুদ্রণ প্রক্রিয়া প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধির সাথে রূপান্তরিত হচ্ছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল ও ক্রমবর্ধমান বাজার রূপান্তরকে আয়ত্তে রাখার কৌশল হিসেবে অপরিহার্য দ্রুত বিতরণ, কম বা বেশী আয়তনে উৎপাদন ও কার্যকর যোগাযোগ পদ্ধতি রক্ষার অন্যতম দৃষ্টিভঙ্গি হল ‘বাণিজ্যিকীকরণের জন্য বাস্তব ডিজিটাইজেশন’। এই অগ্রগামী মুদ্রণ পদ্ধতির উন্নীতকরণ যেমন ‘সিঙ্গেল শীট-ফেড ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস’ এবং ‘লার্জ ফরমেট ইঙ্কজেট প্রিন্টার’, লেজার প্রিন্টার, ইউভি প্রিন্টার ইত্যাদির ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি সাধন হচ্ছে। ম্যাস প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে অফসেট মুদ্রণ ইতোমধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে।

ছাপচিত্রের অন্যান্য মাধ্যম যেমন: রিলিফ প্রিন্ট, সারফেস প্রিন্ট, ইন্টাগলিও প্রিন্ট, ক্লীণ প্রিন্ট, প্ল্যানোগ্রাফিক প্রিন্ট, অলিওগ্রাফি প্রিন্ট ইত্যাদি যে কোনো চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনায়াসে চর্চা করা সম্ভব। কিন্তু শুদ্ধ ছাপাইশিল্পে স্টোন লিথোগ্রাফির সফল বিকল্প ও অত্যাধুনিক মাধ্যম ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফির অনুশীলন আমাদের দেশে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাপচিত্র শাখায় প্রচলন রয়েছে। অতি প্রাচীন ছাপাই শিল্পের অন্যতম ও জনপ্রিয় এই মাধ্যমটির প্রথম ও প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ‘লিথো স্টোন’ যা ইউরোপ থেকে আমদানী করতে হতো। বর্তমানে স্টোন লিথোগ্রাফির মূল উপকরণ লিথো স্টোন সহজলভ্য নয় বা লিথো স্টোন প্রিন্টিংয়ের বাণিজ্যিক মুদ্রণ প্রসেসটি উন্নীত বা প্রতিস্থাপিত হয়েছে অত্যাধুনিক অফসেট প্রিন্টিং প্রসেস দ্বারা। লিথো স্টোন আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ লিথো স্টোন আমদানী স্থগিত করেছে। ফলে বাংলাদেশে বিভিন্ন চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লিথো স্টোন এবং লিথো প্রিন্টিং প্রেস সংগ্রহ করা দুষ্কর ব্যাপার হয়ে উঠেছে। স্টোন লিথোগ্রাফিতে- স্টোন প্রিপারেশন, স্টোন স্লানান্তর করা, এটিং প্রসেসে ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষতিকারক দিক বিবেচনায় অনেক উন্নতদেশে সহজলভ্যতা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও স্টোন লিথোগ্রাফি পরিহার করে নতুন ফটো-সেন্সিটিভ অফসেট প্রুট বা আলোক-সংবেদনশীল অফসেট লিথো প্রুটে ‘লেজার টোনার’ বা ‘জেরক্স টোনার’ ড্রইংয়ের আকর্ষণীয় সল্লব্যয়ী বিকল্প ‘ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি’ প্রিন্টিং পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প তৈরীর ক্ষেত্রে এই ‘সবুজ বিপ্লব’ একই সাথে শিল্পের অন্যান্য শাখায় প্রসারিত হয়েছে। পলিয়েস্টার লিথোগ্রাফি প্রুট এবং ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি সিস্টেম সম্প্রতি অনেক ছাপাইশিল্পীর প্রথম পছন্দ। এই পদ্ধতিতে কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন এবং কম্পিউটার গ্রাফিক্স সফটওয়্যার ব্যবহার করে কাজিত ডিজাইন ইমেজ সেটিংয়ের মাধ্যমে পজেটিভ ফিল্ম বা নেগেটিভ ফিল্ম বা প্রসেস ফিল্ম এক্সোপাজারের মাধ্যমে অফসেট পিএস প্রুট মেকিং করা যায়। বর্তমানে CTP- কম্পিউটার টু প্রুট মাধ্যমে সরাসরি অফসেট প্রুট মেকিং তথা ইমেজ সেটিংয়ের মাধ্যমে প্রসেস ফিল্মের পরিবর্তে কম্পিউটার গ্রাফিক্স সফটওয়্যারে তৈরীকৃত নকশা সরাসরি অফসেট প্রুটে প্রিন্ট সহকারে প্রুট ডেভেলোপ হয়ে যায়। ফলে প্রসেস ফিল্মের খরচ সাশ্রয় হয়, অপরপক্ষে ইমেজ স্থানান্তরে রেজুলেশনে কোনো প্রকার বিয়োগ হয় না। বাকী প্রসেস হলো ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফির ধারাবাহিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ছাপাইশিল্প তৈরী করা। অপর পক্ষে সনাতনী প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক অফসেট প্রিন্টিং প্রেসে অনায়াসে মনো-কালার বা মাল্টি-কালার প্রিন্ট করা সম্ভব। অতএব একজন ছাপাইশিল্পীর ব্যক্তিগত স্টুডিওতে ইন্টাগলিও প্রেস থাকা জরুরী নয়। জাপানে Toray Company, ইউরোপে 3M বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি প্রুট মেকিংয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রোডাক্ট প্রিন্টিং বিগত কয়েক দশক যাবৎ সাফল্যের সাথে মুদ্রিত পণ্য সরবরাহ করে আসছে। সনাতন তথা ডেম্পিং অফসেট প্রিন্টিংয়ে হাই ভলিউম প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে কয়েক সেট প্রুট প্রয়োজন হয় যা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। এছাড়াও প্রিন্টিং কোয়ালিটি প্রত্যেক ব্যাচে আলাদা আলাদা

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতায় ছাপাইশিল্পের চর্চা ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার চারুশিল্পীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার উৎস:

চরিত্র ধারণ করে। কিন্তু ওয়াটারলেস অফসেট প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল সেট অফসেট প্রুটের মাধ্যমে হাই ভলিউম প্রিন্টিং সম্ভব এতে আর্থিক সাশ্রয় ও তুলনামূলক সময় কম লাগে।

ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি: স্টোন লিথোগ্রাফির পরিবর্তে ‘ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি’তে ছাপাইশিল্প তৈরী; কানাডীয় শিল্পী Professor Nik Scmenoff (1928-2022), তিনি ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে সফলভাবে এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প তৈরী পদ্ধতির ফটো-সেন্সিটিভ বা আলোক-সংবেদনশীল অফসেট লিথো প্রুটে ‘লেজার টোনার’ বা ‘জেরক্স টোনার’ ড্রইংয়ের আকর্ষণীয় সল্লব্যয়ী বিকল্প লিথোগ্রাফ প্রিন্টিং মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এতে পেইন্টলেস স্বচ্ছ সিলিকন গু ব্যবহারের ক্ষেত্রে অর্ডারলেস পেইন্ট থিনার দ্রবনীয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে সহজ আকারে মুদ্রণ কালি ইমেজ এরিয়া এবং নন-ইমেজ এরিয়াতে অবস্থান করা, মুদ্রণ কালি গ্রহণ করা বা প্রত্যাখান করার জন্য সিলিকনের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে গঠিত। লেজার টোনার বা জেরক্স টোনার, লিকুইড সোপ ও পানির সংমিশ্রণের সাহায্যে মাইলার ফিল্মের উপর ইমেজ তৈরি করতে হয় অথবা কম্পিউটারের সাহায্যে এডবি ফটোশপ, এডবি ইলাস্ট্রেটর বা শিল্পীর সুবিধা অনুযায়ী সফটওয়্যার ব্যবহার করে তৈরীকৃত ইমেজের একটি সাদা-কালো পজিটিভ বা নেগেটিভ ফ্লিম প্রিন্ট নিতে হয়। প্রিন্ট অবশ্যই ট্রান্সপারেন্ট ফিল্ম বা ট্রেসিং পেপারে নিতে হবে। ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে মাইলারের উপর তৈরীকৃত ইমেজ বা কম্পিউটার লেজার প্রিন্ট বা পজিটিভ প্রসেস ফিল্ম পি.এস. প্রুটের (অফসেট প্রিন্টিং প্রুট) উপর সেট করে, লাইট এক্সপোজারের মাধ্যমে পি.এস প্রুটে কাঙ্ক্ষিত সময় ধরে প্রুট এক্সপোজ করার পর প্রুটটিতে ১ : ৫ - পানি : অফসেট প্রুট ডেভেলোপার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রুট মেকিং বা প্রুট প্রসেসিং করতে হয়। সনাতন পদ্ধতির এয়ারাবিক গামের পরিবর্তে তরলীকৃত ওয়াটার স্যালিয়েন্ট সিলিকন গু প্রয়োগ করে ফেসিয়েল টিস্যুর সাহায্যে বাফিং করার পর প্রুটটিকে কমপক্ষে বারো ঘন্টা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সম্পূর্ণ শুকানো হয়। প্রিন্টিং পর্যায়ে অ্যাসিটোন বা আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল (IPA) ব্যবহার করে প্রুটে থেকে যাওয়া ইমালশানকে ফ্যাসিয়াল টিস্যুর সাহায্যে মুছে ফেলতে হয়। প্রুটে একটি গোস্ট ইমেজ লক্ষ্য করা যাবে, পরে ইঙ্কিং রোলার বা প্রফেসর নিক্ সেমিনফ আবিষ্কৃত ত্রিপার্ট রোলারের সাহায্যে মুদ্রণ কালি প্রয়োগ করা হলে সিলিকন যুক্ত নন-ইমেজ এরিয়াতে মুদ্রণ কালি স্পর্শ করবে না, শুধুমাত্র ফটো-সেন্সিটিভ বা আলোক-সংবেদনশীল অফসেট লিথো প্রুটে থেকে যাওয়া ইমালশানে মুদ্রণ কালি সংস্থাপিত হবে। যা এটিং প্রেস বা লিথোগ্রাফি প্রেসের মাধ্যমে অনায়াসে প্রিন্ট করা সম্ভব। এই প্রক্রিয়ায় অফসেট প্রুট ব্যবহার করা হয় কিন্তু চমৎকার বিষয় এই যে, এতে প্রুট এবং প্রিন্টিং পেপার ডেম্পিং প্রয়োজন হয়না বা পানি ব্যবহার করা হয় না। সম্পূর্ণ শুকনো পদ্ধতিতে প্রুট লিথোগ্রাফ, তথা ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি প্রিন্টমেকিংয়ে অত্যন্ত নিরাপদ ও বামেলামুক্ত প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা যায়। ফলে প্রিন্ট অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং পুরো প্রক্রিয়াটিতে কায়িক পরিশ্রমও কম হয়।

ইঙ্কজেট প্রিন্টিং: সাম্প্রতিক সময়ে শিল্পীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ লার্জ ফরমেট ইঙ্কজেট প্রিন্টিং সিস্টেম, মূলত বাণিজ্যিক দ্রাবক মুদ্রণ বা তথাকথিত দ্রাবক একটি ইঙ্কজেট প্লটার ব্যবহার করে জনপ্রিয় ও বহুল পরিচিত মুদ্রণ কৌশল বলা চলে। ছাপচিত্র শিল্পীদের এই পদ্ধতিতে বড় আকারে মিশ্রমাধ্যমে ছাপাইশিল্প তৈরীতে আগ্রহ প্রকাশকে আজকাল বিভিন্ন প্রদর্শনীতে শুদ্ধ ছাপাইশিল্প হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে ঐতিহ্যগত জলীয় কালি বা পিগমেন্টেড দ্রাবক কালি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যা জৈব দ্রাবকের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় বড় আকারের মুদ্রণ কৌশলগুলির মধ্যে অন্যতম। এই মুদ্রণ আলট্রাভায়োলেট (UV) বিকিরণসহ বায়ুমন্ডলীয় কারণগুলির প্রতিরোধী। ইঙ্কজেট প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কালির উপর ভিত্তি করে দ্রাবক মুদ্রণ

প্রযুক্তি বা এর কৌশল নির্ভর করে। শুধুমাত্র একক নকশা বা কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন ভিন্ন ভিন্ন মিডিয়ায় যেমন- পিভিসি, পলিভিনাইল (ফন্ট লাইট / ব্যাক লাইট), সলভেন্ট মিডিয়া, এনক্যাড মিডিয়া, ওয়ান ওয়ে ভিশন, ফেব্রিক্স প্রিন্ট নেয়া সম্ভব। এইসব ইঙ্কজেট প্রিন্ট সিস্টেমের কালিতে থাকা ‘বেস কোট’ বা দ্রাবকের পরিমাণ এবং প্রিন্ট আউটের স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে। ইঙ্কজেট প্রিন্টিং শ্রেণিভুক্ত:

(ক) **হার্ড সলভেন্ট** বা কঠিন দ্রাবক, যা সব ধরনের দ্রাবকের মধ্যে সবচেয়ে বিষাক্ত। এতে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক ‘সাইক্লোহেক্সানল’ সর্বাধিক পরিমাণে রয়েছে। তবে এটি সলভেন্ট প্রিন্টিংয়ের মধ্যে সবচেয়ে স্থায়ী ও টেকসই। এর স্থায়িত্ব প্রায় তিন থেকে সাত বছর অনুমান করা হয়। এই ধরনের মুদ্রণ সুবিধার মধ্যে ‘লেমিনেটিং’ করার প্রয়োজন পড়েনা, উপরন্তু এই মুদ্রণ কালি ও রঙের বিবর্ণতা, পানি এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধী। এই প্রিন্টিং প্রতিষ্ঠানে একজস্ট ফ্যান বা বায়ু নির্যাস পাখা স্থাপন বাধ্যতামূলক।

(খ) **সফট সলভেন্ট** বা মৃদু দ্রাবক, যাতে সাইক্লোহেক্সানলের উপাদান হার্ড সলভেন্ট বা কঠিন দ্রাবকের তুলনায় অনেক কম থাকে। ফলে এটি কম ক্ষতিকারক, কিন্তু অন্যদিকে এটি ঘর্ষণ, স্ক্র্যাচের জন্য বেশি সংবেদনশীল এবং কম টেকসই। ফলে এটিতে লেমিনেশন প্রয়োজন হয়।

(গ) **ইকো সলভেন্ট** বা পরিবেশবান্ধব দ্রাবক, নাম অনুসারে উপরে উল্লেখিত দুইটি মুদ্রণ প্রক্রিয়া থেকে আলাদা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়। এই ধরনের মুদ্রণের অতিরিক্ত সুবিধা হলো বিরক্তিকর গন্ধের অনুপস্থিতি। এই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কালিতে বিষাক্ত ‘সাইক্লোহেক্সানল’ নেই এবং এটি ল্যাকটিক এসিডের উপর ভিত্তি করে তৈরী, তাই এই ধরনের মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে বায়ু নির্যাস পাখা স্থাপন করার প্রয়োজন হয় না। অসংখ্য সুবিধার পাশাপাশি এই পরিবেশ বান্ধব মুদ্রণ প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত কালির সর্বোচ্চ অসুবিধা হলো বাহ্যিক অবস্থার কম প্রতিরোধ ক্ষমতা, ঘর্ষণ, স্ক্র্যাচের জন্য বেশি সংবেদনশীল এবং কম টেকসই। ফলে এটিতে লেমিনেশন প্রয়োজন হয় (A. Ramya et-al, may-June 2016)।

ইঙ্কজেট কালি: এই ইঙ্কজেট কালি, ইঙ্কজেট প্রিন্টিংয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কালির গঠন এবং রসায়ন মুদ্রণের গুণমান এবং সেইসাথে জেটিং বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রযুক্তি টেক্সটাইল প্রিন্টিংয়ে মুদ্রণের গতি, প্রিন্ট হেড টেকনোলজি এবং কালার গামুটের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সাথে রূপান্তরিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও, ইঙ্কজেট কালি অনুপ্রবেশের সাথে সম্পর্কিত মানের সমস্যাগুলি এখনও বিশ্বজুড়ে গবেষকদের দ্বারা উচ্চ স্তরের মনোযোগ পাচ্ছে যাতে সুপেরিয়র ইঙ্ক তৈরি করা যায়। যা প্রিন্টিংয়ের প্রচলিত পদ্ধতি দ্বারা প্রাপ্ত প্রিন্টের গুণমানকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই পর্যালোচনাটি ডিজিটাল টেক্সটাইল ইঙ্কজেট প্রিন্টিং-এ রঙ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য তৈরি করা। বিভিন্ন ইঙ্কজেট কালির রসায়ন এবং চমৎকার রঙের দৃঢ়তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিউটোনিয়ান ইঙ্কজেট কালির জেটিং আচরণের জন্য উপলব্ধ বিভিন্ন প্রি-ড্রিটমেন্ট প্রযুক্তিগুলিকে কার্যকরীভাবে দেখতে চায়। টেক্সটাইল প্রিন্টিংয়ের ডিজিটাল ইঙ্কজেট প্রিন্টার কাপড়ের মান এবং কালির উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব সর্বজনীন কালির সন্ধানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে যা সমস্ত টেক্সটাইল সাবস্ট্রেট মুদ্রণ করতে পারে। ডিজিটাল টেক্সটাইল প্রিন্টিংয়ের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী দিকগুলির মধ্যে একটি হল অবিশ্বাস্যভাবে বিস্তৃত বাজার যেখানে এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এখনও পর্যন্ত, প্রথাগত রোটারি স্ক্রীন টেক্সটাইল প্রিন্টারগুলি নিয়মিত গ্রাফিক্স প্রিন্টার তৈরির জন্য গ্রাফিক্স কালি প্রয়োগের সাথে পরীক্ষা করেছে, যাতে রোটারি স্ক্রীন খোদাইয়ের উচ্চ খরচ না করে নতুন প্যাটার্ন তৈরি করা যায়। অবিলম্বে

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতায় ছাপাইশিল্পের চর্চা ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার চারুশিল্পীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার উৎস:

টেক্সটাইল রঞ্জক পদার্থ, ডিজিটাল কালি উৎপাদনসহ অনেক টেক্সটাইল প্রিন্টার ওভারগ্রাফিক কালি তৈরী ও অন্যান্য সুবিধা দেখতে শুরু করেছে। রঞ্জক পদার্থগুলি স্থির হতে পারে, ঠিক যেমনটি ঘূর্ণমান মুদ্রিত হয়। এই উন্নয়নের ফলে পতাকা, ব্যানার এবং লোগো, মনোহ্রাম, চিহ্ন, পোশাক, বাড়ির আসবাবপত্রের কাপড়, কুইল্টিং কাপড়, নন-ওভেন এবং টেকনিক্যাল টেক্সটাইল, গেমিং টেবিল, এমনকি চামড়া প্রিন্টিংয়ে অ্যাপ্লিকেশনের দিকে পরিচালিত হয়েছে। সারা বিশ্বের প্রিন্টাররা এখন দৈনিক ভিত্তিতে ডিজিটাল কালি বা ইঙ্কজেট কালি ব্যবহার করে এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সাথে জড়িত সমস্ত সামগ্রী মুদ্রণ করতে মনোযোগী হয়েছেন।

আলট্রাভায়োলেট (UV) প্রিন্টিং

এই ধারার মুদ্রণ উৎপাদন হিসেবে ‘ফটো ইনিশিয়েটর’ আলট্রাভায়োলেট প্রিন্টিং প্রক্রিয়াটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ফটো ইনিশিয়েটরগুলি বিষাক্ত বা অবিষাক্তভাবে প্রাসঙ্গিক, তাই এই প্রসঙ্গে এখনও ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলমান রয়েছে। বর্তমান বাজারভিত্তিক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান এবং দ্রাবক প্রিন্টিং ইঙ্ক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রেখেছে। ফলশ্রুতিতে ইউভি/এলইডি প্রিন্টিং উভয়ভিত্তিক সারসংক্ষেপ করা হয়ে থাকে এবং ক্র্যাডল থেকে ক্র্যাডল পরিপ্রেক্ষিত প্রয়োগ করা হয়। এই প্রিন্টিং প্রক্রিয়ায় যে কোনো তলে বা সারফেসে প্রিন্টিং সম্ভব। সম্প্রতি সিরামিক টাইলস, ইস্পাত, কাঠ, প্লাস্টিক ইত্যাদির উপরিতলে প্রিন্টিং প্রক্রিয়ায় ম্যুরালসহ ক্যানভাসে শিল্পকর্ম মুদ্রণ বাণিজ্যিকভাবে প্রচলন শুরু হয়েছে।

টেক্সটাইল প্রিন্টিং- ডিজিটাল ফ্যাব্রিক প্রিন্টিং প্রক্রিয়ায় টেক্সটাইল প্রিন্টিংয়ের নতুন সীমান্ত হয়ে উঠেছে, যা প্রক্রিয়াগত দক্ষতা, সহজে ব্যবহার, সাশ্রয়ী খরচ, কার্যকারিতা এবং পরিবেশগত প্রভাবের সুবিধা প্রদান করে। ডিজিটাল ফ্যাব্রিক প্রিন্টিং গত কয়েক দশক ধরে ডিজাইনার, প্রিন্টারদের এবং ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করে দ্রুত বিকশিত হয়েছে। একইভাবে এই প্রযুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মুদ্রণ বা ছাপার বা লেখার কালি। এই কালির উন্নয়ন এবং বৃদ্ধি 2500 খ্রিস্ট পূর্বাব্দে, যখন মিশরীয় এবং চীনারা প্রথম শতাব্দীতে জল বা আঠা মিশ্রিত জ্বলন্ত তেল থেকে তৈরি কার্বন অবশিষ্টাংশ আবিষ্কার করেছিল এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিল। তারপর থেকে সাধারণত রঙের বিকাশে ধীর এবং স্থির বৃদ্ধি ঘটেছে। আজ আধুনিক কালির শিল্পগুলি ক্রমাগত মুদ্রণ প্রযুক্তি পরিবর্তন করে প্রিন্টার এবং শেষ ব্যবহারকারীদের চাহিদার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। দ্রুত মুদ্রণের গতি, আর ব্যয়- সংকোচন কার্যকর প্রক্রিয়া এবং কঠোর পরিবেশগত প্রবিধানগুলি বর্তমানে কালি শিল্পের মুখোমুখি কিছু চ্যালেঞ্জ। উপর্যুক্ত সংহতি একত্রে ধরে রাখা, কালির ক্ষমতা বর্ণনা করে; আনুগত্য একটি ভিন্ন উপাদানের সাথে লেগে থাকার শক্তিকে বোঝায়। যেমন, একটি সাবস্ট্রেট রঞ্জক কণাগুলির ভৌত-রাসায়নিক প্রকৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুটি বৈশিষ্ট্য সাধারণ, বিশেষত কারণ তাদের বিচ্ছুরণ ক্ষমতা একটি অবিচ্ছিন্ন মাধ্যমে পৃথক রঞ্জক কণা বিতরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়, যাতে প্রতিটি রঞ্জক কণা সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত থাকে। একটি মাধ্যমের মধ্যে প্রাথমিক রঞ্জক কণার মধ্যে বিদ্যমান আন্তঃ-আণবিক শক্তিগুলি রঞ্জক কণা এবং স্তরগুলির মধ্যে কাজ করে এমন সংযোগ এবং আঠালো শক্তিগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।

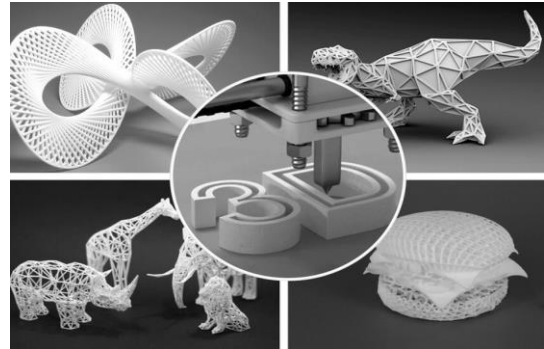
সলভেন্ট এবং ইকো-সলভেন্ট মুদ্রণের মধ্যে পার্থক্য:

বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের নামফলক, বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি মুদ্রণের ক্ষেত্রে ফ্লেক্স, পিভিসি এবং ভিনাইল প্রিন্টিংয়ের দ্রাবক এবং ইকো-দ্রাবক বহুল পরিচিত। ইকো-সলভেন্ট প্রিন্টিং প্রধানত

গৃহমধ্যস্থ পরিবেশনের জন্য অন্যতম যা পরিবেশগতভাবে নিরাপদ। এই দ্রাবক কালি রুঢ় হলেও নির্দিষ্ট গন্ধের সাথে যুক্ত থাকে। ফলে ইকো-সলভেন্ট প্রিন্ট গৃহের অভ্যন্তরে চলাচল বা কর্মজীবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। অর্থাৎ ইকো-প্রিন্টিং দ্রাবকে কোনো ক্ষতিকারক উপাদান থাকে না বরং এটি ‘বায়োডিগ্রেন্ডেবল’ বা জীবাণুবিয়োজ্য। জীবাণুবিয়োজ্য হওয়ার অর্থ এটি কোনো জটিলতা ছাড়াই মানুষের দেহে ভেঙে যেতে পারে বা মানুষের দেহ এটিকে শোষণ করতে পারে। বহিরাঙ্গণে তথা আউটডোর ব্যানার বা বড় মাপের হোর্ডিং সাধারণত মানুষের চলাচলের বা নাগালের উচ্চতায় এবং দূরত্বে থাকে বিধায় সরাসরি মানুষের ক্ষতি খুবই সীমিত। ইকো-সলভেন্ট প্রিন্ট গৃহের অভ্যন্তরে বা বহিরাঙ্গণে ব্যবহার প্রচলিত, মূলত দ্রাবক টাইপ বহিরাঙ্গন বা অভ্যন্তরীণ আবহাওয়ার অধীনে স্থায়ী হয়। তাই অতি সহজেই হোর্ডিং, ব্যানার, শপ বোর্ড, সাইন বোর্ড, ক্যানোপি, স্ট্যান্ডিং ফ্লেক্স, ইনডোর ব্র্যান্ডিং, পিওপি ডিসপ্লে, পণ্যের ব্র্যান্ডিং ইত্যাদির জন্য মানুষের প্রথম পছন্দ। বর্তমানে এই ধারায় চারুশিল্পীগণ ‘ইন্টারডিসপ্লিনারী আর্ট’ বা ‘কনটেম্পোরারী আর্ট প্রেক্ষিসে’ ইকো-সলভেন্ট প্রিন্ট তাদের প্রধান বা সহযোগী মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই ইকো-সলভেন্ট প্রিন্ট সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য।

স্টেরিও-লিথোগ্রাফি (SLA): এটি সবচেয়ে ব্যাপকভাবে এবং দ্রুত ব্যবহৃত প্রোটোটাইপিং প্রযুক্তি। এটি সঠিক এবং বিস্তারিত পলিমার অংশের উচ্চ উৎপাদন করতে পারে। এটি ছিল প্রথম দ্রুত প্রোটোটাইপিং প্রক্রিয়া, উদ্ভাবক চার্লস হালের কাজের উপর ভিত্তি করে 3D সিস্টেম, ইনকর্পোরেশন দ্বারা ১৯৮৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবর্তিত হয়। স্টেরিও-লিথোগ্রাফি হল বহুল ব্যবহৃত দ্রুত প্রোটোটাইপিং প্রযুক্তি। স্টেরিও-লিথোগ্রাফি একটি লেজার রশ্মি ট্রেস করে প্লাস্টিকের অংশ বা বস্তুকে এক সময়ে এক একটি স্তর তৈরি করে। তরল ফটোপলিমারের একটি প্ল্যাটফর্মের পৃষ্ঠে, যার ভিতরে একটি চলমান পর্যায় রয়েছে যা নির্মাণ করা অংশ সমর্থন করে। লেজার যেখানেই হোক না কেন ফটোপলিমার দ্রুত শক্ত হয়ে যায়। মরীচি তরল পৃষ্ঠ, প্ল্যাটফর্ম সমান দূরত্ব দ্বারা নত হয়, প্রতিটি স্তরের পুরুত্ব হয় সাধারণত ০.০০৩-০.০০২ ইঞ্চি, এবং একটি স্তর পরবর্তী স্তরের উপরে গঠিত হয় পূর্বে সম্পন্ন হওয়া স্তরগুলির সংযোজনে। উপাদানের স্ব-আঠালো উপকরণ, প্রতিটি পরবর্তী স্তর আগেরটির সাথে বন্ধ করে এবং এইভাবে অনেকগুলি স্তরের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ত্রিমাত্রিক বস্তু তৈরি করে। যেসব বস্তুর ওভারহ্যাং বা আন্ডারকাট আছে বুনের বা প্রিন্টের প্রক্রিয়া চলাকালীন সমর্থনটি কাঠামো দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। এইগুলো হয় ম্যানুয়ালি বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামের সাথে বিশেষভাবে ডিজাইন করা। দ্রুত প্রোটোটাইপিংয়ের জন্য একবার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হলে, পরবর্তী অংশটি প্ল্যাটফর্মের পৃষ্ঠের উপরে উন্নীত হয় এবং নিষ্কাশন অতিরিক্ত পলিমার পরিষ্কার বা পৃষ্ঠ থেকে দূর হয়। অনেক ক্ষেত্রে, UV চুলায় অংশ স্থাপন করে একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দেওয়া হয়। চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পরে, সমর্থন করে অবশিষ্ট অংশ কেটে ফেলা হয় এবং পৃষ্ঠগুলি পলিশ করা হয় (Thomas, 3D Printer and 3D Printing News, 2018)।

ড্রিডি প্রিন্ট: 3D প্রিন্টারের উদ্ভব হয়েছিল ১৯৭৪ সালে, ডেভিড ই. এইচ. জোনসের হাত ধরে। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে ‘চক হল সিস্টেম কর্পোরেশন’ ড্রিডি প্রিন্টারের পেটেন্ট পূরণ করেছে। ঐতিহ্যগত ছাপাইশিল্পের দ্বি-মাত্রিক তলে ইমেজ তৈরীর ক্ষেত্রে খোদাই, কাটাই, রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বিশেষ পদ্ধতিতে ছাপাইশিল্পের করণকৌশল চর্চা বিগত শত শত বছর পূর্বে শুরু হয়েছে। বর্তমানে প্রযুক্তির বিশেষ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে দ্বি-



প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতায় ছাপাইশিল্পের চর্চা ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার চারুশিল্পীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার উৎস:

মাত্রিকতা থেকে ত্রি-মাত্রিক ছাপাই পদ্ধতি সম্প্রতি জাগতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ত্রি-মাত্রিক ছাপাই বাণিজ্যিক উৎপাদনের একটি সাধারণ পদ্ধতি যা ‘কম্পিউটার অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং’ (CAM) নামে পরিচিত। যা ডিজিটাল মডেল এবং বিশেষ উপাদান ‘এডেড ডিভাইস’ ব্যবহার করে আকর্ষণীয় ও উদ্ভেজনাপূর্ণ নতুন এই প্রযুক্তিতে ভৌত বস্তু এক একটি স্তর তৈরী করা বা সংযোজন করা। আজকের ত্রিডি প্রিন্টারে রয়েছে অল্প সময়ের মধ্যে একটি দীর্ঘ পথ পরিক্রমা এবং এক একটি জটিল উপাদান তৈরী করতে সক্ষমতা সম্পন্ন। এতে ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, টাইটানিয়াম এবং বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিকসহ যাবতীয় উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব। কয়েক দশক ধরে মেশিন এবং যন্ত্রাংশগুলি ঐতিহ্যগত বিয়োগমূলক পন্থা ব্যবহার করে তৈরী করা পদ্ধতি সমূহ যেমন- ঢালাই, ভাঁজ, সোল্ডারিং, মেশিনিং ইত্যাদি; প্রচলিত মেশিনিংয়ের মধ্যে রয়েছে মিলিং, ড্রিলিং, গ্রিলিং, এবং টার্নিং। ত্রিডি প্রিন্টিং বেশ কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কর্মক্ষমতা এবং দক্ষতা সীমিত করেছে- এটি জটিল অংশ, ফিক্সচার, সময় এবং শক্তি সাশ্রয়ী, কম নির্ভুলতা তৈরী করতে, ব্যয়বহুল এবং কম বর্জ্য অপসারণ করতে সমর্থ হয়েছে।

ত্রি-ডি প্রিন্টিংয়ে এমন সফটওয়্যার ব্যবহার করে ত্রিডি মডেলকে স্তরে স্তরে ভাগ করে, যা অধিকাংশে কমপক্ষে ০.০১ মি.মি. পুরু হয়। প্রথমে কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে মূল প্যাটার্ন তৈরি হয়ে গেলে ত্রি-ডি প্রিন্টারে কমান্ড প্রয়োগ করে বিল্ড প্লেটের উপর চিহ্নিত করা হয়। এভাবে বিল্ড প্লেট নামিয়ে দিয়ে পরবর্তী স্তরটি পূর্বের স্তরের উপরটিতে সংস্থাপন করা হয়। ক্রমাগত সাধারণ উৎপাদন কৌশলগুলি ‘বিয়োগমূলক উৎপাদন’ হিসেবে পরিচিত। কারণ পুরো প্রক্রিয়াটি একটি পারফর্মড ব্লক থেকে উপাদানসমূহ অপসারণ করে। এটি সাধারণত ‘মিলিং মেশিন’ দ্বারা বিয়োগমূলক উৎপাদন কৌশল। এই ধরনের প্রক্রিয়া অনেক বর্জ্য সৃষ্টি করে, এই বর্জ্য সাধারণত অন্য কোনো প্রকার উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় না, এ শুধু স্ক্রাপ বা পরিত্যক্ত। সফটওয়্যারভিত্তিক ত্রি-ডি প্রিন্টিংয়ে এমন ধরনের বর্জ্য পরিহার করে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অবজেক্টটি প্রয়োজনীয় স্থানে স্থাপন করে, বাকিগুলি নেগেটিভ স্পেস হিসেবে ছেড়ে দেওয়া হয় (David, 3D Printer and 3D Printing News, 2021)।

সাধারণত একটি ত্রিমাত্রিক গঠনে বা ত্রিমাত্রিক অংশ তৈরি করতে উপাদান সংযোজন ও অপসারণ, ত্রিমাত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত অবজেক্ট তৈরির উপাদানসমূহ যোগ-বিয়োগ করে পছন্দসই আকৃতি সম্ভব। যেমন:

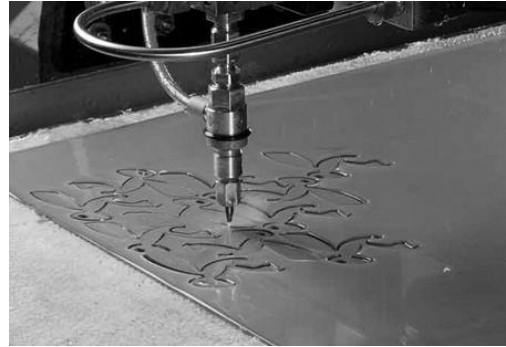
- (ক) বিশেষায়িত অংশ - প্রোটোটাইপিং: মহাকাশ, সামরিক সমরাস্ত্র, বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
- (খ) চিকিৎসা শাস্ত্র: শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ডেন্টাল
- (গ) শখ: গৃহস্থালী ব্যবহার
- (ঘ) স্থাপনা: ভবন, অটোমোবাইল, এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি
- (ঙ) চারুকলা: প্রিন্টমেকিং, ইন্টারডিসিপ্লিনারী আর্ট, সমসাময়িক শিল্প চর্চা, ত্রিমাত্রিক - ভাস্কর্য, ভার্চুয়াল আর্ট।

বিশেষায়িত অংশ বা প্রডাক্ট প্রোটোটাইপিং: একটি নতুন পণ্য তৈরি করতে সবসময় একই ডিজাইনের অনেকগুলি বিশেষায়িত অংশের পুনরাবৃত্তি জড়িত থাকে। ত্রি-ডি প্রিন্টিং- এক্ষেত্রে যুগান্তকারী শিল্পবিপ্লব ঘটিয়েছে, ডিজাইনারদের প্রকল্প বাস্তবায়নে কম্পিউটার এইডেড ডিজাইনে (CAD) সকল সংস্কার, পরিবর্তন, পরিবর্তনের মাধ্যমে বিপ্লবী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া সফল হলে ত্রি-ডি প্রিন্টিংয়ের মাধ্যমে প্রোটোটাইপ মডেল

তৈরী করে বাস্তবায়নযোগ্য সম্ভাব্যতা যাচাই বাছাইয়ে ডিজাইনারদের একমত পোষণ করতে সহজতর হয়। প্রতিটি ধারণার জন্য আলাদা আলাদা সংস্করণ তৈরি করা যায়, ফলে প্রত্যেক ডিজাইনারগণ অত্যন্ত নিবীড় পরিচর্যায় প্রত্যেকটি সেগমেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে একটি চূড়ান্ত কর্মপরিধি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয় না। এইভাবে ত্রি-ডি প্রিন্টিংয়ে ‘প্রডাক্ট প্রোটোটাইপ’ তৈরি করে তুলনা, সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য করার পূর্ণ স্বাধীনতা ও গঠনতাত্ত্বিক চিন্তার অবকাশ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ত্রিমাত্রিক পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিভিন্ন অংশ বিশেষের ‘ছাঁচ’, ডাইস, এবং টুলিং তৈরি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এছাড়াও পুরো প্রক্রিয়া বাণিজ্যিক ভাবে সফল হতে বেশ কয়েকবার ‘ছাঁচ’, ডাইস, এবং টুলিং তৈরি করতে হতে পারে এবং এটি একটি দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তিও বটে। ত্রি-ডি প্রিন্টিংয়ে ‘প্রডাক্ট প্রোটোটাইপ’ তৈরিতে পুরো প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন ধাপে খন্ড-খন্ড করে অল্প সময়ের মধ্যে স্বল্পব্যয়ে পর্যবেক্ষণমূলক নকশার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। এই প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত পণ্যের মতো সময়ের ব্যবধানকে চূড়ান্ত করে। এতে পর্যায়ক্রমিক সুবিধা ও সীমাবদ্ধতার দিকটি হলো: লেয়ার বাই লেয়ার প্রোডাকশন, ডিজাইনে অনেক বেশি নমনীয়তা এবং সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

প্রথমত, কাজিত বস্তুর একটি ভার্চুয়াল নকশা তৈরী করা হয়। এই ডিজাইনটি ত্রিডি প্রিন্টার পড়ার (Reading) জন্য এটি ব্রুপ্রিন্টের মতো কাজ করবে। ভার্চুয়াল নকশাটি কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন সফটওয়্যার ব্যবহার করে তৈরী করা হয়, যা এক বিশেষ ধরনের সফটওয়্যার, এটি সুনির্দিষ্ট অঙ্কন এবং প্রযুক্তিগত নকশা বা ইমেজ তৈরী করতে পারে। কখনও একটি ত্রিডি স্ক্যানার ব্যবহার করার মাধ্যমেও ভার্চুয়াল ডিজাইনটি তৈরী করা যেতে পারে, যা মূলত বিভিন্ন কোণ থেকে কাজিত বস্তু বা বিষয়ের একটি অনুলিপি তৈরী করে। ভার্চুয়াল মডেল প্রিন্টিংয়ের জন্য স্লাইসিং নামক একটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে মডেলটিকে অনেকগুলি স্তর ভেঙ্গে এটি করা হয়। স্লাইসিং মডেলটি নেয় এবং বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করে এটিকে শত শত বা এমনকি হাজার হাজার পাতলা, আনুভূমিক স্তরে ভাগ করে। মডেলটি কাটার পরে, স্লাইসগুলি ত্রিডি প্রিন্টারে আপলোড করার জন্য প্রস্তুত হয়। একটি ইউ.এস.বি ক্যাবল বা ওয়াই-ফাই সংযোগ ব্যবহার করে ত্রিডি প্রিন্টারে আপলোড করা হয়, তখন এটি মডেলের প্রতিটি স্লাইস পড়ে এবং স্তরে স্তরে মুদ্রণ করে। প্রিন্টিং কমান্ড অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ প্রিন্টারে দেয়া হয় এক্সট্রুডার এবং ফিলামেন্ট গরম করা ও গলতে থাকে। এই দ্রবীভূত উপাদান প্রিন্ট বেডের উপর এডেড প্রোগ্রাম এবং জমা উপকরণ দ্বারা তৈরী একে অপরের উপর লেয়ার বাই লেয়ার পদ্ধতিতে আনুভূমিক, ক্রস, জিগজ্যাগভাবে একে অপরের সাথে হেক্সাগোনাল বা হানিকোম গঠন করে।

ফিজিক্যাল থেকে পিক্সেল প্রিন্টমেকিং মুদ্রণে উন্নয়ন, আরও স্পষ্টভাবে এর বিকশিত ভিজুয়াল ভাষা প্রিন্টমেকিং, স্পষ্টতই একটি বিবর্তনীয় প্রক্রিয়া, যেমন: প্রিন্টমেকিং পর্যায়ক্রমে আলিঙ্গন করে নতুন প্রযুক্তি: ইম্পাত খোদাই, কাঠের ব্লক, ফটোমেকানিক্যাল প্রক্রিয়া, লিথোগ্রাফি, স্ক্রিন-প্রিন্টিং এবং সম্প্রতি ডিজিটাল ইঙ্কজেট প্রিন্টিং ইত্যাদি স্তর, প্রিন্টমেকিং এর ভিজুয়াল শব্দ ভাষার উন্নয়ন দ্বারা চালিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত হয়েছে বিশেষভাবে দ্বি-মাত্রিক ডিজিটাল প্রিন্টারের অবিচ্ছিন্ন প্রয়োগ একীভূতকরণের উপর ইমেজ প্রসেস এবং ডিজিটাল ইঙ্কজেট প্রিন্ট সলিউশনের প্রয়োগ দ্বারা। এই ক্রিয়া যতই জটিল এবং জটিলতর হোক না কেন, শিল্পীর দৃষ্টি শেষ পর্যন্ত পূর্বনির্ধারিত, অ্যালগরিদমিক গণনা দ্বারা মধ্যস্থতা করবে। এছাড়াও শিল্পী অভূতপূর্ব

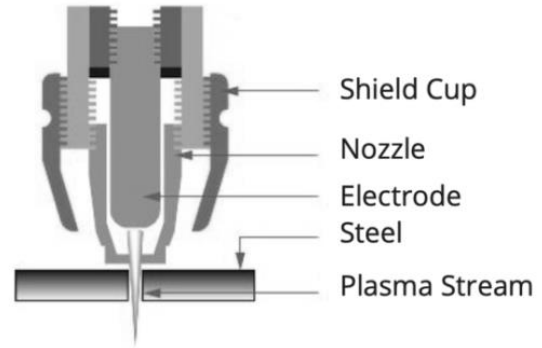


প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতায় ছাপাইশিল্পের চর্চা ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার চারুশিল্পীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার উৎস:

সৃজনশীল সম্ভাবনা এবং কি অফার এই প্রক্রিয়ার জন্য এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল এবং কাজ করার সময় শিল্পী যে ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন কম্পিউটারের সাথে সেটিই বিবেচ্য। কম্পিউটার নিজেই একটি হাতিয়ার নয়, এটি একটি মাধ্যমও নয়, তবুও এটি শিল্পীর জন্য অন্তহীনভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম। প্রিন্ট মিডিয়া এবং বেশিরভাগকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার একটি সুযোগ প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণভাবে নতুন ভিজ্যুয়াল আর্ট ফর্ম তৈরিই এর মূল উদ্দেশ্য। যে কোনো নতুন প্রযুক্তির একটি মুহূর্ত পছন্দ, ভেক্টর অঙ্কন সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে বিগত কয়েক বছর ধরে কাজের উপর স্থাপত্যকলায় ভবন, দালান বা বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছে। Computer Numerical Control কাটিং হার্ডওয়্যার এবং প্রচলিত রিলিফ প্রিন্ট কৌশল। একটি ত্রি-মাত্রিক ফর্ম প্রস্তাব করে এই CAD-কম্পিউটার-এইডেড-ডিজাইন এবং CAM-কম্পিউটার-এইডেড-ম্যানুফেকচারিং এবং RP-রেপিড প্রোটোটাইপিং প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে প্রিন্টমেকিং পরিব্যপ্ত। কারণ রিলিফ প্রিন্ট প্রসেস, কাটিং, কার্ভিং ইত্যাদি ফাইন আর্ট বা শুদ্ধ শিল্পকর্ম তৈরীতে শিল্পীরা অনায়াসে CAD, CAM, CNC প্রক্রিয়ায় এনগ্রেভিং, লেজার কাটিং ইত্যাদিতে প্রযুক্তি নির্ভরতায় সময় ও আর্থিক সাশ্রয়ী কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারেন (Tess, 3D Printer and 3D Printing News, 2017)।

প্লাজমা কাটিং

একটি প্রক্রিয়া যা গরম প্লাজমার একটি ত্বরিত জেটের মাধ্যমে বৈদ্যুতিকভাবে পরিবাহী পদার্থের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত নকশা কাটা হয়। প্লাজমা টর্চ দিয়ে কাটা সাধারণ উপকরণগুলির মধ্যে রয়েছে ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, পিতল এবং তামা, যদিও অন্যান্য পরিবাহী ধাতুগুলিও কাটা হতে পারে। প্লাজমা কাটিং প্রায়শই ফ্যাব্রিকেশন শপ, স্বয়ংচালিত মেরামত এবং পুনরুদ্ধার শিল্প নির্মাণ ও জ্র্যাপিং অপারেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়। কম খরচের সাথে মিলিত উচ্চ গতি এবং নির্ভুলতার কারণে প্লাজমা কাটিং



বৃহৎ আকারের শিল্প CNC অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে ছোট শেখের দোকানের পণ্য সরবরাহে ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। প্রাথমিক প্লাজমা কাটিং প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে সুপারহিটেড, বৈদ্যুতিকভাবে আয়নিত গ্যাসের একটি বৈদ্যুতিক চ্যানেল তৈরি করা, যেমন প্লাজমা কাটিং থেকে প্লাজমা কাটিং ওয়াকপিসের মাধ্যমে, এইভাবে একটি গ্রাউন্ডিং ক্ল্যাম্পের মাধ্যমে প্লাজমা কাটিংয়ে ফিরে একটি সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক সার্কিট তৈরি করা হয়। এটি একটি সংকুচিত গ্যাস (অক্সিজেন, বায়ু, জড় এবং অন্যান্য উপাদান কাটিংয়ের উপর নির্ভর করে) দ্বারা সম্পন্ন হয় যা ওয়াকপিসের দিকে উচ্চ গতিতে একটি ফোকাসড অগ্রভাগের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়। একটি বৈদ্যুতিক চাপ, তারপর গ্যাসের মধ্যে সংগঠিত হয়, একটি ইলেক্ট্রোডের কাছাকাছি বা গ্যাসের অগ্রভাগ এবং ওয়াকপিসের মধ্যে একত্রিত হয়। বৈদ্যুতিক চাপ কিছু গ্যাসকে আয়নিত করে, যার ফলে প্লাজমার একটি বৈদ্যুতিক পরিবাহী চ্যানেল তৈরি হয়। কর্তনকারী টর্চ থেকে বিদ্যুৎ এই প্লাজমাটির নীচে ভ্রমণ করার সাথে সাথে এটি ওয়াকপিসের মাধ্যমে গলে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত তাপ সরবরাহ করে। একই সময়ে, বেশিরভাগ উচ্চ-বেগ প্লাজমা এবং সংকুচিত গ্যাস গরম গলিত ধাতুকে উড়িয়ে দেয়, যার ফলে কাঙ্ক্ষিত নকশা বা বস্তু আলাদা হয়ে যায়, অর্থাৎ ওয়াকপিসটি কেটে যায়। প্লাজমা কাটিং হল পাতলা এবং পুরু উপাদান একইভাবে কাটার একটি কার্যকর উপায়। সনাতন পদ্ধতিতে

আর্ক কাটিং এবং অক্সি-এসিটালিন গ্যাস কাটিং পদ্ধতিতে হাতে ধরা টচগুঁলি সাধারণত ৩৮ মিমি (১.৫ ইঞ্চি) পুরু স্টিলের প্লেট পর্যন্ত কাটতে পারে এবং শক্তিশালী কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত টচগুঁলি ১৫০ মিমি (৬ ইঞ্চি) পুরু স্টিল কাটতে পারে। যেহেতু প্লাজমা কাটারগুলি ধাতু কাটার জন্য একটি খুব গরম এবং খুব স্থানীয় "শঙ্কু" তৈরি করে, তাই এগুলি বাঁকা বা কৌণিক আকারে শীট ধাতু কাটার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। অতি সম্প্রতি এই পদ্ধতিতে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সরকারি হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজের সীমানা প্রাচীরে কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদসহ প্রখ্যাত মণীষীদের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরীতে CAD, CAM, CNC প্রক্রিয়ার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে।



CNC- Computer Numerical Control (কম্পিউটার-সংখ্যাগতভাবে-নিয়ন্ত্রিত কাটিং)

মিলিং সিএনসি: স্পিন্ডল (ওয়ার্কপিস) বিভিন্ন অবস্থান এবং গভীরতায় সরানোর জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যা এবং অক্ষর সমন্বিত প্রোগ্রাম অনুবাদ করে। অভিযোজনের উপর নির্ভর করে একটি উল্লম্ব মিলিং কেন্দ্র (VMC) বা একটি অনুভূমিক মিলিং কেন্দ্র (HMC) হতে পারে। এক্ষেত্রে অনেকেই জি-কোড ব্যবহার করেন। ফাংশনগুলির মধ্যে রয়েছে: ফেস মিলিং, শোল্ডার মিলিং, ট্যাপিং, ড্রিলিং এবং কিছু বাঁক দেওয়ার অফার। আধুনিক সিএনসি সিস্টেমে, একটি যান্ত্রিক অংশের নকশা এবং এর উৎপাদন প্রোগ্রাম অত্যন্ত স্বয়ংক্রিয় অংশের যান্ত্রিক মাত্রাগুলি CAD সফটওয়্যার ব্যবহার করে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং কম্পিউটার-এডেড ম্যানুফ্যাকচারিং সফটওয়্যার দ্বারা উৎপাদন নির্দেশাবলীতে অনুবাদ করা হয়। ফলস্বরূপ নির্দেশগুলি "পোস্ট প্রসেসর" সফটওয়্যার দ্বারা একটি নির্দিষ্ট মেশিনের উপাদান তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট কমান্ডগুলিতে রূপান্তরিত হয় এবং CNC মেশিনে লোড করা হয়। যেহেতু যেকোন নির্দিষ্ট উপাদানের জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম - ড্রিল, করাত ইত্যাদি ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে - আধুনিক মেশিনগুলি প্রায়শই একটি একক "সেল" একাধিক সরঞ্জামকে একত্রিত করে। অন্যান্য ইনস্টলেশনে, একটি বাহ্যিক নিয়ন্ত্রক এবং মানবীয় ও রোবোটিক অপারেটরগুলির সাথে বিভিন্ন মেশিন ব্যবহার করা হয় যা উপাদানটিকে মেশিন থেকে মেশিনে স্থানান্তরিত করে। উভয় ক্ষেত্রেই, যেকোনো অংশ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ধাপগুলির সিরিজ অত্যন্ত স্বয়ংক্রিয় এবং এমন একটি অংশ তৈরি করে যা মূল CAD অঙ্কনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলবন্ধন ঘটায় (Thomas, "Paul G. 3D Printer and 3D Printing News. 2019)।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতায় ছাপাইশিল্পের চর্চা ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার চারুশিল্পীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার উৎস:

সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা:

লেয়ার বাই লেয়ার প্রোডাকশন ডিজাইনে নমনীয়তা এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রডাক্ট ডিজাইনারদেরকে উৎপাদনের জন্য নকশা করতে হবে না। বরং ডিজাইনাররা একটি নির্দিষ্ট অংশকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও শক্তিশালী ভাবে নকশা করবে যাতে তাঁরা পূর্ণ নকশাটি চূড়ান্ত করতে পারেন। অংশগুলি সম্পূর্ণরূপে পুনরায় ডিজাইন করা যেতে পারে যাতে তারা এমন অঞ্চলে শক্তিশালী এবং সামগ্রিকভাবে হালকা হয়। ত্রিমাত্রিক প্রিন্টিং উল্লেখযোগ্যভাবে ডিজাইন এবং প্রোটোটাইপিং প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে। কোন সমস্যা নেই একবারে একটি অংশ তৈরি করা হলেও প্রতিবার এটি উৎপাদিত হলে নকশা পরিবর্তন করা সম্ভব। যে কোনো অংশ ঘন্টার মধ্যে তৈরি হতে পারে। নকশা চক্রকে তুলনামূলকভাবে দিন বা সপ্তাহের মধ্যে নিয়ে আসা, এছাড়াও যেহেতু কয়েক বছর ধরে ত্রিমাত্রিক প্রিন্টারের দাম কমেছে, কিছু ত্রিমাত্রিক প্রিন্টার এখন সাধারণ গ্রাহক বা ছোট কোম্পানির আর্থিক নাগালের মধ্যে। সাধারণভাবে ত্রিমাত্রিক প্রিন্টিংয়ের সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে ব্যয়বহুল হার্ডওয়্যার এবং ব্যয়বহুল উপকরণ। ত্রিমাত্রিক প্রিন্টিং প্রতিটি ধরনের উৎপাদন পদ্ধতির উত্তর নয়; তবে তার অগ্রগতি ডিজাইন এবং ইঞ্জিনিয়ারিংকে আগের চেয়ে বেশি ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে। ত্রিমাত্রিক প্রিন্টার ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজাইনাররা এক ধরনের শিল্প, জটিল বিল্ডিং এবং পণ্য তৈরি করতে সক্ষম, ডিজাইন এবং যন্ত্রাংশ তৈরিসহ আমরা ত্রিমাত্রিক প্রিন্টিংয়ের প্রভাব অনেক শিল্পে দেখতে শুরু করেছি। আশা করা যায় চারুকলা চর্চায় ত্রিমাত্রিক প্রিন্টিংয়ের প্রভাব বা ব্যবহার নব দিক নির্দেশনা বা সম্ভাবনার উৎসে পরিণত হবে।

উপসংহার:

বর্তমান বিশ্বে অনেক ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই সক্ষমতাসহ ব্যাপক হাইব্রিড প্রিন্ট সমাধান পরিলক্ষিত হয়েছে। ফিজিক্যাল হিসাবে মুদ্রিত পৃষ্ঠ মাইক্রোডট এবং ৩-অক্ষের আরও ক্ষণস্থায়ী জগতের পথ প্রদর্শন করে মেশিন কোড, প্রিন্টমেকিং অনুশীলনে আমাদের বর্তমান সংজ্ঞাগুলি কীভাবে মোকাবেলা করে এই উন্নয়নে তা বিবেচ্য বিষয়। ড্রিডি প্রিন্টারগুলির সম্ভাব্য ভবিষ্যতের প্রয়োগের অনেক প্রতিশ্রুতিশীল ক্ষেত্র রয়েছে। নতুন ড্রিডি মুদ্রণ প্রক্রিয়াগুলি চারুশিল্পী, ভাস্কর, ডিজাইনার এবং প্রকৌশলীদের সৃজনশীল কর্মের জন্য ধারণা তৈরির যে দীর্ঘ সময় নেয় তা হ্রাস করেছে মূলত প্রোটোটাইপিং প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার মাধ্যমে। সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা অ্যাপ্লিকেশন, কাস্টমাইজড যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন এবং কাস্টমাইজড ভোক্তা পণ্য উৎপাদনের শক্ত হাতিয়ার হিসেবে। উপকরণগত উন্নতি এবং খরচ সাশ্রয়ী অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন যা আমরা সবে কল্পনা করতে পারি। আজ সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ ড্রিডি প্রিন্টিংয়ের সম্ভাব্য ও সফল ব্যবহার বৃদ্ধির ক্ষেত্র হল ‘চারুকলা’। ভাস্কর্য, পাবলিক স্পেসে নান্দনিক স্থাপনা, যে কোনো বৃহৎ স্থাপনা নির্মাণের পূর্বে একই স্থাপনার একাধিক (বিভিন্ন কোণ থেকে দৃশ্যমান) প্রতিযোগিতামূলক মডেল ও নকশা তৈরি, ক্রেস্ট, উপহার সামগ্রী, স্যুভেনির ইত্যাদিতে ত্রিমাত্রিক প্রিন্টিং আদর্শ এবং চারুশিল্পীদের শিল্পকর্ম তৈরির নতুন সম্ভাবনাময় উৎস হবে এ কথা নির্দিধায় বলা যায়।

তথ্যসূত্র

A.Ramya et-al, ‘3D Printing Technologies in Various Applications’, International Journal of Mechanical Engineering and Technology’, Volume7-issue3, may-June 2016.

Thomas, “3D printed jellyfish robots created to monitor fragile coral reefs,” 3D Printer and 3D Printing News, 2018.

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

- Tess, “Indian jewelry brand Isharya unveils ‘Infinite Petals’ 3D printer jewelry collection,” 3D Printer and 3D Printing News, 2017.
- Thomas, “Paul G. Allen's Stratolaunch space venture uses 3D printing to develop PGA rocket engine., 3D Printer and 3D Printing News. 2019
- David, “MX3D to install world's first 3D printed steel bridge over Amsterdam canal,” 3D Printer and 3D Printing News, 2021.

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রবৃত্তি আসক্তির নিরাময়: একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন নূরী *

প্রতিপাদ্যসার: বান্দা যখন গৌরব ও অহংকারবসত আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করাকে হয়ে জ্ঞান করে, তখন তার অন্তরের মণিকোঠায় আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে অন্য বস্তুর অভিলাষ এভাবে স্থান করে নেয় যে, সেই বস্তুকে ঘিরে তার চাহিদা ও আকর্ষণ ক্রমাগত বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অধিকন্তু, যে আল্লাহ তা'আলাকে মা'বুদরূপে স্বীকার করতে পারে না, তাঁর প্রতি হৃদয় নিংড়ানো প্রেম-ভালোবাসার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে না; বরং এসব বিষয়ে নাক সিটকিয়ে অহংকার প্রদর্শন করে, তবে অন্য বস্তুর প্রেম-ভালোবাসা ও কামনা-বাসনা তার অন্তরে এভাবে গেঁথে যায় যে, তা তাকে অধীনস্থ দাসের মত নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। হোক সে বস্তু ধন-সম্পদ অথবা নারীলিপ্সা ও প্রাচুর্যের মোহ কিংবা দুনিয়াবি কোনো পদমর্যাদা কিংবা কোনো প্রতিকৃতি অথবা এমন কোনো বস্তু যাকে সে আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে ইলাহরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে। এ প্রবন্ধে মনোপ্রবৃত্তির পরিচয়, এর অনিয়ন্ত্রিত তাড়না, এর কিছু প্রকার নিয়ে তথা নারীপ্রীতি, ব্যভিচারের অবশ্যজ্ঞাবী ক্ষতিকর প্রতিফলসমূহ, নারীর প্রতি অযাচিত কামাকর্ষণের প্রতিকার, সম্পদের লালসা, নেতৃত্বের লোভ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ এবং ইসলামিক স্কলারের বিজ্ঞমতামতের আলোকে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।]

ভূমিকা: বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি লক্ষ করলে স্পষ্ট হয় যে, প্রবৃত্তির তাড়না তার নানাবিধ সম্মোহনী শক্তি দিয়ে আমাদেরকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। তাইতো এখন এমন মুসলিমের সংখ্যা অগণিত যার অন্তরে ঠাঁই করে নিয়েছে নারীলিপ্সা ও প্রাচুর্যের মোহ, জাঁকজমকপূর্ণ বেশ-ভূষা ও আলিশান গাড়ির অভিলাষ, নেতৃত্ব-পদমর্যাদার অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা, আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদন প্রীতি ইত্যাদি। প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত এই দুই প্রান্তিক দলের মাঝামাঝিতেই অবস্থান করে। কারণ যারা সর্বদা পাপ কাজে লিপ্ত তারা সালাত নষ্ট করে এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হয়; অপরদিকে যারা বৈরাগ্যবাদী তারা আল্লাহ তা'আলা যেসব পবিত্র বস্তুকে হালাল ঘোষণা করেছেন সেগুলো হারাম ঘোষণা করতে কুঠাবোধ করে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্ম ইসলাম মানুষের সমূহ পরিস্থিতিকে বিশেষ বিবেচনায় রেখেছে। তাদের সহজাত চাহিদা ও মানবিক প্রবৃত্তিকে মূল্যায়ন করেছে। তাই তো একদিকে ইসলাম মানুষের সহজাত চাহিদা ও প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে এবং অন্যদিকে তা সুনিয়ন্ত্রিত রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে সে নিজেকে ধ্বংসের গর্তে ঠেলে দেবে না; বরং প্রবৃত্তির এ তাড়না পূরণের জন্য সে ইসলাম নির্দেশিত নিরাপদ পন্থা গ্রহণ করবে। এ প্রবন্ধে কুরআন ও হাদীছের আলোকে প্রবৃত্তি আসক্তি ও এর নিরাময় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এক: প্রবৃত্তির পরিচয়

আত্মা যা চায় বা কামনা করে তাই শাহওয়াত তথা প্রবৃত্তি। আত্মা এটি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর, চাই তা যতই বিপজ্জনক হোক না কেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, *رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ*

* অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

وَالْفَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
(মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি
পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর
নিকটই হলো উত্তম আশ্রয় [সূরাতু আলে-ইমরান, ৩ : ১৪]।” এর ভয়াবহতার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, এটা মানুষকে
জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। যেমন ‘আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “خُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ،
” وَخُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ” “জান্নাতকে অপছন্দনীয় বস্তু দ্বারা বেষ্টিত করে রাখা হয়েছে এবং জাহান্নামকে আকর্ষণীয়
বস্তু ও কামনা-বাসনা দ্বারা বেষ্টিত করে রাখা হয়েছে” (আল-কুশায়রী ৪/২১৭৪/২৮২২)।

যারা প্রবৃত্তিপূজায় মত্ত, তাদের অন্তরে প্রবৃত্তির প্রভাব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লাগে না। ফলে তাদের অন্তর
প্রবৃত্তির দাসত্ব গ্রহণ করে এর নিকট চিরতরে বন্দী হতে দ্বিধাবোধ করে না। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ
(র.) [মৃত্যু: ৭২৮হি/১৩২৮] বলেন, “যে ব্যক্তি নারীলিপ্সা কিংবা খাদ্য, পানীয় ও পোশাক-পরিচ্ছদের প্রবৃত্তির
তাবেদারিতে ডুবে থাকে, তার অন্তরের গভীরে এসব বস্তুর কামনা-বাসনা এভাবে গেঁথে যায় যে, তার ওপর
সেগুলোর এক প্রকার নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ফলে সে তার প্রবৃত্তির এমন অনুগত দাসে পরিণত হয়-
যাকে মালিক যথেষ্ট যত্নতর ব্যবহার করতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, যেসব বস্তুর প্রভাব সৃষ্টির ফলে হৃদয় চিন্তার
জগতে ডুবে থাকে তা দু’ধরনের: হয়ত সে বস্তু হবে লোভনীয় ও চিত্তাকর্ষক; কিংবা তা হবে চিন্তের জন্য আতঙ্কের
কারণ। যেমন- সম্পদ কিংবা পদমর্যাদার লোভ ও নারীলিপ্সা মানুষের হৃদয়কে মোহাবিষ্ট করে ফেলে। অপরদিকে
যার হৃদয়ে অন্যের আতঙ্ক বিরাজ করে, তার বিবেক-বুদ্ধিকে আতঙ্ক এভাবে আচ্ছাদিত করে ফেলে যেভাবে পানি
ডুবন্ত ব্যক্তিকে আচ্ছাদিত করে” (ইবনু তায়মিয়াহ মাজমু’উল ফাতাওয়া ২/৫৯৪-৫৯৫)। ইমাম শাফি’ঈ (র.) [মৃত্যু:
২০৪ হি/৮২০] বলেন, “لَزِمَتْهُ الشَّهَوَاتُ، لَزِمَتْهُ عُيُوبُهُ أَتْنَاءَ الدُّنْيَا، “যে প্রবৃত্তির পেছনে ছুটতে থাকে,
দুনিয়াদারের দাসত্ব তার পেছনে লেগে থাকে” (আয-যাহাবী ১০/৯৭)। খেয়াল-খুশীর জগতে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিমগ্ন
থাকা শরী’আতের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন, (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ،
وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا) “তাদের পরে আসলো অযোগ্য উত্তরসূরীরা, তারা সালাত নষ্ট করলো এবং
কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। সুতরাং অচিরেই তারা কুকর্মের শাস্তির সম্মুখীন হবে [সূরাতু মারইয়াম, ১৯ : ৫৯]।”

অনুরূপভাবে যুক্তির বিচারেও প্রবৃত্তির অনুসরণ নিন্দনীয় হওয়া কাম্য। কারণ, যে ব্যক্তির মাঝে জ্ঞান-বুদ্ধি, অন্তর্দৃষ্টি
ও পরিণামদর্শিতার সন্নিবেশ ঘটবে, সে কখনো নশ্বর পৃথিবীকে অবিনশ্বর আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দিতে পারে
না। এক্ষেত্রে ইবনুল জাওয়ী (র.) [মৃত্যু: ৫৯৭হি/১২০১]-এর বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,
“জেনে রাখা দরকার, প্রবৃত্তির তাড়না ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা বিস্মৃত হয়ে বর্তমান ভোগ-বিলাসে নিবিষ্ট থাকতে
উদ্বুদ্ধ করে। তা মনের চাহিদা তৎক্ষণাৎ অর্জনের প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে; যদিও এর তড়িৎ প্রতিক্রিয়াস্বরূপ
যন্ত্রণা ও কষ্ট পোহাতে হয় এবং পরবর্তী সময়ে সুখ-শান্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেহেতু
জানে যে, প্রবৃত্তির তাড়না (মানুষের ওপর) জয়যুক্ত হয়, তাই তার উচিত যে কোনো বিষয়কে সহজাত বিচার-
বুদ্ধির মানদণ্ডে যাচাই করা। কারণ, সহজাত বোধশক্তিই একজন মানুষকে ভবিষ্যৎ কল্যাণ সম্পর্কে ভাবতে শেখায়
এবং সংশয়পূর্ণ পরিস্থিতিতে কুপ্রবৃত্তির মোকাবেলায় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে; যাতে করে প্রবৃত্তির
যাবতীয় অশুভ পরিণতির হাত থেকে মুক্তির পথ নিশ্চিত করা যায়” (ইবনুল জাওয়ী যাম্মুল হাওয়া ১/১২)।

মানুষের মনে রাখতে হবে, প্রবৃত্তির আনুগত্যের ফলে যে অশুভ পরিণতি, কষ্ট-যাতনা ও আফসোসের সম্মুখীন হতে হয়, তার ওপর ধৈর্য ধারণের তুলনায় অধিক সহজ হলো প্রবৃত্তির যাবতীয় লোভ-লালসা, সম্মোহনী শক্তি ও বাহ্যিক চাকচিক্য থেকে বেঁচে থেকে ধৈর্য ধারণ করা। ইবনুল কায়্যিম (র.) [মৃত্যু: ৭৫১ হি] সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, মনের অযাচ্য প্রবৃত্তির আনুগত্যের ফলেসমূহ বিপর্যয়ে আপতিত হবার পর ধৈর্য ধরা হয়, এর তুলনায় অধিক শ্রেয় ও সহজ হলো প্রথম থেকেই সেসব প্রবৃত্তির আনুগত্য হতে বিরত থেকে ধৈর্য ধারণ করা। কারণ প্রবৃত্তির আনুগত্যে যেটুকু না স্বাদ মেলে তার চেয়ে বেশি মেলে দুশ্চিন্তা, বিষণ্ণতা ও আতঙ্ক; বরং প্রবৃত্তির সাময়িক মজা লুটতে গিয়ে মানুষ তার অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার হারাতে বসে। তদুপরি, মানুষ যখন অন্ধ হয়ে নিজের মনোবাসনার পশ্চাতে ছুটে বেড়ায় তখন আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের দরজা তার জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং সে এমন (আত্মিক) রোগে আক্রান্ত হয়, যার থেকে সে কখনো আরোগ্য লাভ করতে পারে না। কারণ, আমল অনুযায়ী মানুষের মাঝে ভাল কিংবা মন্দ গুণ ও উত্তম কিংবা বদ চরিত্র সৃষ্টি হয় (ইবনুল কায়্যিম *আল-ফাওয়াইদ* ১/১৩৯)।

প্রবৃত্তি আসক্তির মৌলিক বিষয় যথা, নারীপ্রীতি ও সম্পদের লালসা-প্রাচুর্যের মোহ এবং নেতৃত্ব-পদমর্যাদার অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে নিম্নে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

দুই: নারীপ্রীতি

নারীপ্রীতি অন্য শব্দে যৌনলিপ্সা সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা করতে গিয়ে যে বিষয়টি পরিদৃষ্ট হয়, তা হলো—বিধর্মীদের পাশাপাশি বর্তমান মুসলমানরা পর্যন্ত এহেন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দুর্গন্ধময় জলাভূমিতে ডুবে আছে। এমন মুসলমানের সংখ্যা অগণিত যারা তাদের অধিকাংশ সময় স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল এবং ইন্টারনেট জগতে বুঁদ থেকে কাটিয়ে দেয়। যাবতীয় অশ্লীল প্রোথ্রামের জন্যই যেন তাদের চক্ষু নিবেদিত। শরী'আত নিষিদ্ধ উপায়ে নিজের মনস্কামনা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে কুফরের দেশে পাড়ি জমানো মুসলিমদের সংখ্যা রীতিমতো চোখে তাক লাগার মতো।

একদিকে 'নাফসে আম্মারা' (মন্দ কাজের নির্দেশদাতা অন্তর) এবং অন্যদিকে মানব ও জিন শয়তান সর্বদা এই প্রচেষ্টায় লিপ্ত যে, কীভাবে মুসলমানের সতীত্ব ও চরিত্র বিনাশ করা যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, *وَاللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا* “আর আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করতে চান। আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও [সূরাতুন নিসা', ৪ : ২৭]।” উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি নিজের মনোপ্রবৃত্তির লাগাম অবাধ ছেড়ে দেয়, এর থেকে সৃষ্ট মাতলামি ও উন্মত্ততার কোনো সীমা থাকে না। দুনিয়ার মোহে লালায়িত ব্যক্তি যেমন সম্পদ অর্জন থেকে পরিতৃপ্ত হয় না, যেমন হাদীছের ভাষায়, *"لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا يَتَغَىٰ وَادِيَا ثَلَاثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ"* “আদম সন্তান যদি দু'টি মাঠ ভর্তি সম্পদের অধিকারী হয়ে যায়, তাহলে সে তৃতীয় মাঠ ভর্তি সম্পদ খুঁজে বেড়াবে। আদম সন্তানের পেট মাঠি ভিন্ন আর কোনো কিছুই ভরাতে পারে না” (আল-কুশায়রী ২/১০৪৮/৭২৫; আল-বুখারী ৫/৬০৭২/২৩৬৪), তেমনি যে ব্যক্তি কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে যৌনক্ষুধার পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, সেও কোনোক্রমে নিবৃত্ত থাকে না। শায়খ আলী তানতাবী (র.) বলেন, “যদি তোমাকে কারুর সমপরিমাণ সম্পদ, হিরাক্লিয়াসের মতো দেহশক্তি এবং প্রত্যেক রং-বেরঙ্গের রূপবতী নয়নাভিরাম লাস্যময়ী দশ হাজার রমণী দান করা হতো, তবে কি তুমি পরিতৃপ্ত হতে? না, কখনও না! এটি আমি যেমন জোর গলায় বলতে পারবো তেমনি স্পষ্টাক্ষরে লিখেও দিতে পারবো। তবে একজন হালাল নারীই তোমার জন্য যথেষ্ট। এক্ষেত্রে তুমি আমার কাছ থেকে প্রমাণ তলব করো না। কারণ, তোমার আশপাশে সামান্য চোখ বুলাতেই অগণিত চাক্ষুষ প্রমাণ তোমার চোখের সামনেই পেয়ে যাবে” (আত-তানতাবী ১৪৬; ইবনুল জাওযী *সাইদুল খাতির* ২৬১)।

ইবনুল মুকাফ্ফা রচিত “আল-আদাবুল কাবীর” গল্পে বর্ণিত আছে, “জ্ঞাতব্য যে, যেসব বিষয় দীন বিনাশে অগ্রণী ভূমিকা রাখে, মানবসম্পদ বিনষ্ট করে ও শারীরিক শক্তি ক্ষয় করে, অপমান ত্বরান্বিত করে ও মনুষ্যত্ব দূরীভূত করে, আত্মগরিমা ও ভাবগাম্ভীর্য দ্রুত বিনাশ করে- তন্মধ্যে নারীপ্রীতি অন্যতম। আশ্চর্যের বিষয় হলো, সুস্থ মস্তিষ্ক লালনকারী-বোধশক্তিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি হঠাৎ দূরে অবস্থানরত অচেনা চাদরাবৃত রমণীকে দেখে তার সৌন্দর্য ও রূপ-মাধুর্য নিয়ে নিজ অন্তর্জগতে বিভিন্ন চিত্র অংকনে মত্ত হয়ে যায়। এক পর্যায়ে সে ওই রমণীকে না দেখে না জেনে তার ভালোবাসায় দেওয়ানা ও মাতোয়ারা হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে সেই আসক্তি ও মাতলামি এতই গভীর হয়ে যায় যে, উক্ত রমণীর পক্ষ থেকে সে চরম হেনস্থা ও অপমানের শিকার হবার পরেও সে তাকে প্রেম করা থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারে না। সে তাকে এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হয় না। এভাবেই সে ওই স্বাদ না পাওয়া প্রেমাস্পদের প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকে। প্রকৃত কথা হলো, পৃথিবীর বুকে যদি কেবল একজন নারীই বাকি থেকে যেতো, তাহলে পুরুষ তার ব্যাপারে ভাবতো যে, এই নারীর মাঝে এমন কিছু গুণ আছে যা স্বাদযোগ্য অন্যান্য বস্তুর মাঝে অবিদ্যমান। মূলত এটিই নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার চরম পর্যায়” (ইবনুল মুকাফ্ফা ১১৭-১১৮)।

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুতর ও ভয়াবহ ফেতনা হলো নারীর ফেতনা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.” “আমার (ইত্তিকালের) পরে আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য নারী অপেক্ষা বড় ফেতনার শঙ্কা আর কিছুতেই রেখে যাইনি” (আল-কুশায়রী ৪/২৭৪০/২০৯৭; আত-তিরমিযী ৫/২৭৮০/১০৩)। ইমাম তাউস (র.) আল্লাহর বাণী (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا) “মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে [সূরা তুনিসা, ৪ : ২৮]”-এর ব্যাখ্যায় বলেন, “পুরুষ যখন কোনো নারীকে দেখে, সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে” (ইবনুল জাওযী যাম্মুল হাওয়া ১/১৬৪; ইবনুল কায়্যিম রাওদাতুল মুহিব্বীন ১/২০৩)। ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, “لَمْ يَكُنْ كُفْرٌ مَنْ قَدْ مَضَى إِلَّا مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ وَهُوَ” “কিন্তু কুফর মাত্রই নারীর কারণেই কুফরে লিপ্ত হয়েছিলো। অনুরূপভাবে পরবর্তী প্রজন্মও নারীর কারণেই কুফরে লিপ্ত হবে” (ইবনুল জাওযী যাম্মুল হাওয়া ১/১৬৩; ইবনুল কায়্যিম রাওদাতুল মুহিব্বীন ১/৯৬)।

অশ্লীলতায় উন্মত্ত হয়ে পাপাচারে জড়ানোর জন্য বেশ কিছু মাধ্যম ও কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হলো, গান শ্রবণ করা। কারণ, গান হলো ব্যভিচারের মন্ত্র এবং অশ্লীলতার বড় উপলক্ষ। এ প্রসঙ্গে ইয়াজিদ ইবনুল ওয়ালীদ বলেন, “হে উমাইয়্যার বংশধর, তোমরা গান শোনা থেকে বিরত থাকো। কারণ, তা লাজ-লজ্জা হ্রাস করে, কামবৃত্তি বৃদ্ধি করে এবং মনুষ্যত্ব বিনাশ করে। নিশ্চয়ই তা মদের স্ত্রীভাষিক, নেশার মতো কাজ করে। যদি তোমাদের গান শুনতেই হয়, তবে নারীদেরকে এর থেকে দূরে সরিয়ে রাখো। কারণ, গান হলো ব্যভিচারের উপলক্ষ” (ইবনুল কায়্যিম ইগাছাতুল লাহফান ১/২৪৫-২৪৬)।

ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন, “এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কোনো নারী কোনো পুরুষের অবাধ্য হলে, তখন বশে আনার জন্য সে তাকে গানের আওয়াজ শুনতে চেষ্টা করে। এতে নারী তার পুরুষসঙ্গীর অনুবর্তী হয়ে পড়ে।” এটি এ কারণে যে, নারী আওয়াজের প্রতি খুব সংবেদনশীল ও দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল। আর সেই আওয়াজ যদি গানের হয় তখন তার এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির নেপথ্যে দুটি কারণ কাজ করে, গানের আওয়াজ ও এর অন্তর্নিহিত অর্থ। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘হাদী’ (গানের মাধ্যমে উট হাঁকিয়ে নিয়ে যায় যে চালক) আনজাশাকে বলেছিলেন, يَا

"أَنْجَسَتْهُ رُوَيْدُكَ سَوْفًا بِالْفَوَارِيرِ." "হে আনজাশা, তোমার কাঁচপাত্র নিয়ে ধীরে চালাও" (আল-কুশায়রী ৪/১৮১১/২৩২৩)। এখানে 'কাঁচপাত্র' বলে রমণীদের বুঝানো হয়েছে (আল-কুশায়রী ৪/১৮১২/২৩২৩)।

আর যদি মন্ত্রতুল্য এই গানের সাথে দফ, বাঁশি, নাচ যুক্ত হয় তবে বলা চলে— আওয়াজের কারণে যদি নারী গর্ভবতী হতো, তাহলে সেই আওয়াজ হলো এই গানের আওয়াজ। আল্লাহর শপথ! এমন কত স্বাধীন নারী রয়েছে গানের প্রভাবে যে বেশ্যা হিসেবে পরিণত হয়েছে। আর এমন কত স্বাধীন পুরুষ রয়েছে যে গানের প্রভাবে শিশু অথবা কিশোরীর দাসে পর্যবসিত হয়েছে। এই গানের প্রভাবে কত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি মানুষের নিকট ঘণার পাত্রে রূপান্তরিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এমন অনেক সুস্থ-স্বাভাবিক ব্যক্তি রয়েছে, যার মাঝে গানের প্রভাবে বিভিন্ন প্রকারের রোগ বাসা বেঁধেছে (ইবনুল কায়্যিম ইগাছাতুল লাহফান ১/২৪৭)।

নারীপ্রীতি বা নারী-কেলেঙ্কারিতে জড়ানোর আরেকটি ধ্বংসাত্মক মাধ্যম হলো- হারাম দৃষ্টি। এমন শত শত ঘটনা রয়েছে, যেখানে একবার নজর পড়ে যায় বাজারে চলমান কোনো সুন্দরী রমণীর উপর কিংবা টিভি স্ক্রিন অথবা ম্যাগাজিনের কোনো আকর্ষণীয় চিত্রনাট্যিকার উপর, এরপর থেকে শুরু হয় যাবতীয় অশ্লীলতা-পঙ্কিলতা, জ্বালা-যন্ত্রণা এবং অনুশোচনা।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, "إِذَا خَافَ الْفِتْنَةَ لَا يَنْظُرُ كَمْ نَظْرَةً قَدْ أَلْقَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا الْبَلَاءِ." "যেখানে ফিতনার ভয় হয়, সেখান থেকে দৃষ্টি সংযত রাখা উচিত। কারণ, অনেক সময় দৃষ্টি ব্যক্তির অন্তরে নানান উদ্বেগ-উৎকর্ষ সৃষ্টি করে" (ইবনুল জাওয়াযী যাম্মুল হাওয়া ১/৯৩; ইবনুল কায়্যিম রাওদাতুল মুহিব্বীন ১/৯৫)।

ইবনুল জাওয়াযী (র.) অসংযত দৃষ্টির ভয়াবহতার ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, "জেনে রাখা উচিত যে, দৃষ্টি হলো অন্তরের সংবাদদাতা। দৃষ্টিই তো দৃশ্যমান যাবতীয় বস্তুর সংবাদ অন্তরে নকল করে এবং সেগুলোর চিত্র অঙ্কন করে থাকে। এক পর্যায়ে সেগুলো মানুষের মনন ও চিন্তা-চেতনায় এমনভাবে ছেয়ে যায় যে, সে নিজের জন্য কল্যাণকর পারলৌকিক কোনো বিষয় নিয়ে আর ভাববার সুযোগ পায় না। সুতরাং অবাধ ও অসংযত দৃষ্টি যেহেতু অন্তরের যাবতীয় কুপ্রবৃত্তির মূল, বিধায় অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষার নিমিত্তে শরী'আত দৃষ্টি সংযত ও অবনমিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ "আপনি মু'মিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যাতে নিজেদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে [সূরাতুন নূর, ২৪ : ৩০]।" ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ﴾ "আর আপনি মু'মিন নারীদের বলে দিন, তারা যাতে নিজেদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে [সূরাতুন নূর, ২৪ : ৩১]।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই গুরুত্বপূর্ণ বিধানের অন্তর্নিহিত কারণের প্রতি ইঙ্গিত করেন এবং এই বিধান লঙ্ঘনের ফলে অশুভ পরিণতির প্রতি সতর্ক করে বলেন, ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ "এবং তারা (মু'মিন পুরুষরা) যেন তাদের লজ্জাস্থানকে হেফায়ত করে [সূরাতুন নূর, ২৪ : ৩০]।" ﴿وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ "এবং তারা (মু'মিন নারীরা) যেন তাদের লজ্জাস্থানকে হেফায়ত করে [সূরাতুন নূর, ২৪ : ৩১]" (ইবনুল জাওয়াযী যাম্মুল হাওয়া ১/৮২)।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (র.) হারাম দৃষ্টি সম্পর্কে উল্লেখ করেন কীভাবে হারাম দৃষ্টির ফলে মানুষ পাপ-পঙ্কিলতা ও অশ্লীলতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, এমনকি আল্লাহর সঙ্গে শিরক করতে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করে না। তিনি বলেন, "হারাম দৃষ্টি ও মেলামেশা যদি কদাচিৎ ঘটে থাকে, তবে তা ক্ষমাযোগ্য; এই শর্তে যে তা কবিরার (বড়) গুনাহের পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না। আর যদি হারাম দৃষ্টি ও মেলামেশা উপর্যুপরি সংঘটিত হয়, তখন তা

কবির (বড়) গুনাহে পর্যবসিত হয়। এসব কাজে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় লিপ্ত থাকা অনেক সময় কম অশ্লীল কাজের তুলনায় অধিক গুরুতর বিবেচিত হয়। কারণ, প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে (নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে) নিরবচ্ছিন্নভাবে চেয়ে থাকার ফলে যে প্রণয়-প্রীতি ও মেলামেশার সৃষ্টি হয় তার ভয়াবহতা অধিক গুরুতর এমন ব্যভিচারের তুলনায় যা ক্রমাগতভাবে সংঘটিত হয় না। এ কারণেই ফিকহশাস্ত্রবিদগণ বলেন, ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী হলো, যে কবির গুনাহে লিপ্ত হয় না এবং ক্রমাগতভাবে ছগিরা (নগণ্য) গুনাহ করে না। অনেক সময় তো হারাম দৃষ্টি ও মেলামেশা আল্লাহর সঙ্গে শিরকের পর্যায়ে পর্যন্ত নিয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ) “আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তারা তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহর ভালোবাসার মতোই [সূরা তুল বাকারাহ, ২ : ১৬৫]।” এ কারণেই মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার ভালোবাসার দিক দুর্বল হয়ে পড়লে তখন তদস্থলে কোনো প্রতিচ্ছবির প্রণয়-ভালোবাসা ঠাই করে নেয়। এক্ষেত্রে মিশরের আযীযের মুশরিক স্ত্রী এবং লুত (আ.)-এর মুশরিক সম্প্রদায়ের কাহিনী প্রণিধানযোগ্য।”

ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন, “আল্লাহ তা'আলা চক্ষুকে অন্তরের আয়না হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। বান্দা যখন তার দৃষ্টি অবনমিত রাখে, তখন অন্তর স্বীয় কুপ্রবৃত্তি ও কাম-বাসনা দমিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে বান্দা যখন তার দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে না, তখন অনুবর্তী অন্তর স্বীয় প্রবৃত্তিকে আর দমিয়ে রাখতে সক্ষম হয় না।” তিনি আরও বলেন, “কুদৃষ্টি অন্তরে দাগ কাটা মাত্রই বুদ্ধিমান ব্যক্তির তড়িৎ পদক্ষেপ হয়- এই কুদৃষ্টির উৎসকে অন্তর থেকে সমূলে উৎপাটনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। তখন এই রোগের সহজে চিকিৎসা সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে কেউ হারাম ছবির প্রতি যখন বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, এর সৌন্দর্য নিয়ে পূর্বাপর গবেষণা চালায় এবং শূন্যহৃদয়ে এর বিচিত্র চিত্র অঙ্কনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন সেই ছবি তার হৃদয়ের গহীনে স্থান করে নেয়। ক্রমাগত দৃষ্টিপাত যেন সেই পানির মতো, যা গাছকে পানি সিঞ্চন করে। ফলে ভালোবাসার বৃক্ষ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে অন্তরকে কলুষিত করে দেয় এবং শরী'আতের যাবতীয় নির্দেশনাবলির চিন্তা-ফিকির থেকে উদাসীন করে রাখে। এক পর্যায়ে সেই ব্যক্তি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ ও পাপ-পঙ্কিলতায় জড়াতে আর দ্বিধাবোধ করে না” (ইবনুল কায়্যিম রাওদাতুল মুহিব্বীন ১/৯২, ৯৪, ৯৫)।

যেসব কারণে মানুষ নারীপ্রীতির মতো ভয়াল খাবার শিকার হয়, তন্মধ্যে অন্যতম হলো, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। এ ধরনের মেলামেশা অশ্লীলতা ও পাপ-পঙ্কিলতায় জড়ানোর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর উপকরণ। ইবনুল কায়্যিম (র.) নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণের ভয়াবহ ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে বলেন, “এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দেয়াই সকল বিপদ ও অকল্যাণের মূল উৎস। যেসব কারণে ব্যাপক মৃত্যু ও প্রাণবিনাশী মহামারী মানবজাতিকে গ্রাস করে, তন্মধ্যে এটি অন্যতম। মূসা (আ.)-এর সৈন্যদলের সাথে পতিতাদের মেলামেশার ফলে যখন অশ্লীলতার ব্যাপক ছড়াছড়ি দেখা দেয়, তখন আল্লাহ তাদের উপর এমন মহামারী প্রেরণ করে যার ফলে একদিনে সত্তর হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। তাফসীরখুসুমুহে এই ঘটনা বেশ প্রসিদ্ধ” (আল-কুরতুবী ৭/৩১৯; আস-সুযুতী ৩/৬১১; ইবন কাছীর ২/২৬৮-২৬৯)। সুতরাং ব্যাপক মৃত্যুর অন্যতম বড় কারণ হলো, ব্যভিচারের ছড়াছড়ি, যা পুরুষের সাথে নারীর অবাধ মেলামেশা ও পুরুষের সামনে নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শনপূর্বক ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ তৈরির কারণে সৃষ্টি হয় (ইবনুল কায়্যিম আত-তুরুকুল হিকমিয়া ২/২৭৪)।

এখানে যে বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য তা হলো, মানুষ তখনই প্রবৃত্তির পেছনে লালায়িত হয়ে ছুটতে থাকে যখন তার তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস) দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ, অন্তরে তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস) ও ইখলাস (কোনো কর্ম পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর জন্য করা) যেই পরিমাণ হ্রাস পাবে, তদন্তুলে অশ্লীলতা ও প্রবৃত্তির আসক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে (ইবনুল কায়্যিম *আল-ফাওয়াইদ* ১/৮১)। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (র.) বলেন, এর (প্রেমাসক্তি ও প্রবৃত্তিপূজা) শিকার তারাই হয় যারা আল্লাহর ইখলাস থেকে উদাসীন থাকে এবং যারা এক প্রকার শিরকের বেড়া জালে আবদ্ধ। আল্লাহর মুখলিস (নিষ্ঠাবান) বান্দারা এই ধরণের ভয়াল রোগ থেকে মুক্ত থাকে। তাই তো আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে বলেন, ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ (আ.সজ্জ হননি), যাতে আমরা তার থেকে মন্দকাজ ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। তিনি তো ছিলেন আমার মুখলিস ও বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত [সূরাতু ইউসুফ, ১২ : ২৪]। আযীযের স্ত্রী মুশরিকা ছিলো বিধায় সে বিবাহিতা হওয়া সত্ত্বেও কেলেকারিতে জড়িয়ে পড়েছিলো। পক্ষান্তরে ইউসুফ (আ.)-এর কুমারিত্ব, আযীযের স্ত্রীর অনবরত কুপ্ররোচনা ও তা বাস্তবায়নে অন্যান্য নারীর সাহায্যগ্রহণ, ইউসুফ (আ.)-এর চারিত্রিক সংযমের ফলে আযীযের স্ত্রী কর্তৃক তাঁকে কারাদণ্ডের মাধ্যমে সাজা প্রদান- এসব প্রতিকূল পরিস্থিতি একত্রিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর ইখলাসের বদৌলতে নারীকেলেকারি থেকে রক্ষা করেছেন। এই যেন আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর বাস্তবচিত্র, ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغَوِّيَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ (সে (শয়তান) বললো, আপনার ক্ষমতা-সম্মানের শপথ! অবশ্যই আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবো। তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত [সূরাতু সোয়াদ, ৩৮ : ৮২-৮৩]। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَالِبِينَ﴾ (বিভ্রান্তদের /প্রবৃত্তিপূজারীদের মধ্যে যে তোমার অনুসরণ করবে, সে ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা থাকবে না [সূরাতুল হিজর, ১৫ : ৪২]। আর الْغَى আল-গাই হলো, প্রবৃত্তির অনুসরণ (ইবন তায়মিয়াহ *মাজমু'উল ফাতাওয়া* ১৫/৪২১)।

অনিয়ন্ত্রিত নারীলিপ্সার ফলে ইহকালীন ও পরকালীন বিভিন্ন শাস্তি ও দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। ইবনুল জাওযী (র.) বিভিন্ন প্রকার শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, “জ্ঞাতব্য যে, শাস্তি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, কখনো শাস্তি দ্রুত সংঘটিত হয়ে যায় আবার কখনো সংঘটিত হয় বিলম্বে, কখনো এর প্রভাব দৃশ্যমান হয় আবার কখনো তা অদৃশ্যমান থেকে যায়। সবচেয়ে বিষয়কর শাস্তি হলো যা শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুভব করতে পারে না। সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হলো ঈমান ও আল্লাহর মা'রিফাত (পরিচয় লাভ) থেকে বঞ্চিত হওয়া। এর পরবর্তী স্তর হলো- অন্তর মরে যাওয়া, মুনাজাতের স্বাদ অন্তর থেকে মুছে যাওয়া, পাপের আসক্তি প্রবল হওয়া, কুরআন ভুলে যাওয়া, ইস্তিগফার (আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা)-এর ব্যাপারে অবহেলা করা ইত্যাদি শাস্তি যার ফলে দ্বীনের ক্ষতিসাধন হয়। অনেক সময় শাস্তি অন্তরের গহীনে অন্ধকারের মতো ধীরে ধীরে ছেয়ে যায়, এক পর্যায়ে অন্তর্জগৎ এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় যে, অন্তর্দৃষ্টি লোপ পেয়ে যায়। সবচেয়ে হালকা শাস্তি হলো দুনিয়াতেই শারীরিক শাস্তির সম্মুখীন হওয়া। অনেক সময় কুদৃষ্টির শাস্তি হিসেবে দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। সুতরাং কারো যদি মনে হয় যে- তার দ্বারা কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তাহলে তার উচিত হবে শাস্তির সম্মুখীন হবার পূর্বেই বিশুদ্ধ তাওবা করা। হতে পারে তার এমন তাওবার ফলে তার জন্য পূর্বনির্ধারিত শাস্তি রহিত হয়ে যাবে” (ইবনুল জাওযী *যাম্মুল হাওয়া* ১/২১০)।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (র.) কাম-বাসনার ভয়াবহ পরিণতির বিষয়ে আলাপ করতে গিয়ে বলেন, “যে কারও হৃদয় অবৈধ কোন ছবিতে সুকঠিনভাবে মজে থাকে; চাই সে ছবি হোক কোন সুন্দরী রমণীর কিংবা সুদর্শন

কোনো বালকের, এটি এক পীড়াদায়ক সাজা, যার সমতুল্য কোনো সাজা হতেই পারে না। এই প্রকারের লোকেরা সাধারণত অত্যধিক যাতনায় ক্লিষ্ট আর অনধিক সওয়াবে পুষ্ট। কারণ, কারও হৃদয় যদি কোনো নিষিদ্ধ ছবির প্রতি ছায়ার মতো আটকে থাকে, ওই হৃদয় ছবির প্রতি তীব্র মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে। এর জেরে তার হালখাতায় কত যে পাপ, গুনাহ আর নোংরামি লিপিবদ্ধ করা হয়, তা আল্লাহ ভিন্ন কারও জানার সাধ্য নেই। এ ধরনের অপরাধের সবচেয়ে কঠোর শাস্তি হলো, অন্তর আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হতে গাফিল ও বিরাগী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অন্তরে আল্লাহর ইবাদাত ও ইখলাসের স্বাদ গেঁড়ে বসলে, তা কখনও ইবাদাতের চেয়ে অতি উত্তম, রুচিকর ও স্বাদময় কোনো কিছুকে খোঁজে পায় না” (ইবন তায়মিয়াহ্ *মাজমু'উল ফাতাওয়া* ১০/১৮৬-১৮৭)। তিনি আরও বলেন, “নিশ্চয়ই অশ্লীলতার প্রতি মোহময়তা একটি আত্মিক ব্যাধি। লুত সম্প্রদায়ের চিত্র তুলে ধরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, (إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) “নিশ্চয়ই তারা তাদের মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে [সূরা তুল হিজর, ১৫ : ৭২]।” আবু হুরায়রা (রা.)-বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّانَا، مُدْرِكُ ذَلِكَ، لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زَنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجُلُ زَنَاهَا الْخَطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيَكْذِبُهُ. “আদম সন্তানের উপর ব্যভিচারের যে অংশ লিখিত রয়েছে তা অবশ্যই সে প্রাপ্ত হবে। নিঃসন্দেহে দু'চোখের ব্যভিচার হলো তাকানো, দু'কানের ব্যভিচার হলো শোনা, জিহ্বার ব্যভিচার হলো কথোপকথন করা, হাতের ব্যভিচার হলো শক্ত করে ধরা, পায়ের ব্যভিচার হলো হেঁটে যাওয়া, হৃদয়ের ব্যভিচার হচ্ছে কামনা-বাসনা করা। আর লজ্জাস্থান তা সত্যায়িত করে বা মিথ্যা সাব্যস্ত করে” (আল-কুশায়রী ৪/২০৪৭/২৬৫৭; আল-বুখারী ৫/২৩০৪/৫৮৮৯)।

হাদীছে আলোচ্য যিনার প্রকারভেদ হতে কেউ দর্শন, শ্রবণ আর কথোপকথনে লিপ্ত হয়। কেউবা আবার একমাত্র এগিয়ে স্পর্শ ও মেলামেশায় জড়িয়ে যায়। আবার কেউ কেউ দর্শন ও চুম্বনের পথে পা বাড়ায়। এর সবগুলোই হারাম ও নিষিদ্ধ। যেখানে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ব্যভিচারীদের প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতি দেখাতে বারণ করেছেন এবং তাদের উপর ‘হদ’ (ইসলামের নির্ধারিত শাস্তি) কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে হদের তুলনায় লঘু শাস্তি যেমন- সঙ্গ ত্যাগ, শাস্তি, নিষেধ তিরস্কার ইত্যাদির ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কেমন হওয়া উচিত? ফাসিক (পাপিষ্ঠ) লোকদের প্রতি আমাদের বিদেষ লালন করা এবং হাদীছে উল্লিখিত ব্যভিচারের যে প্রকারেই সে জড়িত থাকুক না কেন, তাকে সর্বান্তকরণে ঘৃণা করা উচিত” (ইবন তায়মিয়াহ্ *মাজমু'উল ফাতাওয়া* ১০/১৮৮-১৮৯)।

ব্যভিচারের ক্ষতি ও ধ্বংসযজ্ঞতা বিষয়ে ইবনুল কায়্যিম (র.) একাধিক স্থানে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, “যিনা বা ব্যভিচার সমুদয় অকল্যাণ বয়ে আনার পাশাপাশি ধার্মিকতা বিসর্জন, ইসলামী বোধ-বিশ্বাসে ঘাটতি, মানবিকতার সংকট এবং আত্মমর্যাদাবোধের বিপর্যয়কে তরাসিত করে। ফলে ব্যভিচারী কাউকে আপনি ধর্মভীরু, প্রতিশ্রুতি রক্ষণশীল, সত্যবাদী, বন্ধুত্বের মূল্যায়ণকারী এবং নিজ পরিবারের প্রতি আন্তরিক আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন দেখতে পাবেন না (ইবনুল কায়্যিম *রাওদাতুল মুহিব্বীন* ১/৩৬০-৩৬২)।

তিন: ব্যভিচারের অবশ্যম্ভাবী ক্ষতিকর প্রতিফল

ব্যভিচারী ব্যক্তি নিজ পরিবার-পরিজন ও সৃষ্টির সম্মান ভুলুষ্ঠিত করার মাধ্যমে আপন প্রতিপালককে ক্রোধান্বিত করে তোলে। তার চেহারা ও মুখাবয়বে কালিমা, মায়াজীনতা, মলিনতা, দুশ্চিন্তা ও বিষাদের রেখা স্পষ্ট পরিলক্ষ্য হয়। অন্তরে মরিচা পড়ে এবং এর উজ্জ্বলতা বিলীন হয়ে যায়। সমাজের চোখে ব্যভিচারীর ইজ্জত-সম্মান খোয়া যায়। প্রতিপালকের কাছেও সে লাঞ্ছিত থাকে এবং বান্দার চোখেও সে মানহীন অশ্রদ্ধার পাত্র হয়। তার সুন্দর ও মধুর

নামগুলো ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তাকে কদাকার ও কুৎসিত নানা অভিধায় অভিষিক্ত করা হয়। তার অন্তরাত্মা সংকুচিত হয়ে যায় এবং নানা বিষণ্ণতায় ভুগতে থাকে। কারণ, ব্যভিচারদুষ্টরা তাদের মনের আশা পূরণে সফল হয় না। কারণ, যারা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ পন্থায় জীবনোপভোগ করতে চায়, আল্লাহ তাদেরকে তাদের অভিলাষ বিরোধী বস্তুর মাধ্যমে শায়েস্তা করে থাকেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলার কাছে সুন্দর ও উত্তম বদলা পেতে চাইলে তাঁর আনুগত্যের পথে এগোতে হবে। অন্যায়-অন্যায়্য পাপ-পঙ্কিল পথে আল্লাহ তা'আলা কস্মিনকালেও কল্যাণ দেন না” (প্রাগুক্ত)।

অন্যত্র ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন, “জেনে রাখো, কৃতকর্ম অনুপাতে প্রতিদান নিরূপিত হয়। হারাম বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট হৃদয় যখনই তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, তা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে রাখে। তার বেরিয়ে আসার পথে অন্তরায় হয়ে পথ আটকে দেয়। আখিরাতেও তাকে এমন পরিণতি বরণ করতে হবে। সামুরা ইবনু জুনদাব (রা.)-বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “গতরাতে আমি দেখলাম, দু'জন লোক এসে আমার দুহাত ধরে আমাকে নিয়ে চললো। আমরা অহসর হয়ে তন্দুরের ন্যায় এক গর্তের নিকট উপস্থিত হলাম। গর্তের উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ ও নীচের অংশ প্রশস্ত এবং এর তলদেশ হতে আগুন জ্বলছিল। আগুন গর্তের মুখের নিকটবর্তী হলে সেখানের লোকগুলোও উপরে চলে আসে যেন তারা গর্ত হতে বের হয়ে যাবে। আগুন ক্ষীণ হয়ে গেলে তারাও (তলদেশে) ফিরে যায়। গর্তের মধ্যে বহুসংখ্যক উলঙ্গ নারী-পুরুষ ছিলো। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তাঁরা বললেন, তারা ব্যভিচারী” (আল-বুখারী ৫/২৩০৪/৫৮৮৯)। এই হাদীছ থেকে আনুমেয় হয়ে যে, পার্থিব জগতে ব্যভিচারদুষ্টদের অন্তরের ছবি কী দুর্বিষহ হতে পারে! যখনই তারা কুপ্রবৃত্তির প্রজ্বলিত উনুন ছেড়ে তাওবা ও প্রত্যাবর্তনের উন্মুক্ত আকাশে প্রত্যাগমন করার মনস্থির করে, তখনই তারা আবার পিছুটান দেয়; ফের ফিরে যায় অন্ধকারের চোরাগলিতে” (ইবনুল কায়্যিম রাওদাতুল মুহিব্বীন ১/৪৪২)। অপর স্থানে তিনি বলেন, “বুদ্ধিমান ব্যক্তির জেনে রাখা উচিত, এক পর্যায়ে উপনীত হয়ে কাম-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তি পূজারীরা তাতে আর স্বাদ, মোহ ও আনন্দ খোঁজে পায় না। তা সত্ত্বেও তারা সে পথ হতে ফিরে আসতে পারে না। কারণ, কাম-বাসনা চরিতার্থ করায় সে পথ যেন তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এ কারণে কদাচিত মদ্যপায়ী ও দৈবাৎ ব্যভিচারী যে আনন্দ আর স্বাদ অনুভব করে থাকে; নেশাগ্রস্ত মদখোর ও নিয়ত ব্যভিচারী তার এক দশমাংশ স্বাদও উপভোগ করতে পারে না” (প্রাগুক্ত ১/৪৭০)।

পতিতাবৃত্তি বা ব্যভিচারের ক্ষতির বিবরণ তুলে ধরে শায়খ মুহাম্মদ আল-খিদ্র হুসায়ন (র.) বলেন, “ব্যভিচারের অকল্যাণ সর্বগ্রাসী এবং অমঙ্গল অতলস্পর্শী।” তিনি বলেন, “যিনা-ব্যভিচার ইজ্জত-সম্মান ক্ষুণ্ণ করে, আত্মমর্যাদায় কালিমা লেপন করে, নিরাপত্তার নির্মলতাকে কলুষিত করে, ঐক্যের ভিত্তি ছিঁড় ধরায়, দেহ ও অন্তরে নানাবিধ মরণব্যাদির পট তৈরি করে দেয়। যে গোষ্ঠী আখলাক-বর্জিত, যাদের ইজ্জত-আবরু কলঙ্কিত, নিরাপত্তা বিদ্বিগ্ন এবং যে দলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মন্দের বসবাস, যাদের পুরো দেহজুড়েই দূরারোগ্য ব্যাধিতে আঁটোসাঁটো; তাদের বেঁচে থাকার মাঝে কী সার্থকতা আছে! (হুসায়ন ১/২৩)।

চার: নারীর প্রতি অযাচিত কামাকর্ষণের প্রতিকার

কাম-বাসনা বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা উত্তর আমরা এর প্রতিকার ও চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করবো। আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী (র.) ‘যাম্মুল হাওয়া বা কুপ্রবৃত্তির নিন্দা’ গ্রন্থে এবং ইবনুল কায়্যিম (র.) ‘রাওদাতুল মুহিব্বীন বা প্রেমিকদের বাগিচা’ গ্রন্থে দুষ্ট প্রবৃত্তির প্রতিকার বিষয়ে সবিস্তার আলোকপাত করেছেন। এর বিবরণে অনুপুঙ্খ আলোচনা রেখেছেন। ইবনুল জাওযী (র.) কাম-প্রবৃত্তির প্রতিটি পর্যায় ও স্তরের চিকিৎসা বাতলে দিয়েছেন। অবৈধ

দৃষ্টি, একান্তে পরনারীর সঙ্গে মিলিত হওয়া ইত্যাদি প্রবৃত্তি রোগের স্বতন্ত্র পথ্য তিনি বলে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইবনুল কায়্যিম (র.) কামনা-বাসনা ও নারীলালসা থেকে রেহাই পাবার জন্য সামগ্রিকভাবে পঞ্চাশটি উপায় তুলে ধরেছেন।

আবুল ফারজ ইবনুল জাওয়ী (র.) কুপ্রবৃত্তি হতে মুক্তির চিকিৎসাস্বরূপ যে উপায়গুলো উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সম্পর্কে তিনি বলেন, “মনে রেখো, ‘ইশক’ বা অবৈধ প্রেমরোগের স্তরভেদ রয়েছে। তাই এর চিকিৎসাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যার অন্তরে কেবল রোগের সূত্রপাত হয়েছে এবং যার অন্তর রোগ সীমান্তচূড়ায় উপনীত হয়েছে; দু’জনের চিকিৎসা সমপর্যায়ের নয়। এই ধরনের রোগীদের মধ্যে যারা এখনো সীমানা পার করেনি, কেবল তাদেরই চিকিৎসা সম্ভব। কারণ, যারা প্রেমরোগের গহীনে পৌঁছে যায়, তারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মাতলামির স্তরে পদার্পণ করে। ফলে চিকিৎসা কার্যত তাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারে না (ইবনুল জাওয়ী *যাম্মুল হাওয়া* ১/৫৮৩)।

ইবনুল জাওয়ী আরও বলেন, “পৌনঃপুনিক দর্শনের জেরে প্রেমিকার ছবি হৃদয় মাঝারে খোদাইকৃত বস্তুর ন্যায় স্থান গাঁড়ে বসে। এর আলামত হলো, প্রেমিকের হৃদয় প্রেমিকার ভালবাসায় অহর্নিশ তক্কেতক্কে থাকে। তার অন্তরে সর্বদা প্রেমিকার উপস্থিতি বিরাজমান থাকে। শয়নে-স্বপনে সে প্রেমাস্পদের সাথে চলাফেরা করে। শয়নকালে সে যেন প্রেমিকাকে আলিঙ্গন করে আছে। নির্জনে-নিঃসঙ্গে সে তার সঙ্গে প্রেমের আলাপ করে। বলাবাহুল্য, কল্পনার এহেন জগতে মত্ত হয়ে থাকার মূল কারণ প্রেমিকাকে ঘনিষ্ঠভাবে পাবার ব্যাঘ্র আকাজক্ষার মাঝেই নিহিত। আর প্রলয়ঙ্কর রোগ হিসেবে এই ব্যাঘ্র আকাজক্ষাই যথেষ্ট। কারণ, অর্জনযোগ্য লোভনীয় বস্তুর ক্ষেত্রেই অধিকাংশ পাপাচারিতা সম্পাদিত হয়। তাই তো, একজন সাধারণ মানুষ বাদশার ঘরণীকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লেও তাকে অন্তরের মণিকোঠায় স্থান দিতে পারে না। কারণ, তার জানা আছে সে রাণীর মতো এমন একজন উচ্চস্তরের মহিলাকে কখনো আপন করে পাবে না। আর কেউ যখন কোন বিষয়ে প্রবলভাবে লালসার শিকার হয়, ওই লালসা তাকে জিনিসটি নাগালে পেতে কঠিনভাবে তাড়িত করতে থাকে। কাক্ষিত জিনিসটি নাগালে না পেলে সে তীব্র দহন-জ্বালায় ভোগে। এই রোগের চিকিৎসা হলো, প্রেমাস্পদ হতে দূরে থাকার সুদৃঢ় সঙ্কল্প করা, তার প্রতি দৃষ্টিপাত হতে চূড়ান্তভাবে সরে আসা, তার প্রতি লালসা ত্যাগ করা এবং তাকে না পাওয়ার হতাশাকে অন্তরের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া” (প্রাগুক্ত ১/৫৮৭-৫৮৮)। তিনি আরও বলেছেন, “অন্তরের ফলপ্রসূ চিকিৎসা করা যায় শুধুমাত্র সামান্য চিন্তার মাধ্যমে। একটু ভিন্ন চিন্তার মাধ্যমে আপনি দেখতে পাবেন আপনার অন্তরে প্রেমিক/ প্রেমিকার প্রতি পূর্ব সেই মোহ আর নেই। আর সেটা হলো, আপনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রেমাস্পদের ত্রুটিগুলো নিয়ে ভাবুন। আশিক মাশুককে কেবল পূর্ণতার চোখে দেখে। তার দোষত্রুটি তার নজরে পড়ে না। আর নিয়ন্ত্রিত মধ্যপন্থা অবলম্বন ব্যতিরেকে বাস্তবতার খোলস অবমুক্ত করা যায় না। প্রবৃত্তির বলয় অন্যায় দাপট খাটায়, সকল দোষত্রুটিকে আড়াল করে দেয়। ফলে বিকৃত প্রেমিক প্রেমাস্পদের মাঝে শুধু গুণই দেখে” (প্রাগুক্ত ১/১৫, ৬৫৩)। এ কারণে ইবনু মাস’উদ (রা.) বলেছেন, “إِذَا أُعْجِبْتَ أَحَدَكُمْ امْرَأَةً فَلْيَذْكُرْ مَنَائِبَهَا.” “তোমাদের কারও কোনো নারীর প্রতি লালসা জেগে উঠলে, তোমরা তার মন্দ দিকগুলো স্মরণ করবে” (প্রাগুক্ত ১/ ৬৫৩)।

ইবনুল কায়্যিম (র.) কাম-বাসনার দুষ্টি ফাঁদ হতে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে যে উপায়গুলো বলেছেন, তন্মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটি আমরা উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, কুপ্রবৃত্তি থেকে রেহাই পেতে হলে প্রথমে চিন্তা করতে হবে যে, মানবজাতিকে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। তাকে এক মহান লক্ষ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, প্রবৃত্তির অবাধ্যতা বৈ তা অর্জন করা সম্ভব নয়। “তুমি সৃজিত হয়েছো এমন এক মহৎ লক্ষ্যে, যার মহাত্ম্য তুমি

যদি বুঝতে? সূতরাং, উপেক্ষাকে জয় করতে নিজের মনোভাব উচ্চ করার সাধনা করো” (ইবনুল কায়্যিম রাওদাতুল মুহিব্বীন ১/৪৭২)।

দুষ্ট প্রবৃত্তির অনুসরণ করা মানে লাঞ্ছনার পথে পা বাড়িয়ে নিজেকে অবমূল্যায়ণ করা। কারণ, যে কেউ প্রবৃত্তির অনুগত হয়ে চলে, সে নিজের অন্তরে হীনতা, দীনতা ও অপদস্থতা ঠাহর করতে পারে। তাই প্রবৃত্তি পূজারীদের অপক্ষমতা ও অহম্মোধ দেখে কেউ যেন প্রতারিত না হয়। বস্তুত তারা ভেতরগতভাবে বড়ই দুর্বল ও ভঙ্গুর। দুটি মন্দ স্বভাব অহম্মিকা ও নীচতা তাদের চরিত্রের সাথে একীভূত হয়ে থাকে (প্রাগুক্ত ১/৪৭৩)।

মনে রাখতে হবে, প্রবৃত্তি বা লালসার অসৎ ছায়া যেখানে পড়েছে, সেটিকেই ধ্বংস করে দেয়। ইলমের মধ্যে এর থাবা পড়লে ইলম হয়ে যায় বিদ’আত ও দ্রষ্টতার মিলনস্থল এবং ইলমের অধিকারী বা আলিম বনে যান প্রবৃত্তি পূজারক। যুহদ বা আধ্যাত্মিকতায় এর ছোঁয়া লাগলে, আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হয়ে যান কপটচারি ও সুন্নাহ বিরোধী। বিচার ব্যবস্থায় এর নখর বসলে, বিচারকগোষ্ঠী বনে যান জালিম ও সত্যবর্জিত। শাসন ব্যবস্থায় এর ছাপ পড়লে, শাসকবর্গ হয়ে ওঠেন স্বৈচ্ছাচারী। তাই যাকে ইচ্ছা পদায়ন করে এবং যাকে ইচ্ছা অপসারণ করে (প্রাগুক্ত ১/৪৭৪)।

কাম-বাসনার সাথে লড়াই করা কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার তুলনায় মহৎ না হলেও কেনো অংশে কম নয়। একলোক হাসান বাসরি (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু সাঈদ! কোন জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি বললেন, তোমার প্রবৃত্তির বিপক্ষে তোমার জিহাদ হলো সর্বোত্তম। আমি আমাদের শায়খ ইবনু তায়মিয়াহ (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “অন্তরের সাথে জিহাদ কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের মূল উপাদেয়। কারণ, নিজ আত্মা ও প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করা ছাড়া কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে রওয়ানা করা সহজ নয়” (প্রাগুক্ত ১/৪৭৮; ইবন তায়মিয়াহ আল-মুস্তাদরাক আলা মাজমু’ই ফাতাওয়া ৩/২১৩)।

সূতরাং লালসা ও কাম-বাসনার দুষ্টচক্রের জালে আটকানো ব্যক্তির উচিত, দৃঢ় সংকল্প, ধৈর্য-স্থৈর্য, উচ্চ মনোবল, সৎ ও নৈকট্যের কাজে মশগুল হওয়া, অসৎ ও গর্হিত কাজ হতে দূরে থাকা, আল্লাহতে নিবেদিত হওয়ার প্রয়াস চালানো, কুপ্রবৃত্তি থেকে নফসকে বাঁচিয়ে রাখা, মনোকামনা ও ভাবাবেগের সংশোধন করা, পুণ্যবানদের সাহচর্য লাভ করা এবং প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে করজোড়ে অনুনয়-মিনতি করার মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তির কবল হতে দ্রুত নিষ্কৃতি ও বাঁচার উপায় অবলম্বন করা।

পাঁচ: সম্পদের লালসা

অনেক মানুষের অন্তরে সম্পদ ও বৈষয়িক সম্পত্তির লালসা প্রচণ্ডভাবে জেঁকে বসেছে। ফলে মাল-দৌলতের নেশায় তারা বুদ্ধ হয়ে গেছে। দিনার, দিরহাম তথা টাকা-পয়সা তাদেরকে হাতের ক্রীড়নক বানিয়ে রেখেছে। পার্থিব সম্পদ-ঐশ্বর্যই তাদের দৈনন্দিন আলাপের বিষয়বস্তু, ঝোঁকের কেন্দ্ররেখা ও গুরুত্বের সবটুকু জায়গা দখল করে নিয়েছে। ফলে তারা কারও প্রতি ভালোবাসা দেখালে, সেখানে অর্থের লোভ অন্তর্নিহিত থাকে। কারও প্রতি রাগ-ক্ষোভ প্রদর্শন করলে সেটাও বিত্ত ঘটিত কারণে হয়ে থাকে। যতোক্ষণ পার্থিব স্বার্থ হাসিল করা যায়, ততোক্ষণ পাশে থাকে। আর যখন স্বার্থ হাসিলের পালা ফুরিয়ে যায়, তখন তারা ক্রোধান্বিত ও রাগান্বিত হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কুরআনের একাধিক জায়গায় দুনিয়া ও বৈষয়িক জগতের নিন্দা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ “আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয় [সূরা তুল হাদীদ, ৫৭ : ২০]।” অন্যত্র তিনি বলেন, ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ﴾

﴿وَتَكَاتُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ “তোমরা জেনে রাখো যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহঙ্কার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র [সূরা তুল হাদীদ, ৫৭ : ২০]।”

পার্থিব জগতের নিন্দা ও পরকালমুখিতার গুণগান জ্ঞাপন করে অসংখ্য হাদীছ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي، مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا.” “আমি আমার পর তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি যে ব্যাপারে ভয় করি তাহলো দুনিয়ার চাকচিক্য ও এর সৌন্দর্য, যা তোমাদের উপর উন্মুক্ত করে দেয়া হবে” (আল-বুখারী ২/৫৩২/১৩৯৫; আল-কুশায়রী ২/৭২৭/১০৫২)।

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْخَمِيسَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ.” “ধ্বংস হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম এবং উত্তম পোশাকের গোলাম। যদি তাকে দেয়া হয় তবে সন্তুষ্ট হয়, আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়” (আল-বুখারী ৩/১০৫৭/২৭৩০)।

কা’ব ইবনু ইয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ” “প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোনো না কোনো ফিতনা রয়েছে। আর আমার উম্মতের ফিতনা হলো ধন-সম্পদ” (আত-তিরমিযী ৪/৫৬৯/২৩৩৬)।

কা’ব ইবনু মালিক আল-আনসারী (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “مَا ذُنْبَانِ جَائِعَانِ أَرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ جُرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ.” “দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে ততটুকু ক্ষতিসাধন করে না, যতটুকু কোন ব্যক্তির ধন-সম্পদের মোহ ও মর্যাদার লালসা তার দ্বীনের ক্ষতি করে থাকে” (আত-তিরমিযী ৪/৫৮৮/২৩৭৬)।

হাসান বাসরী (র.) বলেন, “তোমরা ইহজাগতিক ঝুটঝামেলা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, পার্থিব জগত অতিমাত্রায় ঝুটঝামেলার অভয়ারণ্য। কোনো মানুষ নিজের জন্য পার্থিব ব্যস্ততার কোনো একটি দ্বার উন্মুক্ত করে নিলে, ওই দ্বার দিয়েই আরও দশটি ব্যস্ততা এসে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নেয়” (আল-মারওয়াযী ১/১৮৯-১৯০)।

তিনি আরও বলতেন, “তোমরা দুনিয়াকে তচ্ছিল্যভরে দেখো। আল্লাহর শপথ! দুনিয়াকে যদি তুমি তুচ্ছাকারে গ্রহণ করো, তবে তুমি দুনিয়াতে থেকে অপার্থিব সুখ অনুভব করবে” (আয-যাহাবী ৪/৫৭৯)। হাসান বাসরী (র.) শপথ করে বলতেন, “ধন-দৌলতে লোলুপ ব্যক্তিকে আল্লাহ তা’আলা অপদস্থ করে থাকেন” (প্রাগুক্ত ৪/৫৭৬; আশ-শায়বানী আয-যুহদু ১/২৭০)।

পার্থিব জগতের প্রতি মোহহীনতা এবং আখিরাতের প্রতি মোহাচ্ছন্নতা বিষয়ে ইবনুল কায়্যিম (র.)-এর অনেকগুলো অমূল্য উক্তি রয়েছে। আমরা এখানে দুয়েকটি উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, ইহকালের প্রতি নিরাসক্তি ব্যতিরেকে পরকালের প্রতি আসক্তি জন্ম নেয় না। আর দুনিয়ার নিরাসক্তি তৈরি করতে হলে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই ধারণ

করতে হবে। প্রথমত দুনিয়ার প্রতি তাকাতে হবে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে, তা অতিসত্ত্বের বিলীন হয়ে যাবে এবং তার শান-শওকত ও চাকচিক্য সমূলে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

হন্যে হয়ে এর পেছনে ছুটে চলার যন্ত্রণা ও পেরেশানি অন্তহীন। দুনিয়ার প্রতি লালায়িত হয়ে এর পেছনে নিরন্তর দৌড়ানোর পরে একসময় শ্বাসরুদ্ধকর ও কণ্ঠরোধকারী অবস্থায় পড়তে হয়। পার্থিব সুখের সন্ধানে ঘুরেফিরে সুখ লাভ না করেও পেরেশানিতে থাকতে হয় এবং সুখার্জনের পরও পেরেশানিতে থাকতে হয়। আবার সেই সুখ হারিয়ে গেলেও মর্মপিড়ায় ভোগতে হয়। এটি হলো পার্থিব জগত বিষয়ে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি। আর দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হলো আখিরাতের বিষয়ে। আখিরাত বিষয়ে চিন্তা করতে হবে যে, তা চিরস্থায়ী। তার কোনো ক্ষয় ও লয় নেই। আখিরাতের সুখ ও শান্তি অনন্ত-অফুরন্ত। পার্থিব জগত ও পরকালীন জগতের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ “অথচ আখিরাত সর্বোত্তম ও স্থায়ী (সূরা তুল আ'লা, ৬৭ : ১৭)।”

সুতরাং, আখিরাত হলো পূর্ণ, স্থায়ী কল্যাণের চিরস্থায়ী আবাস ঘর। পক্ষান্তরে দুনিয়া হলো ক্ষণিকের কিছু অলীক ও ক্ষয়মান কল্পনাজগৎ। তাই যারা সর্বশক্তি ব্যয় করে পার্থিব জীবন ও জগত সাজানোর প্রতিযোগিতায় মগ্ন থাকে, আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ থেকে একেবারে বিদায় করে দেয় এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে সদা বিস্মৃত থাকে; ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ “নিশ্চয়ই যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না এবং দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট আছে ও তা নিয়ে পরিতৃপ্ত রয়েছে। আর যারা আমার নিদর্শনাবলি হতে গাফিল। তারা যা উপার্জন করতো, তার কারণে আগুনই হবে তাদের ঠিকানা (সূরা তু ইউনুস, ১০ : ৭-৮)।” মু'মিনদের মধ্যে যারা দুনিয়া নিয়ে পরিতুষ্ট তাদের নিন্দা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ تَفْلَحُونَ أَلَيْسَ لِلَّهِ الْإِثْقَالُ عَلَىٰ الْأَرْضِ أَرَضِيكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ “হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভরাক্রান্ত হয়ে যমীনে ঝুঁকে পড়ো? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছো? আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগের উপকরণ তো নগণ্য (সূরা তুত তাওবা, ৯ : ৩৮)।”

দুনিয়ার প্রতি বান্দার যেই পরিমাণ আগ্রহ ও পরিতৃষ্টি জন্মাবে, আল্লাহর আনুগত্য ও আখিরাতের অন্বেষণ থেকে তার মাঝে সমপরিমাণে উদাসীনতা চলে আসবে। দুনিয়া-বিরাগের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীই যথেষ্ট, ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ﴾ “আপনি ভেবে দেখুন, যদি আমরা তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দেই, তারপর তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিলো তা তাদের কাছে এসে পড়ে, তখন যা তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ হিসেবে দেয়া হয়েছিলো তা তাদের কি উপকারে আসবে? (সূরা তুশ শু'আরা, ২৬ : ২০৫-২০৭)।” (ইবনুল কায়্যিম আল-ফাওয়া'ইদ ১/৯১)।

ইসলামী স্কলারগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতা ও তার লোভ-লালসা থেকে অতিশয় সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এমনকি তাঁরা দুনিয়ার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট ও মোহাচ্ছন্ন হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকাকে নিন্দনীয় বিবেচনা করেছেন। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ্ (র.) এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, “গাছপালা, অশ্বদল ও অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীর দিকে চেয়ে থাকা যদি দুনিয়া, নেতৃত্ব ও ধন-ঐশ্বর্যের আকর্ষণবোধ ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ থেকে

হয়, তবে তা নিন্দনীয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةً﴾ (আর আপনি আপনার দু'চোখ কখনো প্রসারিত করবেন না সেসবের প্রতি, যা আমি বিভিন্ন শ্রেণিকে দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি, তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। আর আপনার রব-এর দেয়া রিয়কই সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী [সূরাতু তোয়াহা, ২০ : ১৩১]।" পক্ষান্তরে দুনিয়া-দর্শন যদি দ্বীনের ক্ষতি করে এমন পর্যায়ে না হয়; বরং কেবল আত্মার সাময়িক প্রশান্তির উদ্দেশ্যে হয় যেমন- বাগানের ফুলের দৃশ্য-দর্শন, তখন তা এমন 'বাতিল' (চিত্তবিনোদন)-এর অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হবে, যা হকের উপর অবিচল থাকতে সহায়তা করে (আল-বালী ১/২৯)।

সম্পদপ্রীতি তখনই নিন্দনীয় যখন তা কোনো গুনাহে লিপ্ত হওয়া কিংবা কোনো অবশ্যপালনীয় বিধান বর্জনের কারণ হয়। এই বিষয়ে ইবনু তায়মিয়াহ (র.) বলেন, "সম্পদপ্রীতি ও পদ-মর্যাদার লোভ দ্বীন বিনষ্ট করে। ঐ আসক্তির জন্যই বান্দাকে শাস্তি দেয়া হয়, যে আসক্তির ফলে সে অন্যায়-অবিচার, মিথ্যা, অশ্লীলতা ইত্যাদি পাপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। তবে বান্দার জন্য অধিক উত্তম ও নিরাপদ হলো অতিরিক্ত সম্পদ দান করে প্রয়োজন সমপরিমাণ সম্পদের উপর তৃপ্ত থাকা। এতে দুনিয়া নিয়ে তার অন্তরের ব্যস্ততা তুলনামূলক কমে যাবে এবং আখিরাত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজে তার মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। যা তার জন্য ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ বয়ে আনবে" (আল-বালী ১/৪৫৮, ৪৯৪; ইবন তায়মিয়াহ মাজমু'উল ফাতাওয়া ১১/১০৮)।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ﴿مَنْ كَانَتْ الْأَخْرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَالْدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ﴾। যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে আখিরাত, আল্লাহ সেই ব্যক্তির অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন, তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ একত্রিত করে সুসংহত করে দিবেন, তখন তার নিকট দুনিয়াটা নগণ্য হয়ে দেখা দিবে। আর যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে দুনিয়া, আল্লাহ তার কাজগুলো এলোমেলো ও ছিন্নভিন্ন করে দেবেন এবং তার অভাব-অনটন দু'চোখের সামনে লাগিয়ে রাখবেন। তার জন্য যা নির্দিষ্ট রয়েছে, দুনিয়াতে সে এর চাইতে বেশি পাবে না (আত-তিরমিযী ৪/৬৪২/২৪৬৫; আশ-শায়বানী আল-মুসনাদু ৩৫/৪৬৭/২১৫৯০)।

সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি ও পূর্ণ নিরাসক্তির মাঝামাঝিতে অবস্থান করা জরুরি। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন অতঃপর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, হে লোকসকল, আল্লাহর শপথ! তোমাদের ব্যাপারে আমার কোনো কিছুই আশঙ্কা নেই। তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পার্থিব সৌন্দর্য ও চাকচিক্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এ সম্পর্কে তোমাদের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা রয়েছে।" এক ব্যক্তি বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, কল্যাণের পরিণামে কি অকল্যাণও হয়ে থাকে?" রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী বলেছিলে?" সে বললো, "আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কল্যাণের সাথে কি অকল্যাণ আসবে?" রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "কল্যাণ কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে না। অবশ্য বসন্তকালে যেসব তৃণলতা ও সবুজ ঘাস উৎপন্ন হয় তা (সবটুকু সুস্বাদু ও কল্যাণকর বটে) অনেক সময় হয়তো ভোজনকারী পশুকে ডায়রিয়ার প্রকোপে ফেলে বা মৃত্যুর কাছাকাছিও নিয়ে যায়। তবে ঐ তৃণভোজী পশুর পরিস্থিতি ভিন্ন হয়, যে পেট ভরে খাবার পর সূর্যের তাপ গ্রহণ করে, পায়খানা-পেশাব করে, জাবর কাটে এবং চারণভূমিতে ফিরে এসে পুনরায় ভক্ষণ করে। অনুরূপভাবে যে

ব্যক্তি সৎপন্থায় সম্পদ উপার্জন করে তাকে এর মধ্যে বরকত দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি অসৎ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে— সে অনেক খাচ্ছে কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারছে না (আল-কুশায়রী ২/৭২৭/১০৫২)।

ইবনুল কায়্যিম (রা.) এই হাদীছের ব্যাখ্যাকালে সম্পদের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন, “(বসন্তকালে যেসব তৃণলতা ও সবুজ ঘাস উৎপন্ন হয় এটা কোনো পশুকে ডায়রিয়ার প্রকোপে ফেলে মারে না বা মৃত্যুর কাছাকাছিও নিয়ে যায় না)—রাসূলুল্লাহ ﷺ—এর এই বাণীর মাঝে ফুটে উঠেছে অন্যতম সুন্দর উপমা এবং এতে দুনিয়ার প্রতি মোহাচ্ছন্নতা থেকে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। চারণভূমিতে বিচরণকারী পশু যেমন বসন্তের সবুজ ঘাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা থেকে মাত্রাতিরিক্ত ভক্ষণের ফলে ডায়রিয়ার প্রকোপে মারা যায় কিংবা মরে যাবার উপক্রম হয়, অনুরূপভাবে ধনসম্পদের মাত্রাতিরিক্ত লালসা মানুষকে ধ্বংস করে কিংবা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি তার সম্পদের কারণে হত্যার শিকার হয়েছে। কারণ, মাত্রাতিরিক্ত লালসা নিয়ে সে যখন সম্পদ জমা করেছে এবং তার সেই সম্পদে অন্যের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তখন উপায়ান্তর না পেয়ে সেই সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে অন্যরা তাকে হত্যা করেছে কিংবা তাকে অপদস্থ করে সম্পদ থেকে হাতছাড়া করেছে।

“তবে ঐ তৃণভোজী পশু”—এই বাক্যের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির উপমা দেয়া হয়েছে, যে দুনিয়ায় প্রয়োজন সমপরিমাণ সম্পদ আহরণ করে। তাকে এমন জন্তুর সাথে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে যা প্রয়োজন মতো তৃণলতা ও ঘাস পেটভরে ভক্ষণ করে। “সূর্যের তাপ গ্রহণ করে, পায়খানা-পেশাব করে”— এই বাক্যাংশে তিনটি উপকারিতা রয়েছে।

প্রথমত: জন্তু যখন চারণভূমিতে থেকে নিজের প্রয়োজনের চাহিদা অনুযায়ী ভক্ষণ করেছে, তখন তা খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে সূর্যের তাপে গিয়ে বসেছে যাতে ভক্ষিত খাদ্য হজম হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত: সে লালসিত হয়ে চারণভূমি থেকে যথেষ্ট খাওয়ার মতো ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত থেকেছে এবং উপকারী সূর্যের তাপ গ্রহণ করেছে যার ফলে খাদ্য হজম হয় এবং তা মল হয়ে সহজে নির্গত হয়।

তৃতীয়ত: পেটের মধ্যে চারণভূমির যে খাদ্য জমা হয়েছে জন্তু তা পেশাব-পায়খানার মাধ্যমে খালি করার ফলে পেটের মধ্যে স্বস্তি এসেছে। যা খেয়েছে তা যদি পেটের মধ্যেই রয়ে যেতো, তবে তা মৃত্যুর কারণ হতো। অনুরূপভাবে সম্পদ আহরণকারী তখনই তার সম্পদের কল্যাণ ভোগ করতে পারবে, যখন সে তার সম্পদের সাথে উল্লিখিত জন্তুর অনুরূপ আচরণ করবে...। হাদীছে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, চারণভূমিতে বিদ্যমান খাদ্যের প্রতি লালায়িত হয়ে যথেষ্ট ভক্ষণ করা এক ধরনের প্রান্তিকতা। আবার কিছু না খেয়ে পূর্ণ বিমুখতা অবলম্বন করার ফলে ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণনাশ করা আরেক প্রকার প্রান্তিকতা। এই দুয়ের মাঝামাঝি পদ্ধতি হলো মধ্যপন্থা। হাদীছে অটেল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী ব্যক্তির জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হলো, যেভাবে শারীরিক শক্তি ও সুস্থতা সংরক্ষণের নিমিত্তে ভক্ষিত খাদ্য মল আকারে ত্যাগ করা জরুরি, একইভাবে অর্জিত সম্পদও পরিমাণ মতো বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা জরুরি। মল আটকে রাখা যেমন ক্ষতিকর, তেমনিভাবে ব্যয়যোগ্য সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখাও ক্ষতিকর (ইবনুল কায়্যিম ‘উদ্দাতুস সাবিরীন ১/১৮৫-১৮৬)।

ইবনুল জাওয়ী (র.) মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, “দুনিয়ার মধ্যে আলিম সম্প্রদায়ের জন্য সম্পদ জমা করার তুলনায় অধিক উপকারী কোনো বিষয় আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ, এর ফলে তাঁদের স্বাবলম্বন প্রকাশ পায় এবং মানুষের কাছ থেকে তাঁদের অমুখাপেক্ষীতা প্রমাণিত হয়। জ্ঞানের সাথে সম্পদের সংযুক্তি পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলে। দেখা যায়, অধিকাংশ আলিম জ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে সম্পদ অর্জনের সুযোগ পায় না। ফলে নিজের প্রয়োজন পূরণে তাঁরা অন্যের দ্বারস্থ হয়ে পড়ে। অতঃপর ধৈর্যের বাঁধ যখন ভেঙ্গে যায়, তখন সম্পদ অর্জনের জন্য তাঁরা বিভিন্ন লাক্ষ্যনাকর মাধ্যম গ্রহণে পিছপা হয় না। অতএব এ কথা স্পষ্ট যে, সম্মান ও মান-মর্যাদা তখনই পূর্ণতা পাবে, ‘রিয়া’ (প্রদর্শনেচ্ছা) তখনই লোপ পাবে, যখন উলামায়ে কিরাম যালিম শাসকদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে। আর এই বিষয়টি দু’ শ্রেণির উলামায়ে কিরাম ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়নি।

প্রথম শ্রেণি: যাঁরা ছিলেন সম্পদশালী। যেমন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব তেলের ব্যবসা করতেন। সুফিয়ান সাওরীর বিভিন্ন ব্যবসায়িক পণ্য ছিলো। অনুরূপভাবে ইবনুল মোবারকও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় শ্রেণি: যাঁরা ছিলেন অত্যধিক ধৈর্যশীল এবং আল্লাহ্‌প্রদত্ত রিয্ক যথেষ্ট না হলেও এর উপর পরিতুষ্ট। যেমন, বিশর আল-হাফী, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল। অতএব মানুষ যখন উপরোল্লিখিত দুই শ্রেণির মতো ধৈর্য কিংবা সম্পদের অধিকারী হয় না, তখন সে বিভিন্ন পরীক্ষা ও দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হতে এক পর্যায়ে নিজের দ্বীন হারাতে উপক্রম হয়। আর এ সবার মূলে রয়েছে দারিদ্র্য। প্রকৃতপক্ষে, প্রয়োজন সারে এমন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যে অধিক সম্পদের লোভে বাদশাহর দরবারে ভিড় করে, তবে সে কখনো আলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না; বরং সে দুনিয়ালোভীদের অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হবে” (ড. আব্দুল আযীয ১/৫৬-৫৭)।

সারকথা হলো, বান্দার উচিত যতটুকু সম্পদ হলে তার অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন পূরণ হয়, ততটুকু সম্পদের উপর পরিতুষ্ট থাকা। আর এই প্রয়োজন পূরণের জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করা এবং তারই প্রতি অনুরাগী হওয়া। তবে বান্দার জন্য সমীচীন নয়, প্রয়োজনোতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়া। যে রিয্ক তার জন্য পূর্ববর্তিত, তা অর্জনের পথে সে তার মূল্যবান জীবন বিনাশের জন্য উদ্যত হয়। এমনকি পরিস্থিতি আরো গুরুতর হয়ে এই দাঁড়ায় যে, সে হারাম উপায়ে সম্পদ অর্জনে আসক্ত হয়ে পড়ে অবশ্যপালনীয় অধিকার আদায়ে সে নিবৃত্ত থাকে।

ছয়: নেতৃত্বের লোভ

নেতৃত্ব ও পদমর্যাদার লোভ-লালসা এক ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি। যা বেশিরভাগ মানুষের কপালে অভিশপ্ত দাসত্বের কালিমা লেপে দেয়। নেতৃত্বলোভী এসব ব্যক্তিবর্গের কাছে কর্তৃত্ব, পদমর্যাদা লাভ, খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

কা’ব ইবনু মালিক আল-আনসারী (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, *“مَا زَيْنَانُ جَائِعَانِ أَرْسِلَا فِي”* “দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে ততটুকু ক্ষতিসাধন করে না, যতটুকু কোনো ব্যক্তির ধন-সম্পদের মোহ ও মর্যাদার লালসা তার দ্বীনের ক্ষতি করে থাকে” (আত-তিরমিযী ৪/৫৮৮/২৩৭৬)। এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু রজব (র.) বলেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ অবহিত করলেন যে, কোন মানুষের সম্পদ ও সম্মানের মোহ তার দ্বীনের জন্যে আশঙ্কা বিবেচনায় নেকড়ে বাঘ

কর্তৃক বকরিকে ধ্বংস করার শঙ্কার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বরং উভয়ই সমান হবে কিংবা আশঙ্কা বিবেচনায় একে অপরকে ছাড়িয়ে যাবে। তিনি ইঙ্গিত করলেন যে, দুনিয়াতে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ের কবল থেকে বকরি যেমন অনিরাপদ, তেমনি সম্মান ও সম্পদলোভী মুসলিমের দ্বীনও অনিরাপদ।” তিনি আরো বলেন, “সম্মানের লালসা সম্পদের লোভের চেয়ে ধ্বংসাত্মক। দুনিয়াতে সম্মান, মর্যাদা ও ক্ষমতার পেছনে ছুটা সম্পদের লোভের তুলনায় বান্দার জন্য অধিকতর ক্ষতিকর। এর কারণ হলো, ধন-সম্পদ ক্ষমতা এবং সম্মান লাভের পেছনে ব্যয় হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সম্মানের লোভের প্রকরণ তুলে ধরলেন এবং বললেন, সম্মানের লোভ দুই ভাগে বিভক্ত।

এক. ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদের মাধ্যমে সম্মান অন্বেষণ। এটি সবচেয়ে বিপজ্জনক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি পরকালের সম্মানমর্যাদা ও কল্যাণকর বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ “আখিরাতের ঘর তো আমি সেরা লোকদের জন্যে নির্ধারণ করেছি, যারা এ পৃথিবীতে ওদ্ধত্য ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য [সূরাতুল কাসাস ২৮ : ৮৩]।”

দ্বিতীয়. ইলম, আমল ও যুহদের (দুনিয়াবিমুখতা) ইত্যাদির মতো ধর্মীয় বিষয়াদির মাধ্যমে সম্মান অন্বেষণ ও মর্যাদা প্রত্যাশা। প্রথম প্রকারের চেয়ে এটা আরো ভয়াবহ এবং অধিকতর বিপজ্জনক। এর কারণ হলো- ইলম, আমল ও যুহদ হলো আল্লাহর কাছে সম্মান-মর্যাদা, চিরস্থায়ী স্বাচ্ছন্দ্য জীবন ও নৈকট্য লাভের অন্যতম পন্থা (ড. আব্দুল আযীয তাবি, ১/৫৮-৫৯)।

ক্ষমতার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও নেতৃত্বের লোভ নানারকম অকল্যাণ ও বহুসংখ্যক ক্ষতিকর বস্তু থেকে মুক্ত নয়। ইবনু রজব (র.) কতিপয় অকল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, “জেনে রাখো যে, ক্ষমতা চাওয়ার পেছনে সম্মানের যে লোভ লালিত হয়, তা গুরুতর ক্ষতি তরায়িত করে। কিছু ক্ষতি তো কাজিক্ষত সম্মান অর্জনের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট মাধ্যম গ্রহণ করতে গিয়ে তরায়িত হয়ে যায়, আর সেই সম্মান অর্জনের ক্ষমতাবান ব্যক্তি যুলুম, অহংকারের মতো মহাবিপদ ও অকল্যাণের সম্মুখীন হয়” (প্রাগুক্ত ১/৫৯)। ইবনু রজব (র.) আরও বলেন, “ধন-সম্পদ ও নেতৃত্বের প্রতি ঝোঁক ও লালসা মানুষের দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়। তবে আল্লাহ তা'আলা যার ব্যাপারে ইচ্ছা করেন তার অন্তরই টিকে থাকে। অন্তর স্বজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান কামনা করে। এখান থেকেই সৃষ্টি হয় হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকার (প্রাগুক্ত)।

ইবনুল কায়্যিম (র.) এই মনোপ্রবৃত্তির কতক ক্ষতিকর বিষয় উল্লেখ করে বলেন, “ক্ষমতান্বেষণীরা নেতৃত্বার্জনের নিমিত্তে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। এর মাধ্যমে তারা দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সচেষ্ট হয় এবং মানবহৃদয়কে আকর্ষণ করে তাদের অনুগত দাসে পরিণত করতে উদ্যত হয়, যাতে করে প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে সমস্ত স্বার্থ উদ্ধারে এই দাসদের কাজে লাগানো যায়। কাজেই নেতৃত্বার্জনের এহেন হীন উদ্দেশ্য থেকে কতো যে প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্রোহ, হিংসা-বিদ্বেষ, সীমালঙ্ঘন, যুলুম-নির্যাতন, বহুমুখী বিপর্যয়, অন্যায় আত্মঅহমিকাবোধ, আল্লাহর দৃষ্টিতে অসম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মানপ্রদান এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে সম্মানিত ব্যক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করা ইত্যাদি। বস্তুতঃ দুনিয়াবি নেতৃত্ব এভাবেই অর্জিত হয়। এমনকি এর দ্বিগুণ বিপর্যয় ও দূর্নীতিরও ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। তবে নেতারা এসব থেকে চোখ বুজে থাকে। কিন্তু প্রবঞ্চনার পর্দা যখন উন্মোচিত হবে তখন তাদের সামনে তাদের কৃতকর্মের অসারতা ও ভ্রান্তি প্রকাশ

পেয়ে যাবে। বিশেষ করে যখন পিঁপড়ার আকৃতিতে তাদের হাশর হবে আর উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্তরা তাদের পদদলিত করবে, যাতে তারা ঠিক ঐভাবে লাঞ্চিত ও অপদস্থ হয় যেভাবে তারা আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর বান্দাদের লাঞ্চিত ও অপমানিত করতো” (ইবনুল কায়্যিম *আর-রুহ ফিল কালাম* ১/২৫৩)।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, নেতৃত্বের লোভ নিন্দনীয় এবং তা বহুমাত্রিক ফাসাদ তরায়িত করে। তবে জ্ঞাতব্য যে, আল্লাহর পথে আহ্বানের উদ্দেশ্যে নেতৃত্ব অর্জনের অগ্রহ ও দুনিয়ার উদ্দেশ্যে নেতৃত্ব অর্জনের অগ্রহের মাঝে রয়েছে বিস্তর ফারাক। প্রথমটির মূল লক্ষ্যই হলো আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের মর্যাদা সমুন্নত করা। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টির লক্ষ্য হলো ব্যক্তিগত সম্মান ও অবস্থার সমূহ উন্নতি সাধন। যে ইমাম কিংবা শাসক ন্যায়পরায়ণ হবেন, তিনি কখনও নিজ সম্মানের প্রপাগান্ডা চালাবেন না। বরং তিনি মানুষকে আহ্বান করবেন একমাত্র আল্লাহর বড়ত্ব প্রদর্শন ও তাঁর একনিষ্ঠ ইবাদতের প্রতি। পূর্বসূরীদের অনেকেই ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা করতেন শুধুমাত্র আল্লাহর পথে আহ্বানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের জন্য। অতএব যে তার রবের প্রার্থনা করবে- সে যেভাবে মুত্তাকীদের অনুসরণ করে, আল্লাহ যেন তাকে সেভাবে মুত্তাকীদের অনুসরণীয় ইমাম হিসেবে অধিষ্ঠিত করেন, তবে এতে তার কোনো ক্ষতি হবে না। বরং এ ধরনের প্রার্থনার জন্য সে প্রশংসিত হবে। কারণ, সে যেহেতু আল্লাহর পথে আহ্বান করে এবং আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর অনুসরণকেই পছন্দ করে, কাজেই যে মাধ্যম গ্রহণে এই কাজ সফল হবে, তা পছন্দ করাও তার জন্য প্রশংসাযোগ্য হবে (ইবনুল কায়্যিম *আর-রুহ ফিল কালাম* ১/২৫৩; ড. আব্দুল আযীয *আল-উবুদিয়াহ* ১/৬০)।

ক্ষমতা ও সুখ্যাতির মোহ নামক মনোপ্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকা আহলুল ইলম এবং তালিবানে ইলমদের জন্যে যথোচিত মনে করছি। কারণ, এটি একটি জটিল ও কঠিন রোগ। তাই তাওবা, অন্তরের পরিশোধন ও হিসাবনিকাশের মাধ্যমে অতি দ্রুততম সময়ে এর প্রতিকার ও পরিহার করা দায়িত্ব ও কর্তব্য। সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন, “পাঠকদের কাছে স্বর্ণের চেয়ে ক্ষমতাই অধিকতর প্রিয়” (আশ-শায়বানী *আয-যুহুদ* ১/৯১)। ইবনুল জাওযী (র.) নেতৃত্ব ও সুখ্যাতিসক্ত উলামাদের প্রসঙ্গে বলেন, “বর্তমানে চারদিকেই বিচিত্র নেতৃত্বের ছড়াছড়ি। নেতৃত্ব স্থায়ী ও পাকাপুজ হতে না হতেই অন্তরে উদাসীনতা, সৃষ্টির প্রতি মনোযোগ ও স্রষ্টা বিস্মৃতির মতো ধ্বংসাত্মক অবস্থা জেঁকে বসে। তখন কেবল দুনিয়াবাসীর উপর নেতৃত্বের অভিশাপ অন্তরে লালিত হয়। অতএব, আমাদের উচিত, নিয়ত সংশোধনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া আর লৌকিকতার উদ্দেশ্যে সাজ-সজ্জা পরিত্যাগ করা। সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকাই হবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। এভাবেই পূর্বসূরী উলামায়ে কিরাম সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়েছেন এবং সফলকাম হয়েছেন” (ইবনুল জাওযী *সাইদুল খাতির* ১/২২৭; আল-আজরী *আখলাকুল আম্বিয়া* ১/১৭৫)।

উপহসংহার

ইসলাম মানুষের যাবতীয় অবস্থা এবং তাদের যাবতীয় স্বভাব ও প্রবৃত্তির পর্যবেক্ষণ করে। ইসলাম সেগুলোর বৈধতা স্বীকার করার পাশাপাশি সেগুলোকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিশীলিত রাখে। যৌনপ্রবৃত্তি ও নারী আসক্তি হলো কুফরিতে লিপ্ত হবার প্রধানতম কারণ। নারী ঘটিত ফিতনাই হলো সবচেয়ে বড় ফিতনা। দুনিয়াসক্ত ব্যক্তি যেমন ধন-সম্পদে কখনো পরিতৃপ্ত হয় না, তেমনি যৌনপ্রবৃত্তিতে আসক্ত ব্যক্তি কোন বাধা-বন্ধকতা না আসলে থমকে গিয়ে পেছনে ফিরে আসার কল্পনাও করে না। যদি বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন অবয়বের এবং নানান সুন্দরী রমণীরা কোনো পুরুষের সাথে সম্পর্ক রাখে, কী মনে হয়-তা তার জন্যে যথেষ্ট হবে? কখনোই না। কিন্তু একটা হালাল বিবাহের সম্পর্ক তার জন্যে শুধু যথেষ্ট হবে, তাতে সারা জীবন কেটে যাবে। অবৈধ সম্পর্ক থেকে দূরে থাকার দৃঢ় সংকল্প, দৃষ্টি

অবনত রাখার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, লোভ পরিহার করার প্রত্যয়ই হলো মনোপ্রবৃত্তি থেকে বাঁচার সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা। দুনিয়ার ভালবাসা যাবতীয় পাপাচারের মূল। দুনিয়ার ভালোবাসা ও ক্ষমতার লোভের ফলেই জাহান্নামিরা জাহান্নামে দীর্ঘস্থায়ী হবে। আর দুনিয়াবিমুখতা ও ক্ষমতার অনুগ্রহ জান্নাতীদের জান্নাতে দীর্ঘস্থায়ী করবে। সম্মানের লোভ অর্থের লোভের চেয়ে ধ্বংসাত্মক। দুনিয়ার সম্মান-মর্যাদা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের পেছনে, অর্থের পেছনে ধাবিত হওয়ার চেয়ে মানুষের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর। অতএব আমাদের উচিত হলো-অবৈধ যৌনপ্রবৃত্তি, সম্পদ, ক্ষমতা ও প্রসিদ্ধির লোভ পরিহার করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এসব কর্ম থেকে মুক্ত থেকে নিজেদের কুপ্রবৃত্তি নিরাময় করে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমার করার তাওয়ীক দান করুন।

তথ্যসূত্র

- আল-আজরী, মুহাম্মদ, *আখলাকুল আম্মিয়া*, সৌদি আরব: রিআসাতু ইদারাতিল বুহুছিল ইলমিয়াহ্, ১৯৭৮ খ্রি।
- ড. আব্দুল আযীয ইবন মুহাম্মদ, *আল-উবুদিয়াহ্*, দাম্মাম: আল-মাকতাবুল ইসলামী, তাবি।
- ইবনুল জাওযী, আব্দুর রহমান, *যাম্মুল হাওয়া*, মাক্কাতুল মুকাররামা: মাক্তাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪ খ্রি।
- ইবনুল জাওযী, আব্দুর রহমান, *সাইদুল খাতির*, বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরবী, তাবি।
- ইবনুল কায়্যিম, মুহাম্মদ, *আল-ফাওয়াইদ*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ্, ২য় সং, ১৯৭৩ খ্রি।
- ইবনুল কায়্যিম, *রাওদাতুল মুহিব্বীন*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ্, ১ম সং, ১৯৯২ খ্রি।
- ইবনুল কায়্যিম, মুহাম্মদ, *ইগাছাতুল লাহফান*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ্, ২য় সং, ১৯৭৩ খ্রি।
- ইবনুল কায়্যিম, মুহাম্মদ, *আত-তুরকুল হিকমিয়া ফীস সিয়াসাতিশ শারঈয়া*, মাক্কাতুল মুকাররামা: দারু আলামিল ফাওয়াইদ, ১ম সং, ১৪২৮ হি।
- ইবনুল কায়্যিম, মুহাম্মদ, *উদ্দাতুস সাবিরীন ওয়া যাখীরাতুশ শাকিরীন*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ্, তাবি।
- ইবনুল কায়্যিম, মুহাম্মদ, *আর-রুহ ফিল কালাম*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ্, ১৯৭৫ খ্রি।
- ইবনুল মুকাফফা, আব্দুল্লাহ, *আল-আদাবুল কাবীর*, বৈরুত: দারু সাদির, তাবি।
- ইবন তায়মিয়াহ্, আহমদ, *মাজমু'উল ফাতাওয়া*, আল-মাদীনাতুন নাবাবীয়াহ্: মুজাম্মা'আল মালিক ফাহাদ, ১৯৯৫ খ্রি।
- ইবন তায়মিয়াহ্, *আল-মুত্তাদরাক আলা মাজমু'ই ফাতাওয়া*, সৌদি আরব: দারুল ওয়াফা, ১ম সং, ১৪১৮ হি।
- ইবন কাছীর, ইসমা'ঈল, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, কায়রো: আল-মাকতাবুস সাকাফী, ১ম সং, ২০০১ খ্রি।
- আল-কুশায়রী, মুসলিম, *আস-সহীহ*, বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরবী, তাবি।
- আল-কুরতুবী, মুহাম্মদ, *আল-জামী লিআহকামিল কুরআন*, কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ্, ২য় সং, ১৯৬৪ খ্রি।
- জারীশা, আলী মুহাম্মদ, *আসালীবুল গায়বিল ফিকরী*, বৈরুত: দারুত তুরাছিল আরবী, তাবি।
- আত-তানতাবী, আলী, *ফাতাওয়া আলী আত-তানতাবী*, মিসর: আল-আযহার, তাবি।
- আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ, *আস-সুনান*, মিসর: মাকতাবাতু মুত্তাফা আল-বাবী, ২য় সং, ১৯৭৫ খ্রি।
- আল-বুখারী, মুহাম্মদ, *আস-সহীহ*, বৈরুত: দারু ইবনি কাছীর, ৩য় সং, ১৪০৭ হি।
- আল-বালী, মুহাম্মদ ইবন আলী, *মুখ্তাসারুল ফাতাওয়া আল-মিসরিয়্যা লিইবন তায়মিয়া*, দাম্মাম: ১০০৬ খ্রি।
- আল-মারওয়যী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, *আয-যুহুদু ওয়ার রাকাইক*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ্, তাবি।
- আয-যাহাবী, মুহাম্মদ, *সিয়ারু 'আলামিন নুবালা'*, বৈরুত: মু'আসসাআতুর রিসালাহ্, ৩য় সং, ১৯৮৫ খ্রি।
- আশ-শায়বানী, আহমদ, *আয-যুহুদু*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ্, ১৯৮৩ খ্রি।

আশ-শায়বানী, আহমদ, আল-মুসনাদু, বৈরুত: মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ২০০১ খ্রি।
আস-সুয়ূতী, আব্দুর রহমান, আদ-দুররুল মানছুর, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৩ খ্রি।
হুসায়ন, শায়খ মুহাম্মদ খিদ্র, রাসাইলুল ইসলাম, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, তাবি।

সন্ধির ব্যাকরণিক গঠন ও উপাদান বিন্যাস

ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্যাহ ভূঁইয়া*

প্রতিপাদ্যসার: সন্ধি বাংলা ব্যাকরণে নানা গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতায়, সমস্যা এবং সীমাবদ্ধতায় চর্চিত ধ্বনিতত্ত্বের একটি বিষয়। আলোচ্য প্রবন্ধে সন্ধির সমস্যা-সীমাবদ্ধতা এসবের কোনোটিতে মনোযোগ না দিয়ে কেবল সন্ধি-বিচ্ছেদ ও সম্মিলিত প্রান্তের বিভিন্ন ব্যাকরণিক গঠন ও উপাদান বিন্যাসের আলোচনা করা হয়েছে। এদিক থেকে বলা চলে এটি সন্ধির রূপধ্বনিতাত্ত্বিক প্রবন্ধ। এই আলোচনায় বাংলা উচ্চারণ-রীতির সঙ্গে সন্ধির নিয়মগুলোকে জড়িয়ে সাধারণ ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপধ্বনিতত্ত্বের গঠনসূত্রে সন্ধির বিভিন্ন ব্যাকরণিক গঠন ও উপাদান খুঁজে বের করে তাদের আলাদা মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

চাবি-শব্দ: মৌলিক শব্দ, উপসর্গ, প্রত্যয়, সাধিত শব্দ, অব্যয়, ক্রিয়ামূল, ধ্বনির মিলন, ধ্বনির লোপ, ধ্বনির পরিবর্তন, ধ্বনির বিয়োজন, ধ্বনির রূপান্তর।

১

বাংলা ব্যাকরণে সন্ধির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সংস্কৃত থেকে আদর্শিত একটি বিষয়। পানিনীর অষ্টাধ্যায়ীতে সন্ধি ছিলো বলে বাংলা ব্যাকরণেও সন্ধি সেই ঐতিহ্যসূত্রে এসেছে। সন্ধিকে নিয়ে নানা মতানৈক্য লক্ষ করা যায়। অনেকে সন্ধিকে বর্জনের পক্ষে মত দিয়েছেন, আবার অনেকে এটিকে বহাল রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। অনেকে সন্ধিকে সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বের আওতাধীন বিষয় মনে করেন আবার অনেকে এটিকে রূপধ্বনিতত্ত্বের বিষয় মনে করেন। অনেকে মনে করেন বাংলা ব্যাকরণে সন্ধির অবস্থান ধ্বনি পরিবর্তন অংশে, আবার অনেকে মনে করেন সন্ধির অবস্থান সমাসের পরে হওয়া উচিত। অনেকে বাংলা ব্যাকরণে সন্ধির প্রচলিত শ্রেণিকরণকে গ্রহণ করেছেন, আবার অনেকে এতে নানা অবৈজ্ঞানিকতার প্রশ্ন তুলেছেন। এভাবে নানা গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতায়, সমস্যা এবং সীমাবদ্ধতায় বাংলা ব্যাকরণে সন্ধি টিকে আছে। অতীতে এসব নিয়ে নানা বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধও রচিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এসব বিষয়ের কোনোটিতে মনোযোগ না দিয়ে কেবল সন্ধির বিভিন্ন ব্যাকরণিক উপাদান বিন্যাস অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। সার্বিক দিক বিবেচনায় বলা চলে উক্ত প্রবন্ধ সন্ধির গঠন ও উপাদান বিন্যাস সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ।

২

সাধারণ বাংলা ব্যাকরণগুলোতে সন্ধি বলতে কেবল সন্নিহিত দুইটি ধ্বনির মিলনকে বুঝানো হয়েছে। অথচ, সন্ধি কেবল সন্নিহিত দুইটি ধ্বনির মিলন নয়; এটি সন্নিহিত দুইটি ধ্বনির একটিকে লোপ অথবা একটি অপরটির প্রভাবে পরিবর্তনও বুঝায়। সন্ধিতে ধ্বনির লোপ হয়; ধ্বনির সংযোজন হয়; ধ্বনির বিয়োজন হয়; ধ্বনির রূপান্তরও ঘটে।

সন্ধিবদ্ধ হওয়ার আগে বিচ্ছেদ অবস্থায় পাশাপাশি থাকা ধ্বনিগুলোর মূলত দুইটি প্রাণীয় অবস্থান দেখা যায়। প্রথম প্রাণীয় অবস্থানে উচ্চারণে প্রাপ্ত শেষ ধ্বনি এবং দ্বিতীয় প্রাণীয় অবস্থানে উচ্চারণে প্রাপ্ত প্রথম ধ্বনি শেষ পর্যন্ত কখনো

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সম্মিলিত হয়; কখনো একের প্রভাবে অপরের লোপ হয়; কখনো একের প্রভাবে অপরের সংযোজন অথবা বিয়োজন বা রূপান্তর হয়ে নানাবিধ পরিবর্তন সাধিত হয়। এভাবে পাশাপাশি থাকা অবস্থায় সন্ধি বিচ্ছেদের প্রথম প্রান্তে কখনো স্বরধ্বনি, কখনো ব্যঞ্জনধ্বনি, কখনো স্বরধ্বনিসহ বিসর্গ, কখনো ব্যঞ্জনধ্বনিসহ বিসর্গ দেখা যায়। অপরদিকে, বিচ্ছেদ প্রান্তের দ্বিতীয় অংশের শুরুতে কখনো স্বরধ্বনি, কখনো ব্যঞ্জনধ্বনি দেখা যায়। সুতরাং সন্ধির গঠন কৌশল হলো- ‘বিচ্ছেদ প্রান্তের প্রথম অংশ + বিচ্ছেদ প্রান্তের শেষ অংশ = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দ’। উক্ত গঠন কৌশলের আলোকে বাংলা ব্যাকরণে সন্ধির প্রধান গঠনগুলোকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যাস করা যেতে পারে:

- ক. স্বরধ্বনি + স্বরধ্বনি = মিলিত শব্দ।
- খ. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি = মিলিত শব্দ।
- গ. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি = মিলিত শব্দ।
- ঘ. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি = মিলিত শব্দ।
- ঙ. বিসর্গ + স্বরধ্বনি = মিলিত শব্দ।
- চ. বিসর্গ + ব্যঞ্জনধ্বনি = মিলিত শব্দ; ইত্যাদি।

৩

সন্ধির প্রধান গঠনগুলোতে বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো: উপসর্গ, প্রত্যয়, মৌলিক শব্দ, সাধিত শব্দ, অব্যয়, ক্রিয়ামূল ইত্যাদি। এসব উপাদানের কার্যকারিতায় মূলত সন্ধির বিভিন্ন অংশ সজ্জিত হয়। সন্ধির গঠনে এসব ব্যাকরণিক উপাদান যৌক্তিক ও কার্যকর ভূমিকা রেখে নতুন শব্দগঠন করে। এসব উপাদানের সমন্বয়ে এবার বিচ্ছেদ অংশের দুই প্রান্ত কীভাবে বিন্যস্ত হয় তাদেরকে আলাদা গঠন বিন্যাসে দেখানো হলো:

- বিচ্ছেদ গঠন-১: শব্দ + শব্দ = মিলিত শব্দ।
- বিচ্ছেদ গঠন-২: উপসর্গ + শব্দ = মিলিত শব্দ।
- বিচ্ছেদ গঠন-৩: উপসর্গ + প্রত্যয় = মিলিত শব্দ।
- বিচ্ছেদ গঠন-৪: শব্দ + প্রত্যয় = মিলিত শব্দ।
- বিচ্ছেদ গঠন-৫: ক্রিয়ামূল + প্রত্যয় = মিলিত শব্দ।
- বিচ্ছেদ গঠন-৬: ক্রিয়ামূল + শব্দ = মিলিত শব্দ।
- বিচ্ছেদ গঠন-৭: অব্যয় + শব্দ/প্রত্যয় = মিলিত শব্দ; ইত্যাদি।

উক্ত গঠনগুলোতে বিভিন্ন ধনিতাত্ত্বিক বিন্যাসের পর নানামাত্রিক পর্যবেক্ষণে আমরা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হবো-

- ক). একই স্বরধ্বনির হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর পাশাপাশি থাকলে সেখানে হ্রস্বস্বর অস্তিত্বহীন হয়ে যায়, দীর্ঘস্বর বহাল থাকে।
- খ). দুইটি দীর্ঘস্বর পাশাপাশি থাকলে একটি দীর্ঘস্বর অস্তিত্বহীন হয়, একটি দীর্ঘস্বর বহাল থাকে।
- গ). দুইটি হ্রস্ব স্বরধ্বনির সংযোগ ঘটলে একটি দীর্ঘস্বর তৈরি হয়।
- ঘ). ভিন্নগোত্রের স্বরধ্বনির সঙ্গে ভিন্নগোত্রের স্বরধ্বনির সংযোগ ঘটলে ভিন্নস্বরধ্বনিতে রূপান্তর ঘটে। এখানে হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর কোনোটির অস্তিত্ব থাকে না; নতুন স্বরধ্বনি তৈরি হয়ে ভিন্নতা প্রদর্শিত হয়।

- ঙ). ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির সংযোগ হলে নতুন ব্যঞ্জনে রূপান্তর ঘটে, অর্থাৎ একটি ধ্বনিকে অন্য ধ্বনিতে পরিবর্তন ঘটায়। এই ধরনের পরিবর্তন সমীভবন বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কখনো পূর্ণ সমীভবন, আবার কখনো আংশিক সমীভবনও ঘটে।

8

বিচ্ছেদ গঠন-১: শব্দ + শব্দকেন্দ্রিক উপাদান

সন্ধির দুই প্রান্তে শব্দ ব্যবহার করে ধ্বনিসংযোগ ঘটিয়ে নতুন শব্দগঠন সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম প্রান্তে কখনো মৌলিক শব্দ, আবার কখনো সাধিত শব্দ; দ্বিতীয় প্রান্তেও কখনো মৌলিক শব্দ, আবার কখনো সাধিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে যেকোনো প্রান্তে সাধিত শব্দ গ্রহণের প্রবণতা খুব কম দেখা যায়। আমাদের পর্যবেক্ষণে মৌলিক শব্দের শেষ ধ্বনির সঙ্গে পরবর্তী মৌলিক শব্দের প্রথম ধ্বনির সংযোগ সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। নিম্নোক্ত ছকগুলো (১.১ থেকে ১.৪ পর্যন্ত) শব্দ + শব্দ = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দ গঠনের দৃষ্টান্ত।

ক. সংযোগ-ধরন: হ্রস্বস্বরগুলো লোপ হয়েছে। দীর্ঘস্বর বহাল রয়েছে।

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রাপ্তীয় ধ্বনি বন্ধন
শ্রদ্ধা + অর্ঘ	শ্রদ্ধার্ঘ	আ + অ = আ
মহা + অর্ঘ	মহার্ঘ	আ + অ = আ
সিংহ + আসন	সিংহাসন	অ + আ = আ
গৃহ + আগত	গৃহাগত	অ + আ = আ
হিম + আলয়	হিমালয়	অ + আ = আ
দেব + আলয়	দেবালয়	অ + আ = আ
রত্ন + আকর	রত্নাকর	অ + আ = আ
আশা + অতীত	আশাতীত	আ + অ = আ
কথা + অমৃত	কথামৃত	আ + অ = আ
সতী + ইন্দ্র	সতীন্দ্র	ঈ + ই = ই
বধূ + উৎসব	বধূৎসব	উ + উ = উ
বহু + উর্ধ্ব	বহূর্ধ্ব	উ + উ = উ

ছক-১.১: শব্দ + শব্দ = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন।

খ. সংযোগ-ধরন: ভিন্নধরনের পাশাপাশি স্বর অন্য স্বরধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে।

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রাণ্ডীয় ধ্বনি বন্ধন
শুভ + ইচ্ছা	শুভেচ্ছা	অ + ই = এ
সূর্য + উদয়	সূর্যোদয়	অ + উ = ও
হিত + উপদেশ	হিতোপদেশ	অ + উ = ও
পর + উপকার	পরোপকার	অ + উ = ও
মত + ঐক্য	মতৈক্য	অ + ঐ = ঐ
পূর্ণ + ইন্দু	পূর্ণেন্দু	অ + ই = এ
শ্রবণ + ইন্দ্রিয়	শ্রবণেন্দ্রিয়	অ + ই = এ
স্ব + ইচ্ছা	স্বেচ্ছা	অ + ই = এ
নর + ইন্দ্র	নরেন্দ্র	অ + ই = এ
গৃহ + উর্ধ্ব	গৃহোর্ধ্ব	অ + উ = ও
গঙ্গা + উর্মি	গঙ্গোর্মি	আ + উ = ও
চল + উর্মি	চলোর্মি	অ + উ = ও
মহা + উৎসব	মহোৎসব	আ + উ = ও
ফল + উদয়	ফলোদয়	অ + উ = ও
প্রশ্ন + উত্তর	প্রশ্নোত্তর	অ + উ = ও
জন + এক	জনৈক	অ + এ = ঐ
মহা + ঐশ্বর্য	মহৈশ্বর্য	আ + ঐ = ঐ
অতুল + ঐশ্বর্য	অতুলৈশ্বর্য	অ + ঐ = ঐ
বন + ওষধি	বনৌষধি	অ + ও = ঔ
মহা + ওষধি	মহৌষধি	আ + ঔ = ঔ
পরম + ওষধি	পরমৌষধি	অ + ও = ঔ
মসী + আধার	মস্যোধার	ঈ + আ = য়্ + আ
নদী + অম্বু	নদ্যম্বু	ঈ + অ = য়্ + অ
গতি + অন্তর	গত্যন্তর	ই + অ = য়্ + অ
পশু + অধম	পশ্বধম	উ + অ = য়্ + অ
পশু + আচার	পশ্বাচার	উ + আ = য়্ + আ
মনু + অন্তর	মন্বন্তর	উ + অ = য়্ + অ
পরম + ঈশ	পরমেশ	অ + ঈ = এ
মহা + ঈশ	মহেশ	আ + ঈ = এ
নর + ঈশ	নরেশ	অ + ঈ = এ
রমা + ঈশ	রমেশ	আ + ঈ = এ
শীত + ঋত	শীতর্ষ	অ + ঋ = আর্

ছক-১.২: শব্দ + শব্দ = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন।

গ. সংযোগ-ধরন: দুইটি স্বরধ্বনি মিলে একটি দীর্ঘ স্বরধ্বনি হয়েছে।

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রান্তীয় ধ্বনি বন্ধন
রবি + ইন্দ্র	রবীন্দ্র	ই + ই = ঐ
নর + অধম	নরাধম	অ + অ = আ
হিম + অচল	হিমাচল	অ + অ = আ
প্রাণ + অধিক	প্রাণাধিক	অ + অ = আ
হস্ত + অন্তর	হস্তান্তর	অ + অ = আ
হিত + অহিত	হিতাহিত	অ + অ = আ
মরু + উদ্যান	মরুদ্যান	উ + উ = উ

ছক-১.৩: শব্দ + শব্দ = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন।

ঘ. সংযোগ-ধরন: দুইটি দীর্ঘস্বরের একটি লোপ হয়েছে এবং অপর দীর্ঘস্বর বহাল রয়েছে।

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রান্তীয় ধ্বনি বন্ধন
বিদ্যা + আলয়	বিদ্যালয়	আ + আ = আ
কথা + আলাপ	কথালাপ	আ + আ = আ
দিল্লী + ঈশ্বর	দিল্লীশ্বর	ঈ + ঈ = ঈ
ভূ + উর্ধ্ব	ভূর্ধ্ব	উ + উ = উ

ছক-১.৪: শব্দ + শব্দ = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন।

বিচ্ছেদ গঠন-২: উপসর্গ + শব্দকেন্দ্রিক উপাদান

উপসর্গ হলো এক ধরনের অব্যয়সূচক শব্দাংশ। উপসর্গ শব্দের পূর্বে বসে। আমাদের পর্যবেক্ষণে সন্ধির বিচ্ছেদ অংশের প্রথম প্রান্তে উপসর্গ ব্যবহারের অনেক প্রমাণ উঠে এসেছে। বাংলা উপসর্গ, তৎসম উপসর্গ এবং বিদেশি উপসর্গ থেকে প্রতি-, সু-, পরি-, উৎ-, সম্-, আ-, নির্- (কখনো নিঃ), দুর্- (কখনো দুঃ) ইত্যাদি উপসর্গগুলোর শেষ প্রান্তীয় ধ্বনির সঙ্গে দ্বিতীয় প্রান্তে শব্দপ্রারম্ভিক ধ্বনির সংযোগ ঘটিয়ে সন্ধি প্রক্রিয়ায় নতুন শব্দগঠন করেছে। এই উপসর্গগুলোর পর কখনো মৌলিক শব্দ, কখনো সাধিত শব্দ ব্যবহার করে নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও উপসর্গের পর মৌলিক শব্দের গ্রহণ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত উপসর্গগুলোর স্বাধীন কোনো অর্থ পরিলক্ষিত হয়নি, কেবল পরবর্তী ধ্বনির সংযোগ ঘটিয়ে একটি অর্থবহ শব্দে পরিণত হতে সহায়ক হয়েছে। পরবর্তী শব্দকে অর্থপূর্ণতা প্রদান, অর্থ-সম্প্রসারণ, অর্থ-সংকোচন, অর্থ-পরিবর্তন অব্যাহত রেখে উপসর্গ কেবল তার স্বভাবধর্ম পালন করেছে। সংযোগ-ধরনসহ বিস্তারিত বিন্যাস ছকে^২ দেখানো হলো:

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রাণ্ডীয় ধ্বনি বন্ধন	সংযোগ-ধরন
প্রতি + এক	প্রত্যেক	ই + এ = য় + এ	১. ভিন্নধরনের পাশাপাশি স্বর অন্য স্বরধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে। ২. ভিন্নধরনের পাশাপাশি ব্যঞ্জনধ্বনি অন্য ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে। ৩. কখনো পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক সমীভবন হয়েছে। ৪. কখনো সমবর্গীয় নাসিক্য সমীভবন হয়েছে। ৫. কখনো তালব্যীভবন হয়েছে। ৬. কখনো মূর্ধন্যীভবন হয়েছে।
প্রতি + ছবি	প্রতিচ্ছবি	ই + ছ = চ্ + ছ	
আ + চর্চ	আশ্চর্য	আ + চ = শ্ + চ	
সু + অল্প	স্বল্প	উ + অ = ব্ + অ	
সু + আগতম	স্বাগতম	উ + আ = ব্ + আ	
পরি + ছদ	পরিচ্ছদ	ই + ছ = চ্ + ছ	
পরি + ছেদ	পরিচ্ছেদ	ই + ছ = চ্ + ছ	
পরি + কার	পরিষ্কার	ই + ক = য়্ + ক	
উৎ + শ্বাস	উচ্ছ্বাস	ত্ + শ্ = চ্ + ছ	
উৎ + লাস	উল্লাস	ত্ + ল = ল্ + ল	
উৎ + ঘাটন	উদ্ঘাটন	ত্ + ঘ = দ্ + ঘ	
উৎ + যোগ	উদ্যোগ	ত্ + য = দ্ + য	
উৎ + বন্ধন	উদ্বন্ধন	ত্ + ব = দ্ + ব	
উৎ + ছেদ	উচ্ছেদ	ত্ + ছ = চ্ + ছ	
উৎ + জ্বল	উজ্জ্বল	ত্ + জ = জ্ + জ	
সম্ + রক্ষণ	সংরক্ষণ	ম্ + র = ং + র	
সম্ + বাদ	সংবাদ	ম্ + ব = ং + ব	
বি + ছেদ	বিচ্ছেদ	ই + ছ = চ্ + ছ	৭. বিশেষ নিয়মে সাধিত হয়েছে। ৮. হ্রস্বস্বর লোপ হয়ে দীর্ঘস্বর বহাল রয়েছে।
বি + ছিন্ন	বিচ্ছিন্ন	ই + ছ = চ্ + ছ	
নিঃ + স্তর	নিস্তর/নিঃস্তর	ইঃ + স্ত = স্ত	
নিঃ + স্পন্দ	নিঃস্পন্দ/নিঃস্পন্দ	ইঃ + স্প = স্প	
নিঃ + আকার	নিরাকার	ইঃ + আ = র + আ	
নিঃ + আকরণ	নিরাকরণ	ইঃ + আ = র + আ	
নিঃ + জন	নির্জন	ইঃ + জ = র + জ	
নিঃ + রব	নিরব	ইঃ + র = ঙ্গ + র	
নিঃ + রস	নিরস	ইঃ + র = ঙ্গ + র	
নিঃ + কর	নিষ্কর	ইঃ + ক = য়্ + ক	
নিঃ + ঠুর	নিষ্ঠুর	ইঃ + ঠ = য়্ + ঠ	
নিঃ + ফল	নিষ্ফল	ইঃ + ফ = য়্ + ফ	
নিঃ + পাপ	নিষ্পাপ	ইঃ + প = য়্ + প	
প্র + ছদ	প্রচ্ছদ	অ + ছ = চ্ + ছ	
উৎ + স্থান	উত্থান	ত্ + স্থ = থ	
উৎ + স্থাপন	উত্থাপন	ত্ + স্থ = থ	
সম্ + কার	সংস্কার	ম্ + ক = ং + ক	
সম্ + কৃত	সংস্কৃত	ম্ + ক = ং + ক	
পরি + ঈক্ষা	পরীক্ষা	ই + ঈ = ঈ	
প্রতি + ঈক্ষা	প্রতীক্ষা	ই + ঈ = ঈ	

ছক-২: উপসর্গ + শব্দ = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দ।

বিচ্ছেদ গঠন-৩: উপসর্গ + প্রত্যয়কেন্দ্রিক উপাদান

উপসর্গ ও প্রত্যয় বাংলা শব্দগঠনে বড় ব্যাকরণিক উপাদান। নতুন শব্দগঠনে উভয়েরই পরম আশ্রয় হয় শব্দমূল এবং ক্রিয়ামূল। শব্দমূল এবং ক্রিয়ামূল উভয়ের আগে বসে উপসর্গ এবং পরে বসে প্রত্যয়। তবে উপসর্গ এবং প্রত্যয় সন্ধিতে ঘনিষ্ঠ অবস্থানে আসতে পারে কেবল তাদের ধ্বনিগত প্রান্তের কারণে। উপসর্গের প্রান্তীয় শেষ ধ্বনির সঙ্গে প্রত্যয় প্রান্তীয় প্রথম ধ্বনির সংযোগে নতুন শব্দগঠনের বিষয়টি এখানে উল্লেখযোগ্যভাবে দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। উপসর্গ এবং প্রত্যয় উভয়ই কেবল শব্দাংশ। দুটোরই নিজের কোনো স্বাধীন অর্থ নেই, অথচ উভয়ের ধ্বনি সংযোগে উভয়ে সংযুক্ত হয়ে একটি অর্থবহ শব্দগঠন করতে পারে। বাংলা ব্যাকরণে দুইটি অর্থহীন বিষয় একত্র হয়ে কেবল অর্থবহ শব্দ তৈরির এমন দৃষ্টান্ত সন্ধি ছাড়া অন্যত্র বিরল। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তগুলো নমুনা হিসেবে ছকে দেওয়া যেতে পারে—

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রান্তীয় ধ্বনি বন্ধন	সংযোগ-ধরন
অতি + ইত	অতীত	ই + ই = ঈ	১. দুইটি হ্রস্বস্বর মিলে একটি দীর্ঘস্বর হয়েছে।
অতি + ইব	অতীব	ই + ই = ঈ	
প্রতি + ইত	প্রতীত	ই + ই = ঈ	
অতি + অন্ত	অত্যন্ত	ই + অ = য় + অ	২. ভিন্নধরনের পাশাপাশি স্বর অন্য স্বরধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে।
অনু + ইত	অন্বিত	উ + অ = ব্ + অ	
দুঃ + থ	দুঃস্থ	উঃ + থ = স্থ	৩. ভিন্নধরনের পাশাপাশি ব্যঞ্জনধ্বনি অন্য ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে।
দুঃ + স্থ	দুঃস্থ	উঃ + স্থ = ঃস্থ	
নিঃ + চয়	নিশ্চয়	ইঃ + চ = শ্চ	

ছক-৩: উপসর্গ + প্রত্যয় = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন।

বিচ্ছেদ গঠন-৪: শব্দ + প্রত্যয়কেন্দ্রিক উপাদান

মৌলিক শব্দকে সন্ধি গঠনের প্রাণ বলা হয়। সন্ধি-বিচ্ছেদ প্রান্তে এর অস্তিত্ব সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। যেক্ষেত্রে প্রাতিপদিক এর প্রান্তীয় ধ্বনির সঙ্গে প্রত্যয় প্রান্তীয় প্রথম ধ্বনির সন্ধি হয় সেক্ষেত্রে প্রথম অবস্থানে থাকে মৌলিক শব্দ। প্রত্যয়-পূর্ব এই মৌলিক শব্দ প্রত্যয় থেকে প্রথম ধ্বনিকে গ্রহণ করে বিচিত্র অর্থে নতুন শব্দগঠন করে। একটি মৌলিক শব্দ একটি প্রত্যয় থেকে প্রথম ধ্বনিকে গ্রহণ করে যে রূপান্তর ঘটায় তাতে বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিটি তীব্রভাবে প্রমাণিত হয়। সন্ধি না হলে শব্দ প্রান্তীয় শেষ ধ্বনি ও প্রত্যয় প্রান্তীয় প্রথম ধ্বনির এমন রূপান্তর ঘটানো প্রায় অসম্ভব ছিলো। নিম্নোক্ত ছকের নমুনাগুলো উপরিউক্ত বক্তব্যের প্রমাণ বহন করে।

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রাণ্ডীয় ধ্বনি বন্ধন	সংযোগ-ধরন
সদা + এব	সদৈব	আ + এ = ঐ	১. ভিন্নধরনের পাশাপাশি স্বর অন্য স্বরধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে।
আদি + অন্ত	আদ্যন্ত	ই + অ = য় + অ	
অনু + ইত	অন্বিত	উ + ই = ব্ + ই	
তনু + ঙ্গ	তন্বী	উ + ঙ্গ = ব্ + ঙ্গ	
অনু + অয়	অন্বয়	উ + অ = ব্ + অ	
পুনঃ + অপি	পুনরুপি	অঃ + অ = র্	২. ভিন্নধরনের পাশাপাশি স্বর রূপান্তর হয়েছে।
পতৎ + অঞ্জলি	পতঞ্জলি	ত্ + অ = ঞ্জ	৩. নিপাতন ব্যঞ্জনসন্ধি

ছক-৪: শব্দ + প্রত্যয় = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন।

বিচ্ছেদ গঠন-৫: ক্রিয়ামূল + প্রত্যয়কেন্দ্রিক উপাদান

ক্রিয়াপদের মূল অংশকে ক্রিয়ামূল বলে। ক্রিয়ামূলের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েও বাংলায় নতুন শব্দগঠন করে। সন্ধি প্রক্রিয়ায় বিচ্ছেদ অংশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর প্রথম অংশে ক্রিয়ামূলের শেষ প্রাণ্ডীয় ধ্বনি এবং প্রত্যয় প্রান্তের প্রথম ধ্বনি সংযোগ হয়ে নানা ধরনের শব্দগঠন করে। এক্ষেত্রে মৌলিক ক্রিয়ামূল সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি উভয়ের ক্রিয়ামূল ও প্রত্যয়প্রান্ত সন্ধি পাওয়া যায়। নিম্নোক্ত ছকের^৫ উদাহরণগুলো তার ব্যাপকতা প্রমাণ করে-

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রাণ্ডীয় ধ্বনি বন্ধন	সংযোগ-ধরন
নে + অন	নয়ন	এ + অ = অয় + অ	১. ভিন্নধরনের পাশাপাশি স্বর অন্য স্বরধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে।
শে + অন	শয়ন	এ + অ = অয় + অ	
নৈ + অক	নায়ক	ঐ + অ = আয় + অ	
গৈ + অক	গায়ক	ঐ + অ = আয় + অ	
পো + অন	পবন	ও + অ = অব্ + অ	
লো + অন	লবণ	ও + অ = অব্ + অ	
পৌ + অক	পাবক	ঔ + অ = আব্ + অ	
পো + ইত্র	পবিত্র	ও + ই = অব্ + ই	
নৌ + ইক	নাবিক	ঔ + ই = আব্ + ই	
ভৌ + উক	ভাবুক	ঔ + উ = আব্ + উ	
দিक् + অন্ত	দিগন্ত	ক্ + অ = গ্ + অ	২. ভিন্নধরনের পাশাপাশি ব্যঞ্জনধ্বনি অন্য ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে।
ণিচ + অন্ত	ণিজন্ত	চ্ + অ = জ্ + অ	
সুপ্ + অন্ত	সুবন্ত	প্ + অ = ব্ + অ	
শম্ + কা	শঙ্কা	ম্ + ক = ঙ্গ + ক	

সন্ধির ব্যাকরণিক গঠন ও উপাদান বিন্যাস

যাচ্ + না	যাচঞা	চ্ + ন = চ্ + ঞ	৩. আংশিক প্রভাবিত পরিবর্তন হয়েছে।
রাজ্ + নী	রাজ্ঞী	জ্ + ন = জ্ + ঞ	
যজ্ + ন	যজ্ঞ	জ্ + ন = জ্ + ঞ	
কৃষ্ + তি	কৃষ্টি	ষ্ + ত = ষ্ + ট	
ষষ্ + থ্	ষষ্ঠ	ষ্ + থ্ = ষ্ + ঠ	
দৃষ্ + তি	দৃষ্টি	ষ্ + ত = ষ্ + ট	
সৃজ্ + তি	সৃষ্টি	জ্ + ত = ষ্ + ট	
ষষ্ + থী	ষষ্ঠী	ষ্ + থ্ = ষ্ + ঠ	
কিম্ + বা	কিংবা	ম্ + ব = ং + ব	
এবম্ + বিধ	এবংবিধ	ম্ + ব = ং + ব	

ছক-৫: ক্রিয়ামূল + প্রত্যয় = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন।

বিচ্ছেদ গঠন-৬: ক্রিয়ামূল + শব্দকেন্দ্রিক উপাদান

কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্রিয়ামূলের সঙ্গে মৌলিক শব্দকেন্দ্রিক বিচ্ছেদ গঠনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নিম্নোক্ত ছকে কতগুলো নমুনা দেওয়া হলো:

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রাণীয়া ধ্বনি বন্ধন	সংযোগ-ধরন
ক্ষুধ্ + কাতর	ক্ষুৎকাতর	ধ্ + ক = ত্ + ক	১. ভিন্নধরনের পাশাপাশি ব্যঞ্জনধ্বনি অন্য ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে।
ক্ষুধ্ + পিপাসা	ক্ষুৎপিপাসা	ধ্ + প = ত্ + প	
অহম্ + কার	অহংকার	ম্ + ক = ং + ক	
প্রাক্ + আর্য	প্রাগার্য	ক্ + আ = গ্ + আ	
বাক্ + ইন্দ্রিয়	বাগিন্দ্রিয়	ক্ + ই = গ্ + ই	২. আংশিক প্রভাবিত পরিবর্তন হয়েছে।
চিৎ + আকাশ	চিদাকাশ	ত্ + আ = দ্ + আ	
ল্যপ্ + অর্থক	ল্যবর্থক	প্ + অ = ব্ + অ	
দিক্ + দর্শন	দিগদর্শন	ক্ + দ = গ্ + দ	
ষট্ + দর্শন	ষড়দর্শন	ট্ + দ = ড্ + দ	৩. কখনো ঘোষীভবন হয়েছে।
দিক্ + বিদিক	দিগ্বিদিক	ক্ + ব = গ্ + ব	
মৃত্যুম্ + জয়	মৃত্যুজয়	ম্ + জ = ঞ্ + জ	
			৪. কখনো অঘোষীভবন হয়েছে।

ছক-৬: ক্রিয়ামূল + শব্দ = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন।

বিচ্ছেদ গঠন-৭: অব্যয় + শব্দ/প্রত্যয়কেন্দ্রিক উপাদান

অব্যয় হলো অপরিবর্তনীয় শব্দ। কয়েকটি বিশেষ তৎসম অব্যয় সন্ধির প্রথম প্রান্তে ব্যবহৃত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: যথা, তথা, যদি, সদা ইত্যাদি। এই অব্যয়গুলোর সঙ্গে কখনো প্রত্যয়, আবার কখনো শব্দ সংযোগ হয়ে সন্ধি প্রক্রিয়ায় নতুন শব্দ গঠিত হতে দেখা যায়। কয়েকটি নমুনা নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হলো:

বিচ্ছেদ ভগ্নাংশ	সম্মিলিত বন্ধন	প্রান্তীয় ধ্বনি বন্ধন	সংযোগ-ধরন
যথা + অর্থ	যথার্থ	আ + আ = আ	১. দুইটি দীর্ঘস্বরের একটি লোপ হয়েছে অপরটি বহাল রয়েছে।
সদা + আনন্দ	সদানন্দ	আ + আ = আ	
যথা + উচিত	যথোচিত	আ + উ = ও	২. ভিন্নধরনের পাশাপাশি স্বর অন্য স্বরধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে।
যথা + উপযুক্ত	যথোপযুক্ত	আ + উ = ও	
যথা + ইষ্ট	যথেষ্ট	আ + ই = এ	
যদি + অপি	যদ্যপি	ই + অ = য্ + অ	

ছক-৭: অব্যয় + শব্দ = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন/ অব্যয় + প্রত্যয় = সম্মিলিত হয়ে নতুন শব্দগঠন।

৫

পরিশেষে প্রমাণিত হয় যে, সন্ধি হলো পাশাপাশি ধ্বনির মিলন, লোপ, সংযোজন, বিয়োজন ও রূপান্তরসহ ইত্যাদি ধরনের ধ্বনিপরিবর্তন। সন্ধিতে পাশাপাশি থাকা স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির; স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির; ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির; ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির; বিসর্গের সঙ্গে স্বরধ্বনির; বিসর্গের সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির মিলন, লোপ, সংযোজন, বিয়োজন ও রূপান্তরসহ ইত্যাদি ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। সব ধরনের সন্ধি ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়ম মেনে চলে। সন্ধিতে ধ্বনি লোপ হওয়া, ধ্বনির উদ্ভব হওয়া এবং ধ্বনির রূপান্তর হওয়া ধ্বনিপরিবর্তনের স্বাভাবিক প্রবণতার অংশ। ধ্বনিপরিবর্তনের স্বাভাবিক প্রবণতায় সন্ধি বিভিন্ন ব্যাকরণিক উপাদানের ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত এক অসাধারণ সম্মিলন।

ছক গঠন ও উদাহরণ

১ ছক গঠনে প্রয়োজনীয় উদাহরণসমূহ নেওয়া হয়েছে—

- (ক) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার (১৯৩৯)। ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলকাতা।
- (খ) বাংলা একাডেমি (২০১১)। বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (দুই খণ্ড), ঢাকা।
- (গ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ (১৯৮৩, ২০০৫, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০)। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি।

২ ছক গঠনে প্রয়োজনীয় উদাহরণসমূহ নেওয়া হয়েছে—

- (ক) শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ (১৯৩৬)। বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ঢাকা।
- (খ) বাংলা একাডেমি (২০১৪)। বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ, ঢাকা।
- (গ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ (২০১৮, ২০২০, ২০২৩)। বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি, অষ্টম শ্রেণি।

৩ ছক গঠনে প্রয়োজনীয় উদাহরণসমূহ নেওয়া হয়েছে—

- (ক) বিদ্যাভূষণ, নকুলেশ্বর (১৮৯৮)। ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলকাতা।
- (খ) হক এনামুল, মুহম্মদ (১৯৫২)। ব্যাকরণ মঞ্জুরী, রাজশাহী।
- (গ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ (২০১৮, ২০২০, ২০২৩)। বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি, সপ্তম শ্রেণি।

^৪ ছক গঠনে প্রয়োজনীয় উদাহরণসমূহ নেওয়া হয়েছে:

- (ক) রায়, রামমোহন (১৮৩৩)। *গৌড়ীয় ব্যাকরণ*, কলকাতা।
- (খ) সরকার, পবিত্র (১৯৯৪)। *পকেট বাংলা ব্যাকরণ*, কলকাতা।
- (গ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ (২০২১, ২০২২, ২০২৩, ২০২৪)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, নবম-দশম শ্রেণি।

^৫ ছক গঠনে প্রয়োজনীয় উদাহরণসমূহ নেওয়া হয়েছে:

- (ক) বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র (১৮৫০)। *সমগ্র ব্যাকরণ কৌমুদী*, কলকাতা।
- (খ) মুখোপাধ্যায়, অশোক (১৯৯৭)। *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান*, কলকাতা।
- (গ) চাকী, জ্যোতিভূষণ (১৯৯৬)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, কলকাতা।
- (ঘ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ (২০১৮, ২০২০, ২০২৩)। *বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, ষষ্ঠ শ্রেণি।

^৬ ছক গঠনে প্রয়োজনীয় উদাহরণসমূহ নেওয়া হয়েছে:

- (ক) সরকার, শ্যামাচরণ (১৮৫২)। *বঙ্গলা ব্যাকরণ*, কলকাতা।
- (খ) দাশ, নির্মল (১৯৮৭)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ*, কলকাতা, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
- (গ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ (১৯৮৩, ২০০৫, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, নবম-দশম শ্রেণি।

^৭ ছক গঠনে প্রয়োজনীয় উদাহরণসমূহ নেওয়া হয়েছে:

- (ক) মুখোপাধ্যায়, নীলমণি (১৮৭১)। *নববোধ ব্যাকরণ*, কলকাতা।
- (খ) বাংলা একাডেমি (১৯৭৪)। *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা।
- (গ) বাংলা একাডেমি (২০১৬)। *আধুনিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা।
- (ঘ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ (২০২১, ২০২২, ২০২৩, ২০২৪)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, নবম-দশম শ্রেণি।

তথ্যসূত্র

- আজাদ, হুমায়ুন। *বাক্যতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪।
- আজাদ, হুমায়ুন। *বাঙলা ভাষা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪।
- চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *ভাষা-প্রকাশ বঙ্গলা ব্যাকরণ*, কলকাতা, ১৯৩৯।
- চাকী, জ্যোতিভূষণ। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, কলকাতা, ১৯৯৬।
- চৌধুরী, মুনীর ও হায়দার, মোফাজ্জল। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, নবম-দশম শ্রেণি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩, ২০০৫, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *শব্দতত্ত্ব*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯০৯।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *বাংলা ভাষা পরিচয়*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৩৮।
- ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর। *বঙ্গলা ব্যাকরণ*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা, ১৩০৮।
- দাশ, নির্মল। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ*, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৮৭।
- দাক্ষী, অলিভা। *বাংলা ভাষাবিজ্ঞান অভিধান*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৩।
- বাংলা একাডেমি। *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা, ১৯৭৪।
- বাংলা একাডেমি। *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা, ২০১৬।
- বাংলা একাডেমি। *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (দুই খণ্ড)*, ঢাকা, ২০১১।
- বাংলা একাডেমি। *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ*, ঢাকা, ২০১৪।
- বিশ্বাস, সুখেন। *প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪।

-
- ভট্টাচার্য্য, শিশির। *বাংলা ব্যাকরণের রূপরেখা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১।
- ভট্টাচার্য্য, শিশির। *অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩।
- ভট্টাচার্য্য, সুভাষ। *বাঙালির ভাষা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০০০।
- মিশ্র, সরস্বতী। *বিতর্ক : বাংলা ব্যাকরণ*, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৭।
- মুখোপাধ্যায়, অশোক। *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান*, কলকাতা, ১৯৯৭।
- রহমান, মতিয়র। *ব্যাকরণের রস, অবসর*, ঢাকা, ২০১৫।
- সরকার, স্বরোচিষ। *বাংলা ভাষার বর্ণনা একটি বিকল্প ব্যাকরণ* (মূল: রুথ টমসন, হানা), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২১।
- শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, ঢাকা, ১৯৩৬।
- শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ। *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৩।
- শাক্তী, হরপ্রসাদ। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা, ১৩০৮।
- সরকার, যতীন। *গল্পে গল্পে ব্যাকরণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮।
- সরকার, যতীন। *ব্যাকরণের ভয় অকারণ*, নন্দিত, ঢাকা, ২০১৫।
- সরকার, পবিত্র। *পকেট বাংলা ব্যাকরণ*, কলকাতা, ১৯৯৪।
- সরকার, পবিত্র। *বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬।
- সরকার, স্বরোচিষ ও অন্যান্য। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি*, নবম-দশম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০২১, ২০২২, ২০২৩, ২০২৪।
- সেন, সুকুমার। *ভাষার ইতিবৃত্ত*, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬৪।
- হক এনামুল, মুহম্মদ। *ব্যাকরণ মঞ্জুরী*, রাজশাহী, ১৯৫২।
- হক, মাহবুবুল। *বাংলা ভাষা কয়েকটি প্রসঙ্গ*, অবসর, ঢাকা, ২০০৪।
- হালদার, গুরুপদ। *ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৩৫০।
- হাই আবদুল, মুহম্মদ। *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৪।

কুরআন গবেষণায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভির কৃতিত্ব

ড. মুহাম্মদ শফিউল্লাহ কুতুবী *

প্রতিপাদ্যসার: যখন উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্যের সূর্য ক্রমেই অপস্রয়মান হচ্ছিল তখন জ্ঞান, গবেষণা ও ইজতিহাদের এক নতুন সূর্য উদিত হয়েছিল এবং তার আলোয় আলোকিত শুধু উপমহাদেশ নয় উদ্ভাসিত হয়েছিল সমগ্র মুসলিমবিশ্ব। তিনি হলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূর্তপ্রতীক ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (১৭০৩-১৭৬২ খ্রি.)। সাধারণ মানুষের জন্য কুরআন বুঝা সহজ করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। মানুষের কাছে কুরআনের প্রকৃত বাণী পৌঁছে দেওয়ার যুগের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন বলে মনে করতেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ। তিনি রচনা করেছেন মুকাদ্দামাহ, ফাতহুর রহমান, ফওযুল কবীল, ফাতহুল খবীর ও তাবীরুল আহাদীস এবং এই গ্রন্থগুলোতে তিনি তাফসীরের মূলনীতি বর্ণনার পাশাপাশি তাফসীরের পুরনো রীতি ও ধারায় নতুনত্ব এনেছেন। আঠারো শতকের পরে লিখিত তাফসীরগুলোতে তাঁর সংশ্লিষ্ট রচনাবলির প্রভাব সুস্পষ্ট।

ভূমিকা : আঠারো শতকের তাফসীর-বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থ ও গবেষণা মূল্যায়ন করা হলে লক্ষ করা যায়, তখন কুরআন মাজীদের অর্থ, মর্ম ও বার্তা নিয়ে অধ্যয়ন এবং চর্চা কেবল ধর্মবিদ আলিমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সাধারণ মানুষ কেবল এর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস পোষণ করবে- এমন ধারণা জনপরিসরে ছিলো একেবারে সর্বজনীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত। সাধারণ মানুষের মধ্যে কুরআন অধ্যয়ন, কুরআনের শিক্ষাগুলো অনুসন্ধান ও আত্মস্থ করার মতো বিষয় পুরোপুরি অনুপস্থিত। কুরআন বুঝা, কুরআনের ভাষা নিয়ে চিন্তা ও তাদাক্বুর এবং কুরআনি শিক্ষার আলোয় জীবন সাজানো যেন তাফসীরুল কুরআনের বিষয়বস্তুই নয়। অথচ কুরআনের ভাষা এবং এতে বিধৃত বিষয় ও প্রসঙ্গসমূহের ওপর চিন্তা বা তাদাক্বুরই এর বিষয়বস্তু হিসেবে চর্চিত হওয়া যৌক্তিক। ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গনগুলোতে জালালাইন ও কাশশাফের মতো তাফসীরগুলো পাঠ্য ছিলো এবং সমাজের লোকেরাও কুরআন মাজীদের সঙ্গে একরকম যুক্ত ছিলো বটে কিন্তু এমন আবেগনির্ভর বন্ধন কুরআন অনুধাবন ও বাস্তব শিক্ষাকে উন্মোচন আর বিকাশ ঘটানোর পরিবর্তে শুধু জড়তা ও বন্ধাত্ম তৈরির কারণ হয়েছে। ড. সউদ আলম কাসেমি আঠারো শতকের এরূপ প্রেক্ষাপটের পার্শ্বচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে উল্লেখ করেন :

“দৃষ্টিভঙ্গির জায়গায় কুরআনুল কারিমকে ইসলামি আইন ও শরীয়তের প্রথম উৎস হিসেবে মান্য করা হতো বরাবরই কিন্তু বিধানগত গবেষণার ক্ষেত্রগুলোতে জড়তা শেকড় গেড়ে বসেছিল। তাসাউফের বয়ান, নানা কেচ্ছাকাহিনী ও গল্পের জন্য জমকালো আসর জমে উঠতো সবসময়, কিন্তু কুরআনকেন্দ্রিক আলোচনার কোনো হালাকা বা বৈঠকের আয়োজনের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যেতো না। মানুষের ধারণা ছিলো, কুরআন বুঝা আর সে বিষয়ে গবেষণা একান্তই আলিমদের কাজ; তাদের জন্য কুরআনের তিলাওয়াতটাই যথেষ্ট। অপরদিকে কুরআনের দারস বা পড়াশোনার অঙ্গণেও মূলভাষ্য অনুধাবনকে ছাপিয়ে তাফসীর পাঠের মনোযোগ থাকতো বেশি (কাসেমি ৫৯)।

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

এ প্রেক্ষাপটে ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি ও তাঁর বংশীয় উত্তরাধিকারীগণ কুরআন চর্চার প্রচলিত ধারাকে পেছনে ফেলে সমাজকে এমন এক নতুনধারায় কুরআন চর্চার সঙ্গে পরিচিত করানোর প্রয়াস পান, যেখানে কুরআন বুঝা, কুরআন নিয়ে চিন্তা করা, কুরআনের বক্তব্যকে সহজীকরণের মৌলিক উপায় ও পথনির্দেশনা বিদ্যমান ছিল। শাহ ওয়ালি উল্লাহর সন্তানরাই যেন কুরআনে কারিমের অনালোচিত জগৎ ও দুর্গম উপত্যকাকে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এর পরিপূর্ণ শিক্ষাকে সাধারণের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের নিকট কুরআন মাজীদ সম্বন্ধে যাবতীয় অপরিচিতির কালোকুয়াশার পর্দা সরে যায়। উনিশ শতকে কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন আন্দোলনের দৃশ্যমান জাগরণ ও তাফসীর সাহিত্যের আধিক্য— যা আঠারো শতকে লিখিত তাফসীর গ্রন্থাবলির তুলনায় ছিলো অনেক বেশি। বস্তুত, এটি ছিলো শাহ ওয়ালিউল্লাহ খান্দানের কৃতিত্বের ফসল। যদিও তিনি ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রের সকল শাখায় বিস্তারিত অবদান রেখেছেন তবুও কুরআন গবেষণার বিষয়টি তাঁর বিশেষ মনোযোগ ও কাজের প্রধান ক্ষেত্র ছিলো বলা যায়। শাহ ওয়ালিউল্লাহর পিতা শাহ আবদুর রহিম (১৬৪৪- ১৭১৯ খ্রি.) ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের দাহলি অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রখর মেধা, ধীশক্তি ও বহুমাত্রিক প্রতিভায় ক্ষণজন্ম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। *ফতোয়ায়ে আলমগীরী*র মতো ইসলামি আইনের বিশাল কোড সংকলনে তাঁর অবদান প্রাধান্যযোজ্য। ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়াও গণিত, জ্যামিতি ও প্রকৌশল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন শাহ আবদুর রহিম দেহলভি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কোনো তাফসীর ছাড়াই কুরআনের ভাষ্য বোঝার চেষ্টা করা। তাঁর পাঠদানের বৈশিষ্ট্য ছিল, শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কুরআনের কঠিন জায়গাগুলো সরাসরি কুরআন থেকেই বুঝিয়ে দেওয়া (জালবানি ২৭)।

কোনো তাফসীরের সহায়তা ছাড়া কুরআন অনুধাবন ও চর্চার তত্ত্বটি শাহ ওয়ালিউল্লাহর পিতা শাহ আবদুর রহিমের চিন্তার উৎসার; যে চিন্তাধারাকে শাহ ওয়ালিউল্লাহ পরবর্তী সময়ে আরও এগিয়ে নিয়েছেন। (শাহ ওয়ালি উল্লাহ, ১৮৯৭ : ১৮০) তিনি এই অভিরুচি তাঁর পিতার কাছ থেকে পেয়েছেন। শাহ আবদুর রহিমের একটি রীতি ছিল, তিনি তাঁর বন্ধুদের কোনো মজলিসে শ্রেফ কুরআন তিলাওয়াত করে থেমে যেতেন না, বরং কমপক্ষে দুয়েকটি রুকু অর্থ ও ভাষ্য নিয়ে আলোচনা করতেন (সিক্কি ৫৭)।

পৈতৃকসূত্রে কুরআনের ভাষ্য, আবেদন ও উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও চর্চার এই স্বতন্ত্র রীতি নিয়ে তিনি গর্ববোধ করতেন। বিভিন্ন মজলিসে এটিকে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি সেরা অনুগ্রহ বলে আখ্যায়িত করেন। (শাহ আবদুল আজিজ, ১৩১১ হি. : ৭) এ কারণে তিনি হাদিসের পাঠ দেওয়ার আগে কুরআন কারিমের পাঠ দিতেন। (শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ১৩০৩ হি. : ১) তিনি বরং এক জায়গায় এ-পর্যন্ত বলেছেন, বাচ্চাদের বোধ-বুদ্ধি পরিপক্বতা পৌঁছার আগ থেকেই তাদেরকে কিছু কিছু অর্থসহ কুরআন পড়ানো উচিত; যাতে তাদের চিন্তার সুষ্ঠু গঠন হাতছাড়া না হয় (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ১)।

কুরআন গবেষণায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভির কৃতিত্ব

কুরআন মাজীদের জ্ঞানগত গুঢ়রহস্য, সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বেশ মনমুগ্ধকর আঙ্গিকে আলোচনা করতেন। কুরআন মাজীদের প্রতিটি বাক্য, আয়াত ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণধর্মী পাঠদানে তাঁর উদ্দেশ্য থাকতো, শিক্ষার্থীরা যেন কুরআনের সামগ্রিক মর্ম, বার্তা ও আবেদন যথাযথভাবে অনুধাবনের সক্ষমতা অর্জন করে (শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ১৩০৩ হি. : ২)। শাহ ওয়ালিউল্লাহর কুরআনসংশ্লিষ্ট অবদানগুলোর দিকে লক্ষ করলে প্রতিভাত হয় যে, কুরআনকে মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে তাঁর প্রত্যয় ছিল সুস্পষ্ট। যথা—

১. সমকালের শিরকযুক্ত রেওয়াজ ও সামাজিক কুসংস্কারের প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য তিনি কুরআন বুঝার বিষয়টিকে সর্বজনীন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সামাজিক কুপ্রথা ও রেওয়াজের প্রতিকার আগেকার তাফসীরগ্রন্থে না খুঁজে সরাসরি কুরআনেই অনুসন্ধান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর কুরআনের অনুবাদগ্রন্থও এই চেষ্টার অংশ।
২. তিনি আইন ও বিধানের প্রথম ও প্রধান উৎস হিসেবে কুরআনকে সামনে রাখতেন; যাতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি বিষয়াদির সমাধান খোঁজার ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদ প্রাধান্য পায়। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে এমন উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়।
৩. কুরআনে কারিম নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনে তৃপ্তি ও প্রশান্তির পরিবর্তে একে সামাজিক ও সামষ্টিক লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম মনে করতেন তিনি।
৪. পৃথিবীর অন্যান্য মতবাদ ও ধর্মের ওপর ইসলামের বিজয় খেলাফতে রাশেদার আমলে অর্জন হয়েছে; এর জন্য নতুনভাবে কোনো নবি-অলির অপেক্ষায় থাকা অপ্রয়োজনীয়। দীন বিজয়ের লক্ষ্যে কুরআন মাজীদই স্বয়ং পরিপূর্ণ মানবিক জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন করেছে। কুরআনে কারিমের মর্মকে বিশেষ শাস্ত্রে এবং তার উপযোগিতাকে শানে নুযুলের নির্দিষ্ট ঘটনায় সীমাবদ্ধ করার বৈধতা নেই; বরং এটি গোটা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সামগ্রিক, বৈপ্লবিক ও কালোত্তীর্ণ সমাধান।
৫. তাঁর মতে, কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলির উদ্দেশ্য হলো, স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মানবজাতিকে শুদ্ধ ও সুন্দর জীবনধারা ‘সিরাতুল মুস্তাকিম’ে ফিরিয়ে আনা। কেননা, কুরআনের ভাষ্য থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, মানুষকে (তার করণীয়-বর্জনীয় ও গন্তব্য) স্মরণ করিয়ে দেওয়া কুরআন নাজিলের সাধারণ উদ্দেশ্য।
৬. কুরআনে কারিম সুবিন্যস্ত ও সুগঠিত একটি গ্রন্থ। এর বর্ণনা-ভাষ্যের ধরন, আঙ্গিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ মর্ম অনুধাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালা আত্মস্থ করা খুবই জরুরি।
৭. শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতে সঠিক জ্ঞান হলো যা সময়ের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম। এই বিবেচনায় কুরআন মাজীদই একমাত্র সমকালীন গ্রন্থ যা একইসঙ্গে যে কোনো কাল ও সময়ের চাহিদা পূরণে বরাবরই সক্ষমতা রাখে। কেউ যদি নিজের সময় ও কালের সঠিক চিত্র পেতে চায় তবে বিশেষ কোনো ব্যাখ্যার আশ্রয় ব্যতিরেকে কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনা তাকে গ্রহণ করতে হবে।

আল-কুরআন সম্পর্কিত তাঁর রচনাবলি পর্যালোচনা

শাহ ওয়ালিউল্লাহর লিখিত প্রায় শতাধিক গ্রন্থে তাঁর কুরআন মাজিদকেন্দ্রিক চিন্তাধারার প্রতিফলন লক্ষ করা গেলেও এখানে সুনির্দিষ্টভাবে কতিপয় গ্রন্থের একটি তালিকা দেওয়া হলো; যেখানে কুরআন মাজীদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে :

১. ফাতহুর রহমান :

এটি সাধারণ মানুষের কুরআন বুঝার জন্য ফার্সি ভাষায় রচিত একটি সংক্ষিপ্ত তাফসীর ও অনুবাদগ্রন্থ। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে শুরু করেন। এর আগে তিনি সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরানের তরজমা সম্পন্ন করেন। ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হারাইমানের জিয়ারতের মনস্থ করেন। ১৭৩৩

খ্রিস্টাব্দে জিয়ারতে হারামাইনের ব্যস্ততার কারণে তরজমায়ে কুরআনের কাজ হয় নি। ১৭৩৩ সালের পর পুনরায় শুরু করা তরজমার কাজ দশ পারা সম্পন্ন হয়। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে আবারও কাজ শুরু হলে সম্পন্ন হয় বিশ পারা। ১৭৩৮ খ্রি. ডিসেম্বর মাসে শেষ হয় শেষের দশ পারার কাজ। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে খাজা মুহাম্মদ আমিন কাশিরির প্রচেষ্টায় কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। ১৭২৮ সালে শুরু হয়ে ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে পুরো তরজুমায়ে কুরবানের কাজ সম্পন্ন হয়।

১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে শাহ ওয়ালিউল্লাহর নির্দেশে এ-অনুবাদের প্রথম কপি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। হায়দারাবাদ ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটির ২০৪ নম্বর গ্রন্থাগারে এর একটি হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। আরেকটি কপি রয়েছে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭১৫ নম্বর গ্রন্থাগারে। আরেকটি কপি সংরক্ষিত আছে খোদাবখশ লাইব্রেরির (পাটনা, ভারত) ১১৫৭-১১৫৮ নম্বর কক্ষে। এটি দুই খণ্ডের; পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ৩৮১ ও ৩৩৪। অনুলিপিকার ছফিউল্লাহ ইবন শাইখ ফকিরুল্লাহ এটি সম্পন্ন করেন ১১৮১ হিজরির ২৭ রবিউস সানিতে। দারুল উলুম দেওবন্দের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ফাতহুর রহমান এর দুটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি টীকাসহ সংরক্ষিত আছে। উক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নিম্নের বিখ্যাত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়। যথা—

১. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট লাইব্রেরির (টংক), কক্ষ নং ৪২৬৪/২। কক্ষ নম্বর ৪২৬৪/১৮২-১-৩ (হাশিয়ায়ে তরজমায়ে ফাতহুর রহমান নামে এবং টীকা সম্বলিত)
২. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ লাইব্রেরি (আলীগড়) কক্ষ নম্বর- ১/৬৫ এ।
৩. জামিয়া মিল্লিয়ায় (দিল্লি) কক্ষ নম্বর যথাক্রমে (৭১১৪)-১১৮ ও (১৪০৩) ০০৩৮।
৪. দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌসহ আরও চৌদ্দটি লাইব্রেরিতে এর পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ১৫)।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ কুরআন মাজীদের আলোচ্য অনুবাদে সারগর্ভ, সংক্ষিপ্ত একটি ভূমিকা সংযোজন করেন। তিনি তরজমার উদ্দেশ্য ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সাবলীলভাবে তুলে ধরেন। পাঠকের জন্য তাঁর মুখবন্ধটি নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে। ভূমিকাটি বিভিন্ন বিন্যাসে প্রকাশিত একাধিক সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে। তবে গ্রন্থটির সবচেয়ে উন্নত ও নির্ভরযোগ্য সংস্করণ হলো খানাকায়ে রায়পুরের মসনদনশীন মুফতি আবদুল খালেক আজাদ কৃত সংস্করণ। মুফতি আবদুল খালেক আজাদ (জ. ১৯৭২ খ্রি.) শায়খুল হাদিস ওয়াত তাফসীর, ইদারায় রহিমিয়া উলুমে কুরআনিয়া, লাহোর, পাকিস্তান। ফার্সি ভাষায় কুরআন মাজীদের অন্যান্য তরজমা থাকা সত্ত্বেও শাহ ওয়ালিউল্লাহর তরজমার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেন :

“আজকের স্থান-কাল বিবেচনায় মুসলমানদের সর্বজনীন কল্যাণচিন্তার দাবি হলো, সরল ও প্রচলিত ফার্সি ভাষারীতিতে সাধারণের জন্য কুরআন মাজীদের অনুবাদ করা। যে অনুবাদের ভাষা হবে বাহুল্যবর্জিত, নির্মেদ ও ব্যাখ্যামুক্ত। যেখানে থাকবে না কোনো টীকা ও বিশ্লেষণ। যাতে সাধারণ-বিশেষ সকলেই এটি সমানভাবে বুঝতে পারে” (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ১)।

শাহ ওয়ালিউল্লাহর ভূমিকার এরূপ ভাষ্য থেকে স্পষ্ট হয়, তাঁর সমকালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন সর্বসাধারণের মাঝে ব্যাপকতা লাভ করে নি। লোকেরা রুমি, সাদী ও জামির কবিতার আসর জমাতো কিন্তু কুরআনের মজলিসে মানুষের সমাগম হতো না। তরজমায়ে কুরআন ছিল প্রকৃতপক্ষে তৃণমূল মানুষের কাছে কুরআনচর্চার চেতনাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস। পরিতাপের বিষয় হলো, কতিপয় সমালোচক শাহ

ওয়ালিউল্লাহর ওপর অপবাদ দেন যে, ‘তিনি শ্রেফ নিজের সাহিত্যরুচির তৃপ্তির জন্য কুরআন মাজীদের স্বতন্ত্র অনুবাদ করেছিলেন।’ এ-প্রসঙ্গে সাইয়েদ আতহার আব্বাস রিজভী বলেন :

“The new translation being started by Shah Wali Allah to satisfy his own literary and spiritual tastes. He did not give high priority to its production” (Rizwi 231).

অথচ এমন অভিযোগ সর্বৈব ভিত্তিহীন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ তরজমায়ে কুরআনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকারীদেরকে অনুলিপি তৈরির ক্ষেত্রে এই মর্মে সুস্পষ্টভাবে নিয়ম-কানুন বেঁধে দেন যে, কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। কুরআনের অনুবাদ বিষয়ে নিজের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি এভাবে উল্লেখ করেন :

১. এ অনুবাদ বিশেষভাবে কৃষক-শ্রমিক অর্থাৎ প্রান্তিক স্তরের মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও যারা নানান ব্যস্ততার কারণে তেমন সময় বের করতে পারেন না এবং জীবনের শেষ সময়ে এসে কুরআনের দিকে মনোযোগী হয়েছে তারাও এ থেকে উপকৃত হতে পারবে। শিশু-কিশোরদের কিছুটা বোধ গড়ে ওঠার সঙ্গেসঙ্গে এ অনুবাদ পড়তে দেওয়া উচিত। যাতে তারা চারপাশের নেতিবাচক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত না হয় এবং স্বভাবগত ইসলামি নৈতিকতায় গড়ে ওঠে।
২. এ অনুবাদের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, (অনারব ভাষাভাষী) সাধারণ মানুষ যারা আরবি ব্যাকরণ বুঝতে সক্ষম নয়, তাদের জন্য কুরআন মাজীদের মোটামুটি প্রাথমিক পর্যায়ের অনুবাদ পড়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া। সাধারণ মানুষ যেহেতু দীর্ঘ ও বিস্তারিত তাফসীর অধ্যয়ন করার যোগ্যতা রাখে না; কাজেই তাদের অধ্যয়ন তরজমায়ে কুরআন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।
৩. এ তরজমায় পরিচিত বাক্য, সহজ শব্দ, সরল বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে সাধারণ মানুষ কুরআনের শিক্ষাকে সমকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সমন্বয় করে দীনি ও কুরআনি চেতনায় সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে।
৪. প্রাচীন তাফসীরগুলোতে হয়তো শাস্ত্রিক অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদের রীতি অনুসৃত হয়েছে। উভয় প্রকারের কিছু ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এখানে দুটির সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। বিশ্লেষণধর্মী শব্দ ব্যবহার করার ফলে এ তরজমা শ্রেফ অনুবাদ নয় বরং ভাবপ্রসারী তরজমায় পরিণত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, তরজমা নয় যেন তরজমানি (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ২৯১)।

এ তরজমার কতিপয় বৈশিষ্ট্য

ফাতহুর রহমান গ্রন্থে শাহ ওয়ালিউল্লাহ এ তরজমার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত টীকা সংযোজন করেছেন; যা কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে বেশ সহায়ক। এসব টীকায় তিনি শানে নুযুল, আয়াতের পূর্বাপর ধারাবাহিকতা, নাসেখ-মানসূখ (রহিত বা রহিতকারী) আয়াত, ফিকহবিধান, উপমা, প্রাসঙ্গিক ঘটনা বিষয়ে আলোকপাত করেন। এই টীকার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, অল্পকথায় মর্মের ব্যাপকতা। যেমন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ

এ-আয়াতের অনুবাদ করেছেন, “হে নবি, আপনি কাফির ও মুনাফিকদের সঙ্গে লড়াই করুন” (সূরা তাওবা : ৩)। আয়াতের টীকায় মাত্র দু’টি শব্দ লিখেছেন, তরবারি ও মুখে। কাফিরদের সঙ্গে জিহাদ হবে তরবারি দিয়ে আর মুনাফিকদের সঙ্গে জবানের মাধ্যমে। মাত্র দু’টি শব্দে বিস্তারিত বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারা মামুলি ব্যাপার নয়। শাহ ওয়ালিউল্লাহর অনুসারীগণ এ ধাঁচের টীকা প্রসঙ্গে ভূয়সী প্রশংসা করেন (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ৪)।

১. শাহ ওয়ালিউল্লাহ আল কুরআনের অনুবাদের একাধিক জায়গায় পূর্বসূরীদের সাথে ভিন্নমত পোষণ এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করেছেন। যেমন, (السَّالْحُونَ) (সিদ্দিক, ২০০২ : ৫৮-৬০) এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অধিকাংশ মুফাসসিরের মত হলো জান্নাত হবে সৎ লোকদের জন্য কিন্তু তিনি এখানে الْأَرْضُ (ভূমি) শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং সৎ লোক থেকে উদ্দেশ্য উন্নতে মুহাম্মদী বলে সাব্যস্ত করেন। কাজেই তিনি বলেন, শেষ জামানায় একজন আল্লাহর নবি প্রেরিত হবেন এবং তাঁর উন্নত প্রত্যেক ভূখণ্ডে বিজয়ী হবে। অনুরূপভাবে وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ আয়াতে সাকল মুফাসসিরের মত হলো, এখানে حُبِّهِ-এর সর্বনামের উদ্দিষ্ট নামপদ হলো আল্লাহ, কিন্তু শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতে তা নয়, বরং নাম পদ الْمَالَ (সুরা আশ্বিয়া : ১০৫)।

তাঁর মতে আয়াতের অর্থ- যারা সম্পদের মায়া থাকা সত্ত্বেও সম্পদ ব্যয় করে।

২. ফাতহুর রহমান গ্রন্থে শাহ ওয়ালিউল্লাহ এতটুকু অবকাশ বা ব্যাপকতা রেখেছেন যে, কোনো আয়াতের যদি একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে; তিনি সে ক্ষেত্রে সবগুলো অর্থ বর্ণনা করে দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, আয়াতের তরজমায় উভয় অর্থ করা যেতে পারে। যেমন-

الْحَاقَّةُ - مَا الْحَاقَّةُ

এর অনুবাদে লিখেছেন, কিয়ামত কী ? (সুরা হাক্বাহ : ১-২) আরেক অর্থ করেছেন, পরিণাম অবধারিত (শাহ ওয়ালি উল্লাহ, তা. বি.: ৩৭)। তিনি কতিপয় আয়াতের এমন অনুবাদ করেছেন, যা ইতোপূর্বে অন্য কারও তরজমার সঙ্গে মিলে না। যেমন- فَفَارَ التَّنُّورُ এর ক্ষেত্রে লক্ষণীয় (সুরা বাকারা : ১৭৭)। সাধারণ মুফাসসিরগণ এর উদ্দেশ্য বলেন, ভূগর্ভ থেকে পানি বের হওয়া কিন্তু শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতে এর রূপক অর্থ আল্লাহর গজব ও শাস্তি (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ৪৮০)।

৩. আয়াতের বক্তব্যে দৃশ্যত দ্বন্দ্ব নিরসনে তিনি সমন্বয়ের নীতি অবলম্বন করেছেন। যথা- মক্কী সুরাগুলোতে বলা হয়েছে, ইহুদিরা কুরআনের সত্যায়ন করে অন্যদিকে মাদানি সুরায় বলা হয়েছে তা অস্বীকার করে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ এ আয়াতে সমন্বয় এভাবে করেছেন যে, সে সময়ে যেহেতু ইহুদিদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে নি; কাজেই তারা অস্বীকারও করে নি কিন্তু মদিনায় যখন তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে; তখন তারা জেদ ও হঠকারিতাবশত কুরআনকে অস্বীকার করে বসে (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ৪৮০)।

৪. ফাতহুর রহমান গ্রন্থের কিছু দুর্বলতাও আছে। যেমন ইসরাইলি (ইহুদিদের সূত্র) বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে তিনি যে নীতি প্রণয়ন করেন তা পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য কিন্তু الْأَرْضُ جَمِيعًا আয়াতের ক্ষেত্রে তিনি উক্ত নীতি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। অনুরূপ মুসা আ. ও খিজিরের ঘটনায় তিনি 'গোলাম' শব্দের অর্থ লিখেছেন : নওজোয়ান; (সুরা হুদ : ৪০) যা আয়াতের আঙ্গিক ও ইঙ্গিতের সঙ্গে মিলে না। কারণ নওজোয়ান বুঝানোর জন্য আয়াতে فَتِيَّةٌ শব্দ রয়েছে।

ফাতহুর রহমান গ্রন্থের পর্যালোচনার জন্য বিস্তারিত বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা হয়েছে এবং আরও বহু কিছু বিশ্লেষণের সুযোগ আছে। সবকিছুর পরও বলা যায়, ফাতহুর রহমান শাহ ওয়ালিউল্লাহ শিক্ষাধারার অন্যতম বুদ্ধিবৃত্তিক বুনিয়াদ। তরজমায়ে কুরআনের সূচিত এ পথ ধরে মুয়াদ্দিহুল কুরআন ও ফাতহুল আজিজ এর মতো অসাধারণ রচনাকর্ম অস্তিত্ব লাভ করেছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য কুরআন বুঝার অধিকতর সহজ ও নতুন

দিগন্ত উন্মোচন করেছে। কাজেই, আঠারো শতকের কুরআন গবেষণার এই ধারা পরবর্তীকালে তরজমা ও তাফসীরের গবেষণাকর্মে গভীর প্রভাব ফেলেছে এমন দাবি মোটেও অত্যাুক্তি হবে না। এছাড়াও তাঁর এ-মননশীল কর্ম সংযোজন করেছে নতুন জ্ঞান-গবেষণার কতিপয় নতুন মাত্রা।

২. আল মুকাদ্দিমা ফি কাওয়ানিনিত্ তরজমা

কুরআনুল কারিমের তরজমার ক্ষেত্রে শাহ ওয়ালিউল্লাহ কতিপয় নীতিমালা প্রণয়ন করেন, যা তিনি আল মুকাদ্দিমা ফি কাওয়ানিনিত্ তরজমা শিরোনামে গ্রন্থিত করেন। এটি তাঁর ফাতহুর রহমান- গ্রন্থের শুরুতে সংযোজিত ভূমিকা থেকে আলাদা। এটি বহু বছর যাবত আলোকবর্তিকা হিসেবে গবেষকদের পথ দেখাচ্ছে। মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারভির (মৃ. ১৯৬২ খ্রি.) গ্রন্থটি নিয়ে প্রথমবারের মতো আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি গ্রন্থটির ফার্সি পাণ্ডুলিপির আলোকে উর্দু অনুবাদসহ দিল্লি থেকে প্রকাশিত মাসিক বুরহান-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। তাঁর ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপি টুংকের এরাবিক এন্ড প্রেশন ইনস্টিটিউট এর লাইব্রেরি ২/২১৬ নম্বর কক্ষে সংরক্ষিত আছে। এ-পাণ্ডুলিপির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সাইয়েদ আহমদ শহীদের ভাগিনা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী হোসাইনি সুকতির হাতে অনুলিখন। এটি ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত করা হয়; তা সত্ত্বেও অনুলিখনে বেশ কিছু লিপিগত ভুল চোখে পড়ে। বরকতের জন্য মাওলানা সিওহারভি এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করলেও অন্যান্য কপি সঙ্গে মিলিয়ে (ক্রসচেক) যাছাই-পদ্ধতি অনুসরণ করে তা প্রকাশ করা সমীচীন ছিলো (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ৩২৯) তবে তিনি এই সময়-সুযোগ পান নি। মাওলানা আবদুর রশিদ লাহোরীর মতে, মাওলানা সিওহারভি দ্রুততম সময়েই কাজটি সম্পন্ন করেন তবে তিনি নিজে অন্যান্য পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে এটা সংশোধন ও পরিমার্জনের দাবি করলেও শেষ পর্যন্ত সম্পাদিত সেই পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় নি (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ২০৯)।

আল মুকাদ্দিমা ফি কাওয়ানিনিত্ তরজমা গ্রন্থের গবেষণা-সংস্করণটি প্রস্তুত করার সৌভাগ্য হয় মুফতি আবদুল খালেক আজাদের (খানকায়ে রায়পুরের মসনদনশীন)। তিনি চারটি হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে এটার পরিমার্জন করেছেন এবং অত্যন্ত ভালো মানের উর্দু তরজমা করেছেন (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ৪৩৮)। তিনি এ-পাণ্ডুলিপিগুলো সামনে রেখে কাজ করেছেন :

১. টুংকের পাণ্ডুলিপি, ১৮১২ খ্রি., অনুলিখন : সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী;
২. নদওয়াতুল ওলামার পাণ্ডুলিপি, অনুলিখন : সাইয়েদ ইবরাহিম নসিরাবাদী;
৩. নদওয়াতুল ওলামা কপি, তারিখ ও অনুলিপিকার অজ্ঞাত;
৪. পাণ্ডুলিপি, ওরিয়েন্টাল ন্যাশনাল কলেজ, লাহোর, অনুলিখন : মাওলানা সাইয়েদ নুরুল হক আলাভি তবে তার ইন্তেকালের পর এটি হারিয়ে যায়। মুফতি আবদুল খালেক আজাদের এই কৃতিত্বপূর্ণ কাজ পরবর্তী সময়ের জন্য অনুসরণীয় গবেষণা (সিওহারভি ২৩৫)

আল মুকাদ্দিমা ফি কাওয়ানিনিত্ তরজমার আরও কিছু পাণ্ডুলিপি:

১. জামিয়া মিল্লিয়া (দিল্লি) পাণ্ডুলিপি, লাইব্রেরি কক্ষ নম্বর-০০২২ (৭৫২০০)।
২. খোদাবখশ লাইব্রেরি (পাটনা) পাণ্ডুলিপি, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬।
৩. দারুল উলুম দেওবন্দ-এর দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬।
৪. পাণ্ডুলিপি, কুতুবখানা আসিফিয়া, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬।

৫. মাওলানা সিওহারভি কাজ করেছেন এমন আরও তিনটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। যার মধ্যে প্রথমটি কপি তৈরি হয়েছে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে। এর অনুলিখন করেছেন হাফিজ মুহাম্মদ আমিন, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬। হাতে লেখা আরেকটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে লাইব্রেরি নম্বর-২/১৫৪৭ এ। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮, লাইব্রেরি নম্বর-৬/১৯৮৮। তৃতীয় পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র ৩; লাইব্রেরি নম্বর-১৪২৬৪।

৬. আরেকটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে পেশোয়ার ইউনিভার্সিটিতে, যা *ফাতহুর রহমান*-এ সংযুক্ত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬।

আল মুকাদ্দিমা ফি ফাতহির রহমান এর প্রকাশিত চারটি সংস্করণ সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যগুলো সংক্ষেপে এরূপ :

- *ফাতহুর রহমান*, মাকতাবা বাশি (মিরাত) ১৮৬৮ খ্রি./১২৮০ হি.
- *ফাতহুর রহমান*, প্রকাশক : আসাহুল্ল মাতাবি, (করাচি) তা.বি.
- *ফাতহুর রহমান*, প্রকাশক : আকাদেমি দাওয়াতে দানিশগাহ বাইনাল মিল্লিয়িল ইসলামী (ইসলামাবাদ), ২০০১-খ্রি. ১৪২২ হি.
- *ফাতহুর রহমান*, তাজ কোম্পানি লি. (লাহোর), তা.বি.

এর প্রথম মূল টেক্সট অনুবাদ করেন মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারভি, যা *মাসিক বোরহান* (দিল্লি), অক্টোবর, নভেম্বর ১৯৪৫ খ্রি. সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মূল টেক্সটসহ দ্বিতীয় অনুবাদটি করেন মাওলানা মুহাম্মদ মুশতাক তাজাওয়ারি। এটি ‘ইসলাম আওর আসরে জাদীদ’ সাময়িকী জুলাই-অক্টোবর ২০১০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তৃতীয় অনুবাদ করেন মুফতি আবদুল খালেক আজাদ। এটি পূর্বের দুটি অনুবাদকর্মের চেয়ে উন্নত মানের। সিন্ধি ভাষায় অনুবাদ করেন মাওলানা গোলাম মোস্তফা কাসেমি। এটি সিন্ধি ভাষার ‘*আর রহিম*’ (হায়দারাবাদ), অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৬৫-এ প্রকাশিত হয়। মাওলানা সউদ আলম কাসেমির মতে, *আল মুকাদ্দিমার* প্রকাশকাল ১১৫০-১১৫১ হিজরির মাঝামাঝি (আবদুর রশিদ ১৩৬)। তবে মুফতি আবদুল খালেক আজাদ একটি স্বতন্ত্র মত উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেন :

“এছটি সংকলনের ব্যাপারে উক্ত সালটিকে নির্ধারণ করা ঠিক হবে না। কারণ, *মুকাদ্দিমাতু ফাতহির রহমান* বি তরজমাতিল কুরআন এর হাতে লেখা একটি পাণ্ডুলিপি আমার কাছেও রয়েছে। এর টীকায় শাহ ওয়ালিউল্লাহর লেখা একটি নোট দেখা যায়, যাতে তিনি কুরআনের তরজমা শুরু করার সন ১৭২৮ খ্রি./১১৪১ হি. উল্লেখ করেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, এছটি ওই বছরই লেখা হয়। তা সত্ত্বেও শাহ ওয়ালিউল্লাহর একটি কথা মাওলানা কাসেমী নিজের মতের পক্ষে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ‘এটি কুরআনের তরজমাসংক্রান্ত নীতিমালা বিষয়ক পুস্তিকা। যার নাম দেওয়া হয়েছে- *আল মুকাদ্দিমা ফি কাওয়ানিনিত্ তরজমা*। কুরআন মাজীদের তরজমার পাণ্ডুলিপি তৈরির একই সময়ে তা প্রণয়ন করা হয় (আবদুর রশিদ ১৩৬)।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর সমসাময়িক তরজমা ও তাফসীরের তিনটি ধারা নিয়ে গবেষণার পর নিজে চতুর্থ ধারার সূচনা করেন। তিনি এই রচনাকর্মে আরবি-ফার্সি নানাধি ভাষা-কাঠামোর জটিলতাকে চিহ্নিত করে অনুবাদকের জন্য তার সমাধানের পথ বাতলে দিয়েছেন। তরজমায়ে কুরআনের বুনিয়াদি মূলনীতি এভাবে প্রণয়ন করেছেন যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অনুবাদকরা সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে পারেন। মুফতি আবদুল খালেক আজাদ এ বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করার জন্য এর বিশ্লেষণে উল্লেখ করেন :

‘*আল মুকাদ্দিমা ফি কাওয়ানিনিত্ তরজমা* গ্রন্থে শাহ ওয়ালিউল্লাহ তরজমায়ে কুরআনের বিষয়ে মৌলিক দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করেছেন। তিনি সামগ্রিকভাবে বিষয়টিতে গবেষণা করেছেন। ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোনো

দিক তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তিনি সূত্রও নির্ধারণ করেছেন সামগ্রিকভাবে। তবে এসব সূত্রের সবিস্তার বিশ্লেষণ পেশ করেছেন তাঁর সন্তান ও শাহ ওয়ালিউল্লাহর পরবর্তীকালে বংশধর আলিমগণ। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভির চিন্তাধারায় প্রভাবিত আলিমদের কৃত তরজমায় তাঁরই সূত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

৩. আল ফওজুল কবীর ফি উসুলিত তাফসীর :

এটি ফার্সি ভাষায় রচিত উসুলুত তাফসীর বিষয়ে এমন গ্রন্থ যা নিয়ে উপমহাদেশের আলিমদের যে কোনো মাত্রার অহঙ্কার এই অবদানের তুলনায় সামান্যই হবে। এতে তিনি বিগত এক হাজার বছরের উলুমে কুরআনের সারনির্যাস একত্র করে দিয়েছেন।

যেমন-

- ১। উলুমু তাবিলি কাসাসিল আশ্বিয়া
- ২। উলুমে খামছায়ে কুরআনিয়া
- ৩। উলুমে তরজমায় কুরআনে কারিম
- ৪। উলুমু খাওয়াছছিল কুরআন
- ৫। উলুমে হরুফে মুকাত্তাত

মুফতি আবদুল খালেদ আজাদ উল্লেখ করেন : এই পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান কুরআন মাজীদের প্রায় সবগুলো দিককে শামিল করেছে। সমাজ গঠনের মৌলিক যাবতীয় উপাদানকে তিনি এই পঞ্চসূত্রে গেঁথে দিয়েছেন।

আল ফওজুল কবীর প্রকৃতপক্ষে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভির কুরআন গবেষণা বিষয়ে মৌলিক ও বুনিয়াদি গ্রন্থ। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে তিনি কুরআন অধ্যয়নের সূত্রাবলির সারনির্যাস উপস্থাপন করেছেন। কুরআন মাজীদ যেহেতু শাহ ওয়ালি উল্লাহর চিন্তা ও গবেষণার মূল কেন্দ্র সেহেতু, কুরআন অধ্যয়নে আগ্রহীদের বড় বড় একাধিক তাফসীর গ্রন্থ অধ্যয়নের পরও যা অর্জন করতে সক্ষম হবে না; এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে তিনি তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সূত্র সন্নিবেশ করেছেন। যদিও ইতোপূর্বে উলুমে কুরআন বিষয়ে যারকাশি ও সুয়ুতীর গবেষণাকর্ম বিদ্যমান ছিলো কিন্তু উপমহাদেশে ইতোপূর্বে অন্য কেউ এ বিষয়ে এমন সমৃদ্ধ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন নি। শাহ ওয়ালি উল্লাহ এ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা ও কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, “যখন আমার জন্য কুরআন অনুধাবনের দ্বার উন্মুক্ত হলো, আমি মনস্থ করলাম, কুরআন পিপাসু বন্ধুদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তক রচনা করবো; যাতে কুরআন বোঝার প্রয়োজনীয় সূত্র একত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে। আল্লাহর রহমতে কুরআন পাঠকদের জন্য এই সূত্রগুলো আত্মস্থ করার পর কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে সুপ্রশস্ত পথ উন্মুক্ত হবে।

আল ফওজুল কবীর এর একাধিক পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। নিম্নে কিছু পাণ্ডুলিপির বর্ণনা প্রদত্ত হলো :

- রামপুরের রেজা লাইব্রেরির ৬৬ নম্বর কক্ষে একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে এর অনুলিপিকার হুজুরুল্লাহ কাশ্মিরী এবং অনুলিখন সাল ১৭৬৬ খ্রি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে শাহ ওয়ালিউল্লাহর মৃত্যুর দুই বছর পর এটি প্রস্তুত হয়। এ বিবেচনায় এটি ফওজুল কবীরের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি।
- দারুল উলুম দেওবন্দের লাইব্রেরিতে একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। যেখানে অনুলিপিকারের নাম লেখা নেই। তবে মাওলানা নুর হোসাইন রাশেদ কান্দলভির মতে এটি শাহ মুহাম্মদ আশেক ও আবদুর রহমান পাহলভি এ দুজনের হস্তলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার পর দৃঢ় ধারণা হয়েছে এটি তাদের যে কোনো একজনের কৃত অনুলিপি। আরও যেসব লাইব্রেরিতে ফওজুল কবীরের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় :

- খোদাবখশ লাইব্রেরিতে দুটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে।
- জামিয়া ওসমানিয়া হায়দারাবাদ।
- মাওলানা আজাদ এরাবিক প্রেশন রিসার্চ ইনস্টিটিউট (টুংক) লাইব্রেরি।
- জামিয়া মিল্লিয়া, দিল্লিতে একটি পাণ্ডুলিপি আছে।
- হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি। এতে অনুলিখনের সন ১৮৬৬ খ্রি. লিপিবদ্ধ আছে।
- হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি।
- ইসলামিয়া ইউনিভার্সিটি কলেজ, পেশোয়ার।

৪. ফাতহুল খবীর :

এটি কুরআন মাজীদে গ্রیب শব্দগুলোর ব্যাখ্যা ও শানে নুযুল সম্বন্ধে শাহ ওয়ালিউল্লাহর আরবি ভাষায় লিখিত একটি অনবদ্য রচনা। এটিকে আল ফওজুল কবীরের পরিশিষ্টও বলা যায়। যদিও লেখক আল ফওজুল কবীর-এর ভূমিকায় এটাকে এ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় বলে উল্লেখ করেছেন (কাসেমি ৪০)। তবে এরপরও বইটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। লেখক এ পুস্তিকায় কুরআন মাজীদে ১১২ টি সুরার প্রায় দুই হাজার গ্রیب শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সন্নিবেশ করেছেন। তবে কেবল সুরা কদর ও সুরায়ে কাফিরুনের আলোচনা এই পুস্তিকায় নেই। সুরায়ে কাফিরুনে লেখকের দৃষ্টিতে গরিব (ব্যাখ্যাসাপেক্ষ) কোনো শব্দ নেই। সুরা কদরে অবশ্য ব্যাখ্যাসাপেক্ষ শব্দাবলি আছে। পুরো সুরাকে তিনি বাদ দিলেন কেন তা বোধগম্য নয়। তিনি এতে অনেক সুরা ও আয়াতের শানেনুযুল বর্ণনা করেছেন। তা সত্ত্বেও একটি ব্যাপার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ বিশেষ অর্থ ও নির্দিষ্ট কারণের পরিবর্তে সাধারণ অর্থ গ্রহণের রীতি অবলম্বন করেন। তাঁর মতে, আয়াত নাযিলের একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট থাকতেই পারে তবে বিধানের ক্ষেত্রে তা বিবেচ্য হবে না বরং সেটা স্থায়ী ও ব্যাপক হবে। এছাড়াও শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতে ‘গরিব’ শব্দের অর্থ বিরল বা ভাষাভাষীদের মাঝে কম প্রচলিত শব্দ উদ্দেশ্য নয়; বরং তিনি এ পরিভাষা দ্বারা সমার্থবোধক, দ্ব্যর্থবোধক, কঠিন ও ইঙ্গিতবাচক শব্দ বুঝিয়ে থাকেন। এ-কারণে ফাওজুল কবীর- এ এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায় যা আরবদের কাছে বিরল ও অপরিচিত নয়।

ফাতহুল খবীর- এর মুদ্রিত কপি ও পাণ্ডুলিপি সহজলভ্য হলেও এর হাতে লেখা কয়েকটি বিশেষ পাণ্ডুলিপি আলাদাভাবে সংরক্ষিত আছে :

- মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এরাবিক প্রেশন রিসার্চ ইনস্টিটিউট (টুংক), লাইব্রেরি কক্ষ নং-১৯৯৯।
- জামিয়া উসমানি হায়দারাবাদ, অনুলিখন সাল- ১৮৩৮ খ্রি./১৪৫৪ হি.।
- ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, কক্ষ নং-৭৯৭৮।

৫. তাবীলুল আহাদীস :

এটি কুরআন মাজীদে বর্ণিত নবি-রাসুলদের ঘটনাবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহর আরবি ভাষায় লিখিত একটি অনবদ্য গ্রন্থ। আশিয়ায়ে কেরামের ঘটনাপ্রবাহ ও মুজিয়া-বৃত্তান্ত থেকে তিনি চমৎকার ও অসাধারণ

রহস্য উন্মোচন করেছেন। তিনি ফাওজুল কবীর গ্রন্থেও এই কিতাবটির কথা উল্লেখ করেন এবং এতে আলোচিত কোনো কোনো গুঢ়রহস্যকে অধিকতর বিশ্লেষণ করেন। নবি ও তাঁর গোষ্ঠীর লোকদের সামনে যে অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয় তার একটি উৎপত্তি স্থল থাকে (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ৪৬)। শাহ ওয়ালিউল্লাহ এই গ্রন্থের ভূমিকাতে নবি-রাসুলদের হাতে প্রকাশিত অলৌকিক ও বিস্ময়কর ঘটনার হেকমত, প্রকার, নীতি ও বোধগম্যতার বিষয়ে ধারণা দিয়েছেন। তিনি আদম (আ.), ইবলিস, নমরুদের আগুনের ঘটনা এবং মুসার (আ.) লাঠিকে স্বপ্ন দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

‘اعلموا أن الأحوال الطارئة على نفوس الكمل والواقعات المنتظمة في المثل تكملة لهم حكما حكما المنام وكذلك الحوادث الواقعة كلها منامات.’

“জেনে রেখ, বিশেষ কিছু অবস্থা যখন নুফুসে কামেলার (নবিগণ) কাছে উদ্ভাসিত হয় এবং তা রূপায়নের জন্য নমুনাজগতে অর্থাৎ পৃথিবীতে যা সংগঠিত হয় তা স্বপ্নের লুকুমের শামিল। অনুরূপভাবে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ সবগুলো সম্পূর্ণ স্বপ্ন।” শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেছেন, এর মাধ্যমে কার্যকারণ ও অবলম্বনের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হয় না। এই পর্দা একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে ঠিকই কার্যকর থাকে। আশ্বিয়ায়ে কেরামের মুজিয়া সম্পর্কে তিনি যে দার্শনিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেন তা পূর্বের তাফসিরকারকদের মতামত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ব্যতিক্রম (বশির আহমদ ৩১)। তাবীলুল আহাদীস গ্রন্থের কমপক্ষে দশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এর বাইরে সংস্করণ থাকার সম্ভাবনা আছে। এটি মূলত, আরবিতে লিখিত হলেও উর্দু এবং ইংরেজিতে গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। উর্দুতে এর সর্বপ্রথম সংস্করণটি দিল্লির মাতবায় আহমদি থেকে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়। এতে আরবি ও উর্দু দুইভাষার টেক্সট সংযোজন করা হয়। বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিলো আটশি (কাসেমি ৯৬)।

উপসংহার :

উপরিউক্ত আলোচনায় শাহ ওয়ালিউল্লাহর কুরআন গবেষণাকেন্দ্রিক যেসব রচনাকর্মের ধারণা উপস্থাপিত হয়েছে এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, এ গ্রন্থগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মৌলিক রচনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এছাড়াও তাঁর প্রতিটি গ্রন্থেই কুরআন বুঝার বিষয়টির কমবেশি আভাস আছে। যে কোনো বিষয়ের সমাধানে তিনি কুরআন থেকে দলিল ও প্রমাণ পেশ করে থাকেন। তাঁর উপস্থাপনার চমৎকারিত্বে যে কারও স্বাভাবিকভাবে মনে হবে যেন আয়াতটি এইমাত্র নাজিল হয়েছে ! এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ। গ্রন্থটিতে তিনি ইসলামি শরীয়তের বিধানাবলির গুঢ়রহস্য উন্মোচন করেছেন। পাঠক একইভাবে তাঁর ইয়ালাতুল খফা গ্রন্থে খেলাফতের বিষয়ে কুরআনে হাকিমের আলোকচ্ছটা লক্ষ্য করবেন। ফিকহি বিষয়ে কুরআন থেকে দলিল পেশ করার উদাহরণ তাঁর আল মুসাফফা ওয়াল মুসাওয়া গ্রন্থটিও। মোদ্বাকথা, শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর রচনাবলিতে কুরআন মাজীদকে নিজের চিন্তা-গবেষণার মানদণ্ড স্থির করেছেন। এই দৃষ্টিকোণে শাহ ওয়ালিউল্লাহর রচনাবলিকে কুরআন বোঝার বিষয়-শাস্ত্রে তথ্যভিত্তিক সেকেন্ডারি ও তৃতীয় উৎস সাব্যস্ত করা যায়। যেমন সুরায়ে ফাতিহার আয়াত اٰهْدِنَا الصِّرَاطَ (সুরা ফাতিহা : ৬) এর সঙ্গে সুরা নিসার اَلصِّرَاطِ اَلْقَيِّمِ (সুরা নিসা : ৬৯) কে মর্মগত দিক থেকে সংযুক্ত করে পেশ করেছেন। এরপর প্রাসঙ্গিক হাদিস এনেছেন, যেখানে আল্লাহর রাসুল (সা.) হজরত আবু বকরকে (রা.) ‘সিদ্দিক’ ও হজরত ওমরকে (রা.) ‘শহীদ’ উপাধি প্রদান করেছেন। শেষে তিনি অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ‘সিরাতুল মুস্তাকিম’ তথা সত্য-সরল পথ হলো এই দুইজনের প্রদর্শিত পথ এবং তাঁরা প্রধান খলিফায়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (শাহ ওয়ালিউল্লাহ ৪৬)।

তথ্যসূত্র

আল-কুরআন

আজিজ, শাহ আবদুল, *মলফুজাতে শাহ আবদুল আজিজ*, মিরাত : মাতবায়ে মুজতাবায়ি, ১৩১১ হি.।

আজাদ, আবদুল খালেক, *কুরআনি তরজমা নেগারী কী আহাম্মিয়াত আওর উসুল ওয়া কাওয়ানীন*, লাহোর : রহিমিয়া মতবুআত, ২০১৬।

কাসেমি, মুহাম্মদ সউদ আলম, *শাহ ওয়ালিউল্লাহ কী কুরআনী ফিকর কা মুতালায়া*, লাহোর : আল মাহমুদ একাডেমি, ১৯৯৮।

দেহলভি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, *আনফাসুল আরেফীন*, লাহোর : মাতবায়ে আহমদি, ১৮৯৭

দেহলভি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, *মুকাদ্দামায়ে ফাতহুর রহমান*, দিল্লি : মাতবায়ে আনসারি, ১৩০৩ হি.।

দেহলভি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, *ফাতহুর রহমান*, রিয়াদ : মালিক ফাহাদ প্রিন্টার্স, তা.বি.।

দেহলভি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, *আল ফওজুল কবীর ফী উসূলিত তাফসীর*, দিল্লি : মাতবায়ে মুজতাবায়ি, ১৯৯২।

দেহলভি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, *তাবীলুল আহাদিস*, হায়দারাবাদ : শাহ ওয়ালিউল্লাহ একাডেমি, তা.বি.।

জালবানি, গোলাম হোসাইন, *শাহ ওয়ালিউল্লাহ কী তালীম*, লাহোর : দারুল কিতাব, ২০০২।

লাহোরী, আবদুল রশিদ, “কুতুবখানায়ে টুংককে বাআজ মলহুজাত”, *মাসিক মা'আরিফ*, দিল্লি : আজমগড়, তা.বি.।

লুখিয়ানভি, বশির আহমদ, *শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকা ফালসাফায়ে উমরানিয়াত মাআশিয়াত*, লাহোর : বায়তুল হিকমত, ১৯৪৫।

লুখিয়ানভি, বশির আহমদ, *শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকা ফালসাফায়ে উমরানিয়াত মাআশিয়াত*, লাহোর : বায়তুল হিকমত, ১৯৪৫।

সিদ্ধি, ওবাইদুল্লাহ, *শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকী ফালসাফা*, লাহোর : সিদ্ধু সাগর একাডেমি, ২০০২।

সিওহারভি, হিফজুর রহমান, “শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর মুকাদ্দামা তারজমাতুল কুরআন”, *মাসিক বোরহান*, দিল্লি : অক্টোবর, ১৯৪৫।

Rizwi, S.A Shah Wali Ullah and his time, Lahore: Sahail Academy, 2004.

আব্দুর রহমান জামি ও তাঁর হাফ্ত আওরাজ্জ

ড. আব্দুল করিম *

প্রতিপাদ্যসার: ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে ইরানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি যুগ হলো তৈমুরী যুগ। এই যুগের শাসকগণ শিক্ষা ও সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ সময় ইরানে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। যে সমস্ত কবি, সাহিত্যিক, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি এ যুগের শাসকদের দরবারে অলঙ্কৃত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নূরুদ্দিন আব্দুর রহমান জামি অন্যতম। তিনি একাধারে একজন বিশিষ্ট আলেম, সুফি সাধক, কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁকে ইরানের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি বলা হয়। তাঁর সমগ্র জীবন নিরলস সাহিত্য সাধনায় ব্যয় করেছেন। গদ্য ও পদ্য মিলে তাঁর প্রায় পঞ্চাশটি গ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে সাতটি মাসনাভি কাব্যগ্রন্থকে একত্রে হাফ্ত আওরাজ্জ বলা হয়ে থাকে। এগুলো হলো- *সিলসিলাতুয় যাহাব*, *সালামান ওয়া আবসাল*, *তোহফাতুল আহরার*, *সোবহাতুল আবরার*, *ইউসুফ ওয়া জুলেখা*, *লাইলি ওয়া মাযনুন* এবং *খেরাদ নামেয়ে এসকান্দার*। আব্দুর রহমান জামি প্রথমে কবি নিজামি গাজুবি ও আমির খসরু দেহলভি এর অনুসরণে পাঁচটি মাসনাভি কাব্য রচনা করেন। এরপর তিনি আরও দু'টি মাসনাভি কাব্য নিজস্ব পদ্ধতিতে রচনা করে এর সাথে যুক্ত করে এর নামকরণ করেন হাফ্ত আওরাজ্জ। তাঁর এসব কাব্যে একসাথে শেখ সাদির নীতিবোধ, রুমির উচ্চাভিলাষ, হাফিজের সারল্য এবং নিজামির আবেগ অনুসৃত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আব্দুর রহমান জামির জীবন ও তাঁর রচিত হাফ্ত আওরাজ্জ কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আব্দুর রহমান জামির সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

ফারসি সাহিত্যের বিশ্ব বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবি আব্দুর রহমান জামি ২৩ শাবান ৮১৭ হিজরি মোতাবেক ৭ নভেম্বর ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন ইরানের খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত জাম নামক নগরীতে খারজারদ এলাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জাম এলাকার নামানুসারে তাঁকে জামী বলা হয় এবং এ নামেই তিনি সমধিক খ্যাতি লাভ করেন (Rypka 286)। তাঁর পুরোনাম নূর উদ্দিন আবুল বারাকাত আবদুর রহমান বিন নিজাম উদ্দিন আহমদ মুহাম্মদ জামি। নূর উদ্দিন তাঁর উপাধি। তাঁর তাখালুস তথা কাব্যিক নাম জামি। তিনি বলেন, দু'টি কারণে এই তাখালুস নির্বাচন করেছি। প্রথমত আমি জাম নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেছি। দ্বিতীয় হলো জেন্দে পীর হিসেবে প্রসিদ্ধ শায়খুল ইসলাম আহমদ জামকে সম্মান প্রদর্শন করে (সাফা ৩৪৭-৩৪৮)। নিচে এ সম্পর্কে তাঁর দু'টি বেইত উদ্ধৃত করা হলো-

مولدم جام و رشحه قلم
لاجرم در جريدۀ اشعار
جرعه جام شيخ الاسلامي است
بدو معنى تخلصم جامي است
(বাহার ২১৯)

(আমার কলমের সম্পর্ক হলো জন্মস্থান জাম
শায়খুল ইসলাম জাম পাত্রের এক ঢোক পানি।
সুতরাং কবিতার কাব্যে
তাখালুস গ্রহণ করেছি এই দুই অর্থ থেকেই।)

* সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আব্দুর রহমান জামির আসল উপাধি হলো ইমামুদ্দিন, তবে তিনি নুর উদ্দিন উপাধিতে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বলে লোকে তাঁকে মোল্লা জামি নামে সম্বোধন করতেন। ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি মোল্লা জামি এবং মাওলানা জামি উভয় নামে পরিচিত। তাঁর পিতার নাম নিজামুদ্দিন আহমদ বিন শামসুদ্দিন মোহাম্মদ দাশতি ইম্পাহানি এবং পিতামহের নাম শামসুদ্দিন দাশতি (সুফি ১৬৫)।

আব্দুর রহমান জামির পূর্বপুরুষগণ ইম্পাহানের দাশত নামক স্থানে বসবাস করতেন বলে প্রথমে তাঁকে দাশতিও বলা হতো। এ বংশের লোকেরা কোনো এক সময় খোরাসানের জাম নগরীতে হিজরত করেন। ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, তাঁর জন্মের পূর্বে পিতা নিজামুদ্দিন দাশতি পরিবার নিয়ে খোরাসানের জাম নগরীতে প্রথমে বসতি স্থাপন করেন এবং জন্মের পরে হেরাতে চলে যান। একদিক থেকে তাঁর বংশ পরম্পরা প্রসিদ্ধ সুফি আহমদ জামি জেন্দে পীর পর্যন্ত পৌঁছেছে। অপরদিক দিয়ে তিনি হিজরির দ্বিতীয় শতকের ফকিহ হযরত মোহাম্মদ বিন হাসান শাইবানী বংশের ব্যক্তি ছিলেন (শাকিবা ১৭৪)।

আব্দুর রহমান জামি ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৮৯৮ হিজরি সালে মহরম মাসের ১৭ তারিখ শুক্রবার হেরাতে ইন্তেকাল করেন। এ সময় আব্দুর রহমান জামির বয়স হয়েছিলো ৮১ বছর। তাঁর মৃত্যুর পর হেরাতের গভর্নর তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। তাঁর জানাযায় বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম হয়। হেরাত শহরেই সাদ উদ্দিন কাশগিরির মাযারের পাশে তাঁকে দাফন করা হয় (সাফা ৩৫৬)। এ সম্পর্কে তানভির আহমেদ বলেন-

Jami died in 898/1492 A.D at the age of 81 and was mourned not only by his friends but by the whole city of Harat. The Sultan of Harat as a token of love and respect to the poet paid his funeral expenses. A magnificent train of the most illustrious nobles accompanied his body to the tomb (Ahmad 218).

আব্দুর রহমান জামির শৈশবের দিনগুলো ছিলো সোনালি অধ্যায়। শৈশব থেকেই তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অত্যন্ত প্রখর মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনো পিতার সান্নিধ্যে আবার কখনো পিতার সমসাময়িক আলেমদের তত্ত্ববধানে এসে জ্ঞান লাভে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি কখনো অভাব বা দুঃখ-কষ্টের যন্ত্রণা উপভোগ করেননি। আব্দুর রহমান জামি বাল্যকাল থেকেই কবিতা রচনা করতেন। তাঁর প্রাথমিক আরবি, ফারসি ও ধর্মীয় শিক্ষা পিতার কাছে অর্জন করেন (কেশাভারজি ১১)। তাঁর পিতা নিজামুদ্দিন আহমেদ ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আলিম ও সুফি ব্যক্তি। সে সময় হেরাত, নিশাপুর, সমরকান্দ প্রভৃতি স্থানসমূহ বিদ্যা অর্জনের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিলো। শৈশবে তিনি পিতার সাথে হেরাতে গমন করেন। হেরাতে তখন ধর্ম ও ফারসি সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো (ইয়াহকি ৩০৩)। তিনি এ সময় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রধান প্রাণকেন্দ্র হেরাতের নিজামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। তখন সুলতান হুসেন বায়কারা এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী আলি শেরনওয়াযি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন (বাদাখশানি ৫৭৪)।

হেরাতের নিজামিয়া মাদরাসায় আব্দুর রহমান জামির শিক্ষক ছিলেন মাওলানা জুনাইদ উসুলি, খাজা আলি সমরকান্দি, মাওলানা শিহাব উদ্দিন জাজরামি, সৈয়দ শরিফ জুরজানি প্রমুখ। তিনি তাঁদের কাছে সাহিত্য, ইতিহাস এবং ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা লাভ করেন (শাকিবা ১৭৫)। হেরাতে শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি সমরকান্দে চলে যান। সেখানে কাজী যাদেহ রুমি, ফতহুল্লাহ তাবরিজি, মোল্লা আলি কাসায়ি প্রমুখ শিক্ষকদের কাছে তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন (কেশাভারজি ১১)। এছাড়া তিনি যুক্তি বিজ্ঞান, অধিবিদ্যা, আরবি ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন (ফাজেলি ১২৪)।

আব্দুর রহমান জামির ধর্মীয় মাযহাব নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কাজী নুরুল্লাহ এর মতে, তিনি শিয়া মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। মোল্লা মোহাম্মদ তাকি এবং তাঁর পুত্রের মতে, তিনি সুন্নীয়ে হানাফি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁর রচনাকর্মে সুন্নী মুসলমানদের বিষয়গুলো বেশি স্থান পেয়েছে। তবে তিনি প্রেম-ভালোবাসায় পরিপূর্ণ একজন সুফিতাত্ত্বিক কবি ছিলেন। তাঁর পিতা একজন আলেম, সুফি সাধকদের ভক্ত ও আল্লাহ তায়ালা প্রেমিক ছিলেন। আব্দুর রহমান জামির পিতা যখন সুফি সাধকদের দরবারে যেতেন এবং মাযার জিয়ারত করতেন তিনিও তখন পিতার সাথে যেতেন। ফলে সুফি সাধকদের সাক্ষাত লাভ এবং মাযার জিয়ারত করার ফলে তাঁর হৃদয়ে সুফি সাধকদের প্রতি আত্মহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয় (বাহার ২১৯)।

উল্লেখ্য যে, আব্দুর রহমান জামির পাঁচ বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে প্রথমে খাজা মুহাম্মদ পারসার দরবারে যান। পিতা মাওলানা আব্দুর রহমান জামিকে দরবেশের হাতে তুলে দিলে দরবেশ দুই হাত ধরে উপরে উঠিয়ে দৃষ্টি রাখেন এবং দোয়া করেন (সাফা ৩৫২)। এ ঘটনার পর আব্দুর রহমান জামির জীবনে পরিবর্তন এবং সুফিদের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। তখন থেকে একের পর এক তাঁর সুফিদের সান্নিধ্য ঘটে। বিশেষকরে তিনি সাদ উদ্দিন কাশগরি, খাজা শিহাব উদ্দিন, খাজা নাসির উদ্দিন উবায়দুল্লাহ আহরার প্রমুখ সুফি সাধকদের সান্নিধ্য লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি বিশিষ্ট ওলামাদের মধ্যে মাওলানা ফখরুদ্দিন লোরেস্তানি, খাজা বোরহানুদ্দিন, খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ কোশাই, মাওলানা জালালুদ্দিন পোরনি এবং মাওলানা আসাদ প্রমুখ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করেন (দেহখোদা ১০৮)। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের শ্রদ্ধা করে চলতেন।

আব্দুর রহমান জামি খোরাसानে অবস্থানকালে বিশিষ্ট সুফি সাধক সাদ উদ্দিন কাশগরির সাহচর্যে আসেন। তিনি ছিলেন বাহাউদ্দিন নকশবন্দিয়া তরিকার খলিফা। তাঁর মাধ্যমে আব্দুর রহমান জামি নকশবন্দিয়া তরিকা ধারণ করেন (বাদাখশানি ৫৭৪)। সাদ উদ্দিন কাশগরির মৃত্যুর পর তিনি খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি এই তরিকার প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রাখেন। সবাই তাঁকে সম্মান করতেন (শাফাক ৩২১)। নকশবন্দিয়ার অন্যান্য সুফি সাধকদের তিনি সম্মান করে চলতেন। তিনি তুহফা/তুল আহরার কাব্যগ্রন্থে আল্লাহ তায়ালা এবং রাসুল (সা.) এর প্রশংসার পর বাহাউদ্দিন নকশবন্দিয়ায় বুখারী এবং নকশবন্দিয়া তরিকার প্রশংসা করেছেন (সাফা ৩৫২)।

আব্দুর রহমান জামি বহুবার বিভিন্ন দেশ ও শহর ভ্রমণ করেন। তাঁর বিভিন্ন দেশ সফরের উদ্দেশ্য ছিলো জ্ঞান অন্বেষণ, সুফি-দরবেশদের সান্নিধ্য লাভ এবং মাযার জিয়ারত। শৈশবকালে জাম থেকে হেরাতে এবং যৌবনকালে হেরাত থেকে সমরকান্দ পুনরায় সমরকান্দ থেকে হেরাতে প্রত্যাবর্তন করেন (দেহখোদা ১০৮)। তিনি ৮৭০ হিজরিতে হেরাত থেকে মারভ, সমরকান্দ, তাসখন্দ, খোরাसान, রেই, হামেদান, কুর্দিস্তান, বাগদাদ, দামেস্ক, হালব, তাবরিজ ইত্যাদি সফর করেন। ৮৭৭ হিজরিতে হজ্জ পালন এবং মদিনাতে অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬০ বছর (ইয়াহকি ৩০৩)।

আব্দুর রহমান জামির অধিকাংশ সময় কেটেছে জ্ঞান সাধনায়। তাঁর শিক্ষা জীবন কখন শেষ হয় এ বিষয় কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর জীবন-সংসারের শেষ দিনগুলোতে ওয়াজ-নসিহত প্রদান করে ব্যস্ত থাকতেন। শিষ্যদের শিক্ষা প্রদান ছিলো তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য কর্ম। হেরাতেই তিনি মসজিদে ওয়াজ-নসিহত তথা জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করতেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় রচনা কর্মে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। তিনি বাল্যকাল থেকেই কবিতা চর্চা করতেন। যৌবনকালে তিনি কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কবিতা রচনার মাধ্যমে তিনি যুগের একজন ফারসি ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে ‘খাতেমুশ শূয়ারা’ উপাধিতে ভূষিত হন (সাফা ৩৪৮)।

আব্দুর রহমান জামি শুধু কবিতা রচনায় মেধাশক্তির বিকাশ সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি সুফিতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক অসংখ্য সাহিত্য, ইতিহাস ও আলোচনা লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর রচনাবলির সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে। কথিত আছে যে, আব্দুর রহমান জামি তাঁর কাব্যনাম জামী (জ আ ম ঈ) এর অক্ষরসমূহের সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী ৫৪টি গ্রন্থ লিখেছেন (পাল ১৩৪)। আবদুস্ সাত্তার এর মতে, ৫০টি (সাত্তার ৮০)। আফসাহ যাদ এর মতে, ৪৬টি। তন্মধ্যে ৪০টি বর্তমানে বিদ্যমান (জামি ২৭)। তবে কারনামে বুজুর্গানে ইরান গ্রন্থে এবং সাম মীর্থা সাফাভি এর মতে, ৪৫টি গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেন। আবার আব্দুর রহমান জামির বিশিষ্ট ছাত্র মাওলানা আব্দুল গফুর লারির মতে, ৪৮টি (বাদাখশানি ৫৭৪)।

আব্দুর রহমান জামির হাফত আওরাঙ্গ :

আব্দুর রহমান জামির হাফত আওরাঙ্গ এর সাতটি মাসনাভি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে প্রথমটি হলো- *সিলসিলাতুয যাহাব (سلسلة الذهب)*। এই কাব্যগ্রন্থটি তিন খণ্ডে প্রায় ৭,২০০ বেইত রয়েছে। তিনি এ কাব্যগ্রন্থটি সুলতান হুসেন বায়কারার নামে উৎসর্গ করেন (শাফাক ৩২৩)। এটি উক্ত সুলতানের সিংহাসনে আরোহণ এবং আব্দুর রহমান জামির হেজাজ সফরের মধ্যবর্তী সময়কালে রচিত হয়। এ দীর্ঘ মাসনাভি গ্রন্থটি বাহরে খাফিফ ছন্দে লিখিত (সাফা ৩৫৯)।

এই কাব্যগ্রন্থটিতে কুরআন, হাদিস এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ইমামদের বাণীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাশাপাশি কালাম শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় বিশেষকরে জাবরিয়া ও কাদরিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও বাস্তবতা, আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি, ফেরেস্তুদের অস্তিত্ব, নবিদের উপর বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় স্থান পেয়েছে (শাফাক ৩২৩)। এ কাব্যগ্রন্থের প্রথম খণ্ডকে *এতেকাদ নামা* বলা হয়। এতে ইসলাম ধর্মের মূল বিষয়াবলি যেমন- আল্লাহ তায়ালার ও তাঁর একত্বের প্রতি বিশ্বাস, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর প্রতি বিশ্বাস, সকল নবির উপরে হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব, ইসলাম ধর্ম, নবীদের আইন, ফেরেস্তু, বেহেস্তু, দোযখ, মানুষের কেবলা, মিয়ান ও পোলছেরাত ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সব আলোচনা উদাহরণ ও ঘটনাবলির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে (বাদাখশানি ৫৮৭)।

আব্দুর রহমান জামির *সিলসিলাতুয যাহাব* কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা ও প্রেমের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন অলির কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক হিসেবে কুরআনের আয়াত, হাদিসে রাসুল (সা.) ও আধ্যাত্মিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী ব্যবহার করা হয়েছে। এতে যে সমস্ত অলির নাম এসেছে তাঁরা হলেন-বায়াজিদ বোস্তামি, জুননুন মিসরি, শাহ শুজা কেরমানি, শামস তাবরিজি, শায়েখ আওহাদুদ্দিন কেরমানি, শায়েখ মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি, শায়েখ আলি কারখি, বিশর হাফি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু আলি রুদবারি ও শায়েখ আবু আলি দাক্কাক (হেকমত ১৬৩)। এ খণ্ডের প্রথম কয়েকটি বেইত উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরা হলো-

هست صلاى سر خوان كـريم
از صـرير قـلم ترانـه عشق
قصه عشق مى كنـد تـقـرير
(জামি ১৮৫)

بسم الله الرحمن الرحيم
بشنو اى گوش بر فسانه عشق
قلم اينك چونى بلحن صرير

(পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি
বক্তব্যের শুরুতে তাঁরই প্রজ্ঞা আহ্বান করছি।
হে কান! প্রেমের কাহিনী শুন
প্রেম সঙ্গীত কলমের সুর থেকে।
এখন কলমের আওয়াজ বাঁশির মতো সুর করে
প্রেম কাহিনী বর্ণনা করছে।)

আব্দুর রহমান জামির *সিলসিলাতুয় যাহাব* কাব্যের তৃতীয় খণ্ডটি পাঁচ হাজার বেইত সমৃদ্ধ। এটি ওসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ এর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। এতে সম্রাট ও রাজাদের বিভিন্ন কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও চিকিৎসক ও কবিদের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলি বর্ণনা করেছেন (বাদাখশানি ৫৮৭)। এ ছাড়া এর শেষাংশে চিকিৎসকদের সম্পর্কে বিভিন্ন গল্পের অবতরণা করেছেন। চিকিৎসকদের কাহিনী মধ্যে নিজামি আরুজি রচিত *চাহার মাকাল* এর চতুর্থ অধ্যায় থেকে গৃহীত হয়েছে। এর একটিতে ইবনে সিনা নিজে কিভাবে যুবরাজের প্রেমপীড়া আরোগ্য করেছেন এবং অপরটিতে মানসিক পদ্ধতি অবলম্বন করে কিভাবে সামানিয় রাজদরবারের জনৈক দাসীর চিকিৎসা দিয়ে নিরাময় করেছেন তার কৌতুহলপ্রদ কাহিনী উল্লেখ করেছেন (মনসুরউদ্দীন ১৯৯)।

আব্দুর রহমান জামির হাফ্ত আওরাজ এর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ হলো- *সালামান ওয়া আবসাল (سالمان و ابسال)*। তাঁর এ কাব্যগ্রন্থটি বাহরে রমালে মোসাদ্দাসে মাহজুফ ইয়া মাকসুর হুন্দে মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির বিখ্যাত *মাসনাভিয়ে মানাভি* ও শেখ ফরিদ উদ্দিন আন্তার নিশাপুরির *মানতেকুত তায়ের* এর ছন্দের অনুকরণে রচনা করা হয়েছে (সাফা ৩৫৯)। বিখ্যাত এ কাব্যগ্রন্থটি ৮৮০ হিজরি মোতাবেক ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। আব্দুর রহমান জামি *সালামান ও আবসাল* মাসনাভি গ্রন্থটি তুর্কমানের শেষ শাসক সুলতান ইয়াকুব বেগ এর নামে উৎসর্গ করেন (শাফাক ৩২৪)।

এই কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু হলো- গ্রীক রাজ্যে এক সুন্দর শাহজাদার জন্ম হয়। তাঁর নাম ছিলো সালামান। আর আবসাল হলো তাঁর পরমা সুন্দরী যুবতী ধাত্রী। আবসাল সালামানের চেয়ে বিশ বছরের বড় ছিলো। সালামান যখন যৌবনে পদাপর্ণ করে তখন আবসাল তার রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়ে যায়। আবসাল যাদুটোনার মাধ্যমে সালামানকে প্রেমিক বানাতে চেষ্টা করে। একদিন সালামান আবসালের প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে পিতার আপত্তি সত্ত্বেও রাজধানী থেকে পলায়ন করে একটি আশ্চর্য দ্বীপে উপনীত হয়। তারা সেখানে মধুর প্রেমের এবং সুখের দিন অতিবাহিত করতে থাকে। কিন্তু স্বর্গীয় সৌন্দর্যের প্রতীক জোহরার প্রভাব সালামানের মন থেকে আবসালের স্মৃতি অপসারিত করে দেয়। এই সৌন্দর্যে প্রভাবিত হয়ে সালামান ও আবসাল এক অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয়। আবসাল অগ্নিতে পুড়ে মারা যান। কিন্তু সালামানের কোনো ক্ষতি হলো না, পরন্তু সে পার্থিব কামনা বিমুক্ত হয়ে অধিকতর উজ্জ্বল মূর্তি পরিগ্রহ করে জ্বলন্ত চিতা থেকে বের হলো। এভাবেই জোহরা আবসালের বন্ধন থেকে সালামানকে মুক্ত করতে সফল হয়। তাঁর পিতা তাঁকে উপযুক্ত দেখে রাজমুকুট ও সিংহাসন অর্পন করেন (Browne 523)। এভাবেই এ কাব্যগ্রন্থে প্রেমের ঘটনা তুলে ধরা হয়।

আব্দুর রহমান জামি এ কাব্যগ্রন্থের কাহিনীতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। বাহ্যিকভাবে এটি একটি প্রেম কাহিনী হলেও এর অন্তরালে বেশ কিছু শিক্ষামূলক বক্তব্য রয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থের কাহিনীতে সালামান হলো

মানুষের আত্মা আর আবসাল হলো নফসে আন্নারা বা দৈহিক ভোগ সুখের কামনা। আব্দুর রহমান জামির মতে, আবসালকে ভস্মীভূত না করলে আত্মা পরমার্থ লাভ করতে পারে না। নিচে মাওলানা আব্দুর রহমান জামির এ সম্পর্কিত একটি বেইতের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

کیست ابسال این تن شهوت پرست زیر احکام طبیعت گشته پست
(জামি ৩৬৩)

(আবসাল কী? এই কামুক দেহ
যা প্রাকৃতিক স্বভাবের কাছে নত হয়ে যায়।)

আব্দুর রহমান জামি রচিত *সালামান ওয়া আবসাল* কাব্যগ্রন্থে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যেমন গ্রীক বাদশাহ শাহজাদা সালামানকে যে অসিয়ত প্রদান করেন, তা তিনি এ কাব্যগ্রন্থে তুলে ধরেছেন। নিচে মাওলানা আব্দুর রহমান জামি রচিত *সালামান ওয়া আবসাল* কাব্যগ্রন্থ থেকে এ সম্পর্কে কয়েকটি বেইতের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

ای پسر ملک جهان جاوید نیست بالغان را غایت امید نیست
پیشوا کن عقل دین اندوز را مزرع فردا شناس امروز را
پیس از آن کاید به سر این کشت زار دولت جاوید را تخمی بکار
(জামি ৩৬১)

(হে পুত্র দুনিয়ার রাজত্ব স্থায়ী নয়
প্রাপ্ত বয়স্কদের সীমাহীন আশা থাকতে নাই।
সম্প্রতি ধর্মীয় জ্ঞান দিয়ে নেতৃত্ব দিবে
আগামীকালের কৃষিক্ষেতকে আজকেই চিনে নাও।
এই কৃষিক্ষেত্রে চাষাবাদের পূর্বে
আমরত্বের বীজ বপন করিও।)

আব্দুর রহমান জামি *সালামান ওয়া আবসাল* কাব্যগ্রন্থে মূল কাহিনীর পাশাপাশি বেশ কিছু উপদেশমূলক কাহিনীর অবতারণা করেছেন। কারণ উপদেশের মাধ্যমে জ্ঞানী মানুষ উপকৃত হয়। এর দ্বারা অন্তর প্রাণবন্ত হয়। উপদেশ হলো জীবন চলার পাথেয়। নিচে মাওলানা আব্দুর রহমান জামি রচিত *সালামান ওয়া আবসাল* কাব্যগ্রন্থ থেকে এ সম্পর্কে দুটি বেইতের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

وز نصیحت مدبران مقبل شوند از نصیحت ناقصان کامل شوند
وز نصیحت حل شود هر مشکلی از نصیحت زنده گردد هر دلی
(জামি ৩৪৪)

(উপদেশে অনভিজ্ঞ পূর্ণতা লাভ করে
উপদেশে হতভাগা ভাগ্যবান হয়।
প্রতিটি অন্তর উপদেশে প্রাণবন্ত হয়
সব সমস্যার সমাধান উপদেশেই সাধিত হয়।)

আব্দুর রহমান জামির হাফত আওরাজ এর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ হলো- *তুহফাতুল আহরার (تحفة الاحرار)*। তাঁর এ কাব্যগ্রন্থটি ৮৮৬ হিজরি মোতাবেক ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। তিনি এই গ্রন্থটি হাকিম নিজামি গাঞ্জবির *মাখযানুল আসরার* এবং আমির খসরুর *মাতলাউল আনওয়ার* নামক গ্রন্থদ্বয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন (শাফাক ৩২৪)। তাঁর এ কাব্যগ্রন্থে গদ্যাকারে একটি ভূমিকা লেখা হয়েছে। এতে খোতবার পর আল্লাহ তায়ালা দরবারে চারটি মোনাজাত, রাসূল (সা.) এর প্রশংসায় পাঁচটি নাট এবং নকশবন্দিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা খাজা বাহাউদ্দিন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর খাজা আহরারের প্রশংসামূলক আলোচনা দিয়ে ভূমিকা শেষ করা হয়েছে (জামি ৩১৭)।

আব্দুর রহমান জামির *তুহফাতুল আহরার* কাব্যগ্রন্থে উপদেশপূর্ণ ২০টি প্রবন্ধ রয়েছে (সাফা ১৩৮৯, ৩৫৯) এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-আদম সৃষ্টি, ইসলাম, নামাজ, জাকাত, হজ্জ, সুফির লক্ষণ, প্রেম ও পুত্রের প্রতি উপদেশ প্রভৃতি। এতে বেশ কয়েকটি কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এর ন্যায়পরায়ণতার কাহিনী। তাঁর ন্যায়পরায়ণতায় মেঘপাল, হরিণ ও সিংহ একত্রে শান্তিতে বসবাস করতো। নিচে এ সম্পর্কে মাওলানা আব্দুর রহমান জামির কয়েকটি বেইতের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

شیر بخو نخواری شیری نمائد أهو و شیرند بهم در خرام کز قدمش رسم عدالت نوست	بر رمه از گرگ دلیری نمائد بره و گرگند بهم گشته رام اینهمه از دولت این خسروست
--	--

(জামি ৪২৪)

(ভেড়ার পালে নেকড়ে আক্রমণ করতো না
সিংহ রক্তপিপাসু সিংহে পরিণত হয়নি।
হরিণ ও সিংহের পারস্পরিক আচরণ ছিলো মাধুর্যময়
মেঘ শাবক ও নেকড়ে একত্রে বসবাস করতো।
এগুলো এই স্রষ্টার অবদান
যার পদক্ষেপে ন্যায়পরায়ণতা পেয়েছিলো নবরূপ।)

আব্দুর রহমান জামির হাফত আওরাজ এর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ হলো- *সোবহাতুল আবরার (سبحة الابرار)*। সোবহাতুল আবরার অর্থ সত্বলোকদের প্রার্থনা। এ কাব্যগ্রন্থটি ৮৮৭ হিজরি মোতাবেক ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। তিনি এটি সুলতান হুসেন বায়কারার নামে উৎসর্গ করেন (শাফাক ৩২৪)। এ কাব্যগ্রন্থটি বাহরে রমাল মুসাদ্দাস ছন্দে রচিত হয়।

আব্দুর রহমান জামির *সোবহাতুল আবরার* কাব্যগ্রন্থে সুফিতত্ত্ব সম্পর্কিত ধর্ম ও নীতিমূলক ব্যাখ্যাধর্মী ৪০টি অধ্যায় রয়েছে। যেমন- তওবা, দুনিয়াবিমুখতা, ধৈর্য, শোকর, ভয়, আশা, তাওয়াক্কুল, প্রেম, আগ্রহ, লজ্জা, স্বাধীনতা, সত্যবাদিতা, এখলাস, অল্পে তুষ্টি, বিনয়, কৌতুক, পুত্রের প্রতি অসিয়ত ইত্যাদি। মাওলানা আব্দুর রহমান জামি প্রত্যেকটি অধ্যায়ে দু'একটি গল্পের মাধ্যমে সুফিতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (সাফা ৩৫৯-৩৬০)। নিচে মাওলানা আব্দুর রহমান জামির *সোবহাতুল আবরার* কাব্যগ্রন্থের এখলাস অধ্যায় থেকে কয়েকটি বেইত

উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরা হলো-

کیسےت اخلاص دل از خود کنند	کیسےت اخلاص دل از خود کنند
نقد دل از همه خالص کردن	نقد دل از همه خالص کردن
دل باسباب جهان ندادن	دل باسباب جهان ندادن

(জামি ৫৩৬)

(এখলাস কী? স্বার্থপরতা থেকে মনকে উঠিয়ে নেওয়া
নিজের কাজকে খোদার কাছে সমর্পণ করা।
মনরূপ মুদ্রাকে সকল বিষয় থেকে পবিত্র করা
দৃষ্টিরূপ স্বর্ণকে মুক্ত করা।
মনকে পার্থিব বিষয় থেকে দূরে রাখা
দৃষ্টিকে পার্থিব সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট না করা।)

আব্দুর রহমান জামির হাফত আওরাঙ্গ এর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ হলো- *ইউসুফ ওয়া জুলেখা* (یوسف و زلیخا)। এ কাব্যগ্রন্থটি ৮৮৮ হিজরি মোতাবেক ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। এটি বাহরে হাজাজে মোসাদ্দাসে মাকসুর ইয়া মাহজুফ ছন্দে লিখিত (সাফা ৩৬০)। মাওলানা আব্দুর রহমান জামি এই কাব্যগ্রন্থটি আবুল গাজী সুলতান হুসেন এর নামে উৎসর্গ করেন (শাফাক ৩২৫)। নিচে এ কাব্যগ্রন্থ থেকে মাওলানা আব্দুর রহমান জামির কয়েকটি বেইত উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

گلی از روضه جاوید بنمائی	الهی غنچه امید بگشائی
وزین گل عطر پرور کن دماغم	بخندان از لب آن غنچه باغم
بنعمتهای خویشم کن شناسا	درین محنت سرای بی مواسا

(জামি ৫৭৮)

(হে আল্লাহ! আমার আশার মুকুল প্রস্ফুটিত করো,
চিরস্থায়ী বাগানের একটি ফুল প্রকাশিত করো।
সেই ফুটন্ত ওষ্ঠ হতে আমার বাগানকেও হাস্যময় করো,
এবং সেই ফুল হতে আমার মস্তিষ্কে সুগন্ধময় করো।
এই অবিশ্বাস্য দুঃখময় সংসারে
আমাকে তোমার অনুগ্রহের পাত্র করো।)

এই কাব্যগ্রন্থটি কবির সবচেয়ে মনোরম ও আনন্দদায়ক মাসনাবি গ্রন্থ। অনেকে মনে করেন আব্দুর রহমান জামি রচিত *ইউসুফ ওয়া জুলেখা* কাব্যগ্রন্থটির মাধ্যমেই বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। এ কাব্যগ্রন্থে কুরআন শরিফের প্রসিদ্ধ দ্বাদশ সূরা ইউসুফ থেকে মূল কাহিনী নেওয়া হয়েছে। এ সুন্দর গল্পটি অবলম্বন করে পারস্য ও তুরস্কে অসংখ্য রোমান্টিক কাব্য সৃষ্টি হয়েছে। তন্মধ্যে কবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি তুসি রচিত *ইউসুফ জুলেখা* অন্যতম। আব্দুর রহমান জামির এ গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করেছে। এর উপরেই তাঁর খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনার সাথে আর কারো বর্ণনার তুলনা হয় না (Browne 442)।

হযরত ইয়াকুব (আ.)- এর পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.) শৈশবে ভ্রাতাদের ষড়যন্ত্রে পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। আল্লাহ তায়ালায় অপর ইশারায় তিনি তৎকালীন আজিজে মিসর (মিসরের অর্থমন্ত্রী) কিতফীর এর আশ্রয়ে আসেন। আজিজে মিসরের স্ত্রী জুলায়খা বহুদিন পূর্বে স্বপ্নে এক সুদর্শন যুবককে দেখে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। পরপর তিনবার স্বপ্নে সেই যুবকের সাথে দেখা হয়। যুবক নিজেকে আজিজে মিসর হিসেবে পরিচয় দেন। জুলায়খার পীড়াপীড়িতে তাঁর পিতা তাকে মিসরে নিয়ে আসেন এবং আজিজে মিসরের সাথে তাঁর বিয়ে দেন। বিয়ের পর জুলায়খা বুঝতে পারে এই আজিজে মিসর তাঁর স্বপ্নে দেখা কাজীকৃত যুবক নয়। তিনি অধীর আগ্রহে ও মানসিক অস্থিরতায় দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। একদিন তিনি দেখতে পান আজিজে মিসর ইউসুফ নামে এক যুবককে ক্রয় করে নিয়ে এসেছে। তাঁকে দেখামাত্র জুলায়খা চিনতে পারে যে, তিনি সেই তাঁর স্বপ্নে দেখা কাজীকৃত যুবক। স্বপ্নে দেখা যুবককে বাস্তবে দেখে জুলায়খা আত্মহারা হয়ে যায়। তিনি কাছ থেকে ইউসুফ (আ.) এর রূপমাধুর্য দর্শনে আরো বেশি আসক্ত হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে তাঁর কাছে প্রেম নিবেদন করেন। এতে ইউসুফ (আ.) এর সাড়া না পেয়ে সুযোগ বুঝে এক সময় জুলায়খা তাঁকে গৃহবন্দী করেন এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর সামনে পেশ করেন। ইউসুফ (আ.) আল্লাহ তায়ালায় দোহাই দিয়ে এ সব কিছু প্রত্যাখ্যান করেন। এ ঘটনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে ইউসুফ (আ.) কারাবন্দী হন। দীর্ঘদিন পরে ইউসুফ (আ.) কারামুক্ত হলেন। ইতিমধ্যে আজিজে মিসর মারা যান। এই দীর্ঘদিনেও ইউসুফ (আ.) এর প্রতি জুলায়খার প্রেমের কোনো ঘাটতি হয়নি। এরপর আল্লাহ তায়ালায় বিশেষ আদেশে ইউসুফ (আ.) এর সাথে জুলায়খা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এভাবেই প্রেমের কাহিনীটি উক্ত কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সূরা ইউসুফে এই ঘটনাকে উত্তম কাহিনী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (শাফি ৬৫০-৬৬৬)।

পবিত্র কুরআন শরিফে সূরা ইউসুফে বর্ণিত কাহিনীতে জুলায়খার সাথে ইউসুফ (আ.) এর বিয়ের তথ্য উপস্থিত নেই। মাওলানা আব্দুর রহমান জামি তাঁর ইউসুফ ওয়া জুলায়খা মাসনাভি কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইউসুফ (আ.) এর সাথে জুলায়খার বিয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে মাওলানা আব্দুর রহমান জামি বলেন-

چو فرمان یافت یوسف از خداوند که بنده با زلیخا عقد پیوند
(জামি ৭২৫)

(যখন আল্লাহর কাছ থেকে ইউসুফ (আ.) আদিষ্ট হলেন
তখন তিনি জুলায়খার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।)

আব্দুর রহমান জামির হাফ্ত আওরাজের ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হলো- লাইলি ওয়া মাজনুন (لَيْلى و مجنون)। এ কাব্যগ্রন্থটি বাহরে হেজাজ ছন্দে রচিত (সাফা ৩৬০)। এটি নিজামি গাঞ্জবির লাইলি ওয়া মাজনুন এর ছন্দে রচিত হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থে ৩,৭৬০টি বেইত রয়েছে (শাফাক ৩২৫)। আরবীয় কাহিনী থেকে লাইলি ওয়া মাজনুন মাসনাভির উপাদান গ্রহণ করা হয়েছে।

আব্দুর রহমান জামির লাইলি ওয়া মাজনুন মাসনাভি কাব্যগ্রন্থটি নিছক প্রেম কাহিনী নয়। বরং অন্যদের রচিত লাইলি ওয়া মাজনুন কাহিনীর চেয়ে মাওলানা আব্দুর রহমান জামির মাসনাভি আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। এ কাব্যগ্রন্থে মাওলানা আব্দুর রহমান জামি যে আধ্যাত্মিক প্রেমের রহস্য বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে থেকে দু'টি বেইত তুলে ধরা হলো-

هستند افلاک زاده عشق ارکان بزنیـــــد فـــــاده عشق
بی عشق نشاد ز نیک و بد نیست چیزی که ز عشق نیست خرد نیست
(জামি ৭৫৭)

(এই বিশ্ব প্রেম থেকেই প্রসূত,
প্রেম থেকেই পৃথিবীতে উপাদানসমূহের প্রকাশ।
প্রেম ছাড়া ভালো-মন্দের কোনো অস্তিত্বই নেই,
যা প্রেম হতে উদ্ভূত নয়, তার কোনো অস্তিত্ব নেই।)

আব্দুর রহমান জামির হাফত আওরাঙ্গ এর সপ্তম কাব্যগ্রন্থ হলো- *খেরাদ নামে ইসকান্দারি (خرد نامه اسکندری)*। এ কাব্যগ্রন্থটি আব্দুর রহমান জামি ৮৯০ হিজরি মোতাবেক ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। তখন আব্দুর রহমান জামির বয়স ছিলো ৭৩ বছর। মাওলানা আব্দুর রহমান জামির *খেরাদ নামে ইসকান্দার* একটি উপদেশ ও শিক্ষামূলক কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যগ্রন্থটি কবি নিজামি গাঞ্জুবি এর *সেকান্দার নামে* অনুসরণ করে সুলতান হুসেন বায়কারার নামে উৎসর্গ করেন (বাদাখশানি ৫৯৩)।

আব্দুর রহমান জামি এ মাসনাভি কাব্যগ্রন্থে খুতবা বর্ণনার পর আল্লাহ তায়ালায় একাত্ববাদের ঘোষণা, তাঁর কাছে মোনাজাত, রাসুল (সা.) এর প্রশংসা, মিরাজের বর্ণনা, খাজা উবায়দুল্লাহ আহরারের জন্য দোয়া, সুলতান হুসাইন বায়কারার প্রশংসা, স্বীয় পুত্র এবং নিজ আত্মাকে লক্ষ্য করে উপদেশ দিয়ে শুরু করেছেন। নিচে মাওলানা আব্দুর রহমান জামির পুত্রকে উপদেশ দিয়ে যে কাব্য রচনা করেছেন সেখান থেকে দু'টি বেইতের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

بیا ای جگر گوشه فرزند من بنه گوش بر گوهر پند من
صدف وار بنشین دمی لب خموش چو گوهر فشانم بمن دار گوش
(জামি ৯২২)

(হে আমার প্রাণপ্রিয় কলিজার টুকরা পুত্র! এস
মণি-মুক্তা তুল্য আমার উপদেশ শোন।
বিনুকের ন্যায় মুখ বন্ধ করে কিছু সময় বস
আমার ছড়ানো মণি-মুক্তাতুল্য উপদেশ কর্ণপাত কর।)

উপসংহার :

আব্দুর রহমান জামির কাব্যে পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব বিদ্যমান। তাঁর গজলে শেখ সাদি শিরাজি, হাফিজ শিরাজি, কবি খাকানি এবং আমির খসরু দেহলভির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কাসিদা রচনার ক্ষেত্রে কেবল রাজাদের প্রশংসাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। তিনি অনেক ধর্ম বিষয়ক কাসিদার অবতারণা করেছেন। কাসিদা রচনার ক্ষেত্রে তিনি খাকানি এবং আমির খসরুর অনুকরণ করেছেন। মাসনাভি রচনার ক্ষেত্রে তিনি নিজামি গাঞ্জুভির অনুকরণ করেছেন। তিনি নিজামি গাঞ্জুভির *খামসা* এর ন্যায় হাফত *আওরাঙ্গ* নামে সাতটি মাসনাভি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ওয়াহদাতুল অজুদ সম্পর্কিত সুফিবাদের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর সুস্ব পর্্যালোচনা এবং বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনায়

তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশভঙ্গি এই সকল বিষয়ের ভিত্তিতে তিনি প্রথম শ্রেণির সুফি কবি। তাঁর রচনাবলি প্রথম শ্রেণির সুফিতাত্ত্বিক উদ্ভাবনী প্রতিভার স্বাক্ষর ও ফসল। অতএব এ কথা বলা যায়, আব্দুর রহমান জামির কাব্য প্রতিভা ও ফারসি সাহিত্যে তাঁর অবদান কেবল তৎকালীন বিশ্বেই সুপরিচিত ও প্রভাবান্বিত করেছিলো তা নয়, বরং বর্তমান বিশ্বেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা, খ্যাতি ও প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর কাব্য-সাহিত্য যতদিন থাকবে তিনিও ততোদিন মানুষের মাঝে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তথ্যসূত্র

ফারসি ও উর্দু গ্রন্থসমূহ

জামি, আব্দুর রহমান। *দিওয়ান* (১ম খণ্ড)। আলা খান আফসাহ যাদ (সম্পাদিত), এন্তেশারাতে মিরাসে মাকতুব, তেহরান, ১৩৭৮ সৌরবর্ষ।

জামি, আব্দুর রহমান। *দিওয়ান* (২য় খণ্ড)। আলা খান আফসাহ যাদ (সম্পাদিত), এন্তেশারাতে মিরাসে মাকতুব, তেহরান, ১৩৭৮ সৌরবর্ষ।

জামি, আব্দুর রহমান। *মাসনাভিয়ে হাফ্ত আওরাজ*। এন্তেশারাতে সাদি, তেহরান, ১৩৮৬ সৌরবর্ষ।

দেহখোদা, আলি আকবর। *লুগাত নামে দেহখোদা* (১৬তম খণ্ড)। দানেশগাহে তেহরান, তেহরান, ১৩৩৮ সৌরবর্ষ।

হেকমত, আলি আসগর। *জামি*। এন্তেশারাতে তুস, তেহরান, ১৩৬৩ সৌরবর্ষ।

কেশাভারযি, কায়খসরু। *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*। এন্তেশারাতে হায়দারি, তেহরান, ১৩৭০ সৌরবর্ষ।

শাকিবা, পারভিন। *শেরে ফারসি আয অগায তা এমরোয*। এন্তেশারাতে হিরমাদ, তেহরান, ১৩৭৩ সৌরবর্ষ।

কেশাভারযি, মারযান। *বাহারিস্তানে জামি*। পেইদায়াশ, তেহরান, ১৩৭৯ সৌরবর্ষ।

বাহার, মালেকুশ শুয়ারা। *সাবক শেনাশি ইয়া তারিখে তাতাব্বারে নাসরে ফারসি* (৩য় খণ্ড)। এন্তেশারাতে জব্বার, তেহরান, ১৩৯৩ সৌরবর্ষ।

ফাজেলি, মাহবুদ। *অশেনায়িয়ে বা শায়েরানে ক্যাসিকে ইরান*। এন্তেশারাতে আল হুদা, তেহরান, ১৩৮০ সৌরবর্ষ।

বাদাখশানি, মির্যা মকবুল বেগ। *আদাব নামে ইরান*। ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সি, লাহোর।

শাফি, মুহাম্মদ। *তাফসির মাআরেফুল কুরআন* (সংক্ষিপ্ত)। মদিনা মোনাওয়ারা খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদিনা।

ইয়াহকি, মোহাম্মদ জাফর। *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (১ম ও ২য় খণ্ড)। ইরান শিক্ষামন্ত্রণালয়, তেহরান, ১৩৭৭ সৌরবর্ষ।

সাফা, যব্বিহ উল্লাহ। *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান* (৪র্থ খণ্ড)। এন্তেশারাতে ফেরদৌসি, তেহরান, ১৩৮৯ সৌরবর্ষ।

শাফাক, রেযা যাদেহ। *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*। এন্তেশারাতে অহাজ, তেহরান, ১৩৬৯ সৌরবর্ষ।

সুফি, লায়লা। *যিন্দিগিনামে শায়েরানে ইরান*। এন্তেশারাতে যাযরামি, তেহরান, ১৩৭৯ সৌরবর্ষ।

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

বাংলা গ্রন্থসমূহ

সান্তার, আবদুস। *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৯ খ্রি।

মনসুরউদ্দীন, মুহাম্মদ। *ইরানের কবি*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮ খ্রি।

পাল, হরেন্দ্র চন্দ্র। *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস*। শ্রী জগদীস প্রেস, কলকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

ইংরেজি গ্রন্থসমূহ

Browne, E.G. *A Literary History of Persia* (Voll.3). Cambridge University press, London, 1958.

Rypka, Jan. *History of Iranian Literature*. D. Reidel Publishing Company, Holland, 1968.

Ahmed, Tanwir. *A short History of Persian Literature*. Naaz Publishing Center, Calcutta, 1991.

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: স্কুল ফিডিং কার্যক্রম

মোঃ জাকির হোসেন *

প্রতিপাদ্যসার: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শিক্ষাব্যবস্থা। এদেশে বর্তমানে ১১ ধরনের ১,১৮,৮৯১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (প্রাক-প্রাথমিকসহ) ২,০১,০০,৯৭২ জন শিশু শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর মধ্যে শহর-বন্দর-নগর এলাকার চেয়ে মফস্বল-বস্তি-গ্রামীণ পরিবেশে বসবাস করছে বেশি। আর তাদের অধিকাংশই পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। বাংলাদেশে বিদ্যালয়গামী শিশুর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। বিদ্যালয়গামী বয়সী শিশুদের ৯৩% অপুষ্টির শিকার এবং শুধু শক্তি ঘাটতিই নয় তারা প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের ঘাটতিতেও ভুগছে। এসব শিশুর পড়ালেখায় মনোযোগ দেওয়া এবং শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য প্রতিনিয়ত কষ্ট করছে অথবা তারা বারে পড়ছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উপর সব ধরনের গুরুত্ব দেওয়ার পরেও কাজক্ষত লক্ষ্যে পৌছতে পারছে না। ২০০১ সালে দারিদ্র্যপীড়িত একটি এলাকায় ‘World Food Organization’ স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করলে ‘জাদুকরি’ ফলাফল অর্জন করে। প্রথম ঘণ্টায় তারা বাংলাদেশের তৈরি একপ্যাকেট বিস্কুট শ্রেণি কক্ষে বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেন। এ কার্যক্রমটি একটি অভিনব সমাধান হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি, স্কুল পালানো ও বারে পড়ার হার কমতে থাকে। এই বিস্কুটের মাধ্যমে শিশু প্রতিদিন ৩৩৮ কিলোক্যালোরি শক্তি পায়। WFP এর সাফল্যে বাংলাদেশ সরকার উচ্ছ্বসিত হয়ে ২০০৯ সালে দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং-এর জাতীয় কর্মসূচি চালু করে। বর্তমানে WFP ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ১০৪টি উপজেলার ৩০ লক্ষের অধিক শিক্ষার্থীকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কোথাও কোথাও বিস্কুটের পরিবর্তে মধ্যাহ্নে সবজি খিচুড়ি/ডিম খিচুড়ি বিতরণ করা হচ্ছে। ফলে বিদ্যালয়ে ভর্তিহার, উপস্থিতি, শিক্ষাচক্র সমাপনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বারেপড়ার হার হ্রাস পেয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের সফলতা, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা: পৃথিবীর দেশে দেশে যুগে যুগে শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর এই অধিকার বাস্তবায়নে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় (Formal education) প্রথম ধাপ প্রাথমিক শিক্ষা। এইটি শিক্ষার ভিত্তি। আর প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার ভিত্তিভূমি। শিশু শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন এবং তাকে উন্নত জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করাই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কেননা প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর আনন্দময় বর্তমান ও উৎপাদনশীল ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনধারণের জন্য বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিত করে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব হলো বিশ্বায়নের এই যুগে শিশুদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তাদের প্রাণশক্তি ও উচ্ছ্বাসকে উজ্জীবিত করা। আদর যত্ন স্নেহ ভালোবাসায় শিশু শিক্ষার্থীদেরকে সিত্ত করে শিক্ষা নামক মহাসড়কের শেষ প্রান্তে পৌঁছার দিকনির্দেশনা দেওয়া। বস্তুত ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় নতুন যুগের সূচনা হয়। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের যুগোপযোগী বৈষম্যহীন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রত্যয়ে এটির উদ্দেশ্য কৌশল পরিকল্পনা নতুন আঙ্গিকে প্রণয়ন করা হয়। নতুন জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন প্রাগসর মানবসম্পদ

* সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

গড়ে তোলার প্রত্যয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে ঢেলে সাজানো হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের ১৫ (ক), ১৬, ১৭, ২৮(৩) ও ৪১ (২) ধারায় শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত হলেও অনুচ্ছেদ ১৭ তে, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে-
অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা।- রাষ্ট্র-

ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক- বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;

খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;

গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন (বাংলাদেশের সংবিধান ৭)।

নবীন স্বাধীন রাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার সরকারের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বস্তুতপক্ষে এর সমস্ত কৃতিত্বই বঙ্গবন্ধুর ও তাঁর সরকারের। তাঁরই হাত ধরে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার নবজাগরণের সূচনা করে। রাষ্ট্রপতি ২৬ শে অক্টোবর ১৯৭৩-এ, এক অর্ডিন্যান্স জারি করে প্রাথমিক শিক্ষা সরকারিকরণ করেন। ৩১শে অক্টোবর ১৯৭৩ সালে তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এটি ‘The primary schools (Taking over) Ordinance 1973’ নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে উক্ত অর্ডিন্যান্সটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বিল আকারে উপস্থাপন করা হলে সংসদে তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন লাভ করে। এটি ‘The primary schools (Taking over) Act 1974’ নামে খ্যাত। উপর্যুক্ত আইনের আওতায় ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১,৫৫,০২৩ জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণ করা হয় (হালদার ৩৭-৪১)। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা আপামর জনগণের নিকট সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি ও যথাযথ মর্যাদা লাভ করে। দীর্ঘদিন পর ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক ‘প্রাথমিক শিক্ষা আইন’ পাস হলে ১৯৯২ সালে ৬৮টি উপজেলায় প্রকল্পটি চালু হয়। প্রকল্পটির সফলতায় সমগ্রদেশে তা বিস্তার লাভ করে। ২০০০ সালের এপ্রিলে সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনে বাংলাদেশ অঙ্গীকার করে যে, ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে (হালদার ৮৭)।

গবেষণা সমস্যা: দেশের সবচেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত এলাকাগুলোর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং শ্রেণিকক্ষে তাদের উপস্থিতি ধরে রাখা সমস্যা হিসেবেই থেকে যায়। দারিদ্র্যতার সঙ্গে বসবাসকারী পরিবার তাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয় এবং বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় তারা বিদ্যালয়ে যাওয়ার চেয়ে গৃহকর্মে সাহায্য করছে। আর যেসব শিশু বিদ্যালয়ে যায় তারা প্রায়শই ক্ষুধা নিয়ে যায়। ফলে শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনায় মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। তাদের ঝরেপড়ার আশঙ্কা থেকে যায়। তাছাড়া, সব অর্থনৈতিক স্তরের শিশুরা মারাত্মক অপুষ্টির ঘাটতিতে ভোগে। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ঝড় বন্যা বাংলাদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। ২০০০ সালে প্রবল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জরুরি সহায়তার অংশ হিসেবে WFP (World Food Programme) ২০০১ সালে ‘বাংলাদেশ স্কুল ফিডিং কর্মসূচি’ চালু করে। WFP এর কর্মকর্তাগণ দ্রাণ বিতরণের সময় লক্ষ্য করে যে, সহায়তাপ্রাপ্ত পরিবারের শিশুরা নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে যায় না। এমতাবস্থায় তাদের কর্মীরা শিশুদের বিদ্যালয় যেতে একপ্যাকেট পুষ্টিকর

বিস্কুট বিতরণ করে। যা স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ বিস্কুট। এ কার্যক্রমটি একটি অভিনব সমাধান হিসেবে আবির্ভূত হয়। প্রায় ৩,৫০,০০০ শিক্ষার্থীকে স্বল্পকালীন ক্ষুধা মেটানোর কাজে ‘জাদুকরি’ ভূমিকা রাখে (প্রতিবেদন ২০১২, ১৫)। ফলে গবেষক উপর্যুক্ত বিষয়টি গবেষণা হিসেবে বেছে নেন।

গবেষণা পদ্ধতি: উপর্যুক্ত গবেষণাটি দ্বারা বাংলাদেশের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার ও WFP এর ভূমিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনায় বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন, WFP এর প্রকাশনা, পত্র-পত্রিকা ও ওয়েবসাইটের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। ফলে এটি একটি বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি।

গবেষণার উদ্দেশ্য: ‘বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: স্কুল ফিডিং কার্যক্রম’ শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিহারা কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা তার যাচাই;
- শিশু শিক্ষার্থীদের পুষ্টি ঘাটতি পূরণে কার্যক্রমটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা নির্ণয়;
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতিতে ইতিবাচক কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা অনুসন্ধান;
- প্রাথমিক সমাপনি পরীক্ষায় পাশের হারের গতিপ্রকৃতি নিরূপণ;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপর্যুক্ত কার্যক্রমের ফলে ঝরে পড়ার হার সনাক্তকরণ;
- স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ;
- ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ ও সুপারিশ।

স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য:

- স্কুল ফিডিং কর্মসূচির সামগ্রিক লক্ষ্য হচ্ছে জাতিসংঘের এমডিজি-২ বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২ (millennium development goal MDG) এর সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অবদান রাখা। যথা-
- এমডিজি- ২ এর প্রধান লক্ষ্য- ২০১৫ সালের মধ্যে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সব জায়গার শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষাচক্র শেষ করতে সক্ষম হবে।
- এমডিজির লক্ষ্য হলো ২০১৫ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে নীট ভর্তিহার ১০০ শতাংশে উন্নীত করা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৫ সালে ঝরে পড়ার হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা।

স্কুল ফিডিং কর্মসূচির স্বল্পকালীন লক্ষ্য:

- খাদ্য নিরাপত্তাহীন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও উপস্থিতির হার বাড়ানো;
- অপুষ্টির ঘাটতি কমিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের শিখন সার্মথ্যের উন্নয়ন ঘটানো;
- দক্ষ এবং কার্যকরভাবে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা (প্রতিবেদন ২০১২ , ১৫)।

উপর্যুক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নে ২০০৩ সালে WFP স্কুল ফিডিং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের দুর্যোগ্য কবলিত এলাকা থেকে উত্তরাঞ্চলে যা স্থানীয়ভাবে ‘মঙ্গা’ নামে পরিচিত এলাকায় সম্প্রসারণ করে। তবে বিস্কুটের পুষ্টিগুণ ঠিক রেখে ১০০ গ্রাম থেকে ৭৫ গ্রামে নামিয়ে আনা হয়। এসময়ে সহায়তা প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১.২ মিলিয়নে পৌঁছায়। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে ২০০৫-০৬ মেয়াদে অপেক্ষাকৃত কম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকা থেকে WFP স্কুল ফিডিং গুটিয়ে নেয়। অবশ্য ২০০৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য স্কুল ফিডিং চালু করে। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর বন্যা আক্রান্ত এলাকায় WFP জরুরি স্কুল ফিডিং সম্প্রসারণ করে। ২০০৮-০৯ সালে ঢাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করা হয় (প্রতিবেদন ২০১২, ১৫)।

বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং-এর জাতীয় কর্মসূচির সূচনা করে। ২০১০ সালে একনেক (ECNCE) দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি অনুমোদন করে। সরকার ২০১১ সালে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়া উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী প্রায় ৫৬,৬৩৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে উচ্চপুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট বিতরণ করে। ২০১২ সালের অক্টোবরের মধ্যে সরকার ১.৪ মিলিয়ন বিদ্যালয়গামী শিশুকে সহায়তার আওতায় আনে। WFP ও সরকারের যৌথ উদ্যোগে ২০১২ সালের শেষ অবধি দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলার মোট ২.৫ মিলিয়ন শিশু এই কর্মসূচির আওতায় আসে (প্রতিবেদন ২০১২, ১৯)।

প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়ের ধরন:

- প্রকল্পভুক্ত উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন জাতীয়করণসহ)
- প্রকল্প এলাকায় ১৫০০ বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ও চালুকৃত বিদ্যালয়;
- প্রকল্পভুক্ত শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়;
- প্রকল্প এলাকায় স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা।

স্কুল ফিডিং-এ, কেন বিস্কুট? কী রয়েছে এই বিস্কুটে?

এসব প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়-

- স্কুল ফিডিং মডেল হচ্ছে জনপ্রিয় গণচাহিদা সম্পন্ন কার্যক্রম।
- উচ্চপুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট শিশুদের বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহী করে।
- অভিভাবকেরা সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহী হন।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়ায়।
- প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনে কার্যকর ভূমিকা রাখে।
- শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনকার পুষ্টির যোগান দেয়।
- শ্রেণি শিখনের ক্ষমতা বাড়ায়। শিক্ষার্থীরা মনোযোগী হয়।
- এটির অপচয় হয় না।
- স্কুল ফিডিং মডেল ব্যয়সাশ্রয়ী ও ব্যবস্থাপনা সহজ।
- কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (SMC) ও অভিভাবক-শিক্ষক (PTA) সংশ্লিষ্টতার ফলে স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যার সমাধান করা সহজ (প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, ১৪)।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: স্কুল ফিডিং কার্যক্রম

- এই বিস্কুটের মাধ্যমে শিশু প্রতিদিন ৩৩৮ কিলোক্যালরি শক্তি পায়, যা তার অণুপুষ্টি চাহিদার ৬৭% পূরণ করে। এতে রয়েছে-

৬৯% উন্নতমানের গমের আটা
১৩% উদ্ভিদ চর্বি
৬% ফুল ফ্যাট সয়াফ্লাওয়ার
১২% চিনি এবং প্রয়োজনীয় লবণ।

পুষ্টিগুণের মধ্যে আছে-

ভিটামিন এ
ভিটামিন বি১ বি২ বি৫ বি ৬ ও বি ১২
ভিটামিন সি
ভিটামিন ডি৩
ভিটামিন ই, আয়োডিন ফলিক এসিড নিকোটিন এমাইড আয়রন ও জিঙ্কের
উপাদান। এই পুষ্টি উপাদান শিশুকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে সাহায্য করে।
শেখায় সামর্থ্য বাড়ায় (প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, ১১)।

স্কুল ফিডিং কর্মসূচির প্রকল্প সংশোধনীর বিবরণ:

দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্পটি জুলাই ২০১০ সাল হতে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান আছে।
ইতোমধ্যে প্রকল্পটি ৩ বারের জন্য সংশোধন করা হয়েছে। প্রতিটি সংশোধনে সরকারি অংশে প্রকল্পের কর্ম এলাকা
সম্প্রসারিত হয়েছে। সংশোধনীর বিবরণ নিম্নরূপ:

মূল ডিপিপি :

প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১৪২৭৯.৯১ (জিওবি: ৫৯৭৭০. ৫৭ প্রকল্প সাহায্য: ৫৪৫০৯.৩০) মেয়াদ: জুলাই ২০১০-জুন
২০১৪।

১ম সংশোধিত ডিপিপি:

প্রাক্কলিত ব্যয় : মোট: ১৫৭৭৯৩.১১ (জিওবি : ৮৭৫৭৪.৫০ প্রকল্প সাহায্য : ৭০২১৮.৬১) মেয়াদ: জুলাই ২০১০
ডিসেম্বর ২০১৪।

২য় সংশোধিত ডিপিপি:

প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট : ৩১৪৫৫২.২০ (জিওবি : ২১৪৫৯৯.৬৫ প্রকল্প সাহায্য : ৯৯৯৫২.৫৫) মেয়াদ : জুলাই
২০১০- ডিসেম্বর ২০১৭।

৩য় সংশোধিত ডিপিপি:

প্রাক্কলিত ব্যয় : মোট : ৪৯৯১৯৭.২৯ (জিওবি : ৩৭৩৭০৬.৮২ প্রকল্প সাহায্য: ১২৫৪৯০.৪৭) মেয়াদ: জুলাই
২০১০- ডিসেম্বর ২০২০ (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৪১)।

অর্থবছর অনুযায়ী প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী
সারণি-০১
(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	বরাদ্দ			ব্যয়			
	জিওবি	ডিপিএ	মোট	জিওবি	ডিপিএ	মোট	শতকরা হার
২০১০-১১	৫০.০০	৯০৪০.০০	৯০৯০.০০	৬.৮৬	৮৮৯০.০০	৮৮৯৬.৮৬	৯৭.৮৮%
২০১১-১২	১০৪০০.০০	১৩৫৫০.০০	২৩৯৫০.০০	৯৮৭৬.৫৫	১৩৫৫০.০০	২৩৪২৬.৫৫	৯৭.৮১%
২০১২-১৩	২২৯০০.০০	২০১০০.০০	৪৩০০০.০০	২২৮৭৩.৮৬	২০০৯৯.১৭	৪২৯৭৩.০৩	৯৯.৯৪%
২০১৩-১৪	২৮০০০.০০	২৮৩০০.০০	৪৬৩০০.০০	২৭৯৬৫.৬৪	১৮২৯৯.২৭	৪৬২৬৪.৯১	৯৯.৯২%
২০১৪-১৫	২৭০০০.০০	১৪৮৮০.০০	৪১৮৮০.০০	২৬৯০১.৬০	১৪৮৭.৩২	৪১৭৭৯.৯২	৯৯.৭৬%
২০১৫-১৬	৩৬১৬৬.০০	১২০০০.০০	৪৮১৬৬.০০	৩৬০৭২.৬৫	১১৯৯.৫৭	৪৮০৭১.২২	৯৯.৮০%
২০১৬-১৭	৪১৮৩০.০০	১২১৮০.০০	৫৪০১০.০০	৩৬২৯৬.১৬	১২১৭০.৬৩	৪৮৪৬৬.৯৭	৮৯.৭৪%
২০১৭-১৮	৩৯০০০.০০	৯৪১৮.০০	৪৮৪১৮.০০	৩৭১৪০.৫১	৯৪১৬.১১	৪৬৫৫৬.৬২	৯৬.১৬%
২০১৮-১৯	৪৫৬০০.০০	৬২১০.০০	৫১৮১০.০০	৪২০৬৭.৮৪	৬২০৮.২৭	৪৮২৭৬.১১	৯৩.১৮%
২০১৯-২০	৩৯৫০০.০০	৬৫০০.০০	৪৬০০০.০০	৩৮৯৪৫.৭০	৬৫০০.০০	৪৫৪৪৫.৭০	৯৮.৮০%
২০২০-২১	৪৯৭৯৮.৮৪	৬২১৫.০০	৫৬০১৩.৮৪	৪৮৬৪৮.৭৯	৬২১৫.০০	৫৪৮৬৩.৭৯	৯৭.৯৫%

উৎস : বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, পৃ. ২৫, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ.৩৬।

উপর্যুক্ত সারণিতে- দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সরকার ও সহযোগী দাতা সংস্থাগুলো স্কুল ফিডিং কার্যক্রম MDG-2 (২০১৫) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ২০১৪-২০১৫ আর্থিক বছরে ৪১৮৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের ৪১৭৭৯.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। ২০২০-২১ সালে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪৮৬৩.৭৯ লক্ষ টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে ব্যয়ের ফলে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বেড়েছে। বারে পড়ার হার কমেছে। প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনী হারও বেড়েছে। নীট ভর্তিহারে সবিস্তার ঘটেছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: স্কুল ফিডিং কার্যক্রম

২০০১ সাল থেকে WFP এর স্কুল ফিডিং ও অন্যান্য কার্যক্রমে নীট ভর্তিহার নিম্নরূপ-

সারণি-০২

সাল	নীট ভর্তিহার
২০০৫	৮৭.২%
২০০৬	৯০.৯%
২০০৭	৯১.১%
২০০৮	৯০.৮%
২০০৯	৯৩.৯%

সূত্র: এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ.১১

২০১০ সাল থেকে WFP ও বাংলাদেশ সরকার যৌথ ও এককভাবে বিভিন্ন উপজেলায় স্কুল ফিডিং ও অন্যান্য কার্যক্রমের ফলে ভর্তিহারে প্রভাব পড়ে। যথা-

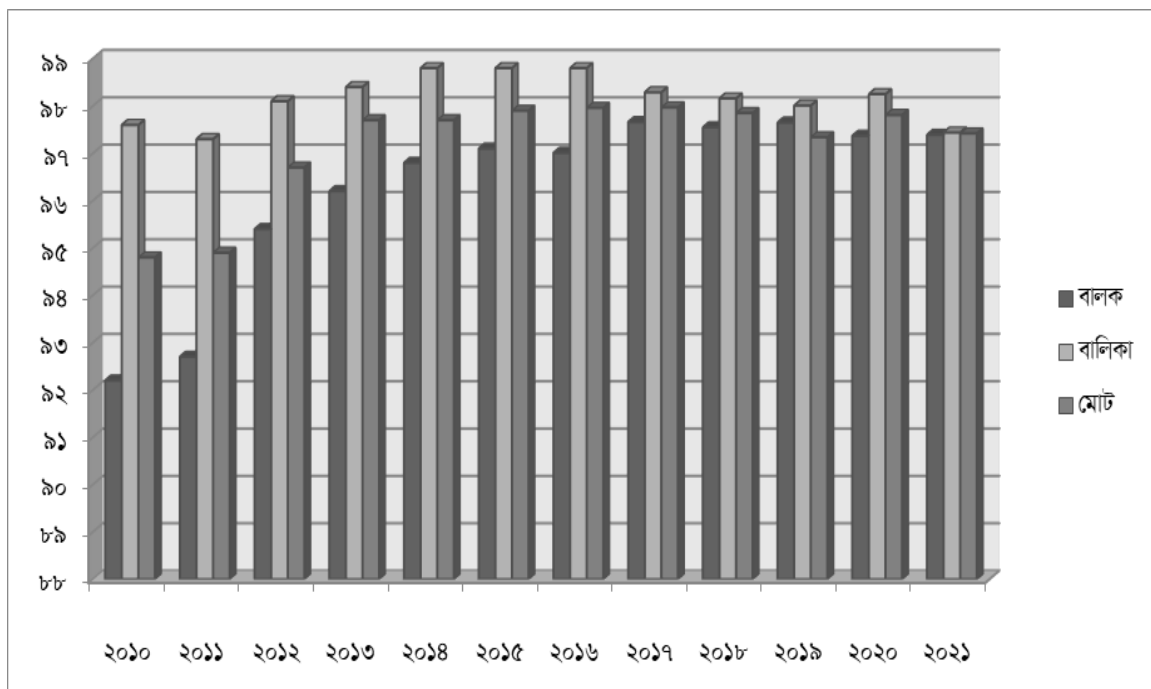
সারণি-০৩

সাল	নীট ভর্তিহার		
	বালক	বালিকা	মোট
২০১০	৯২.২০	৯৭.৬০	৯৪.৮০
২০১১	৯২.৭০	৯৭.৩০	৯৪.৯০
২০১২	৯৫.৪০	৯৮.১০	৯৬.৭০
২০১৩	৯৬.২০	৯৮.৪০	৯৭.৭০
২০১৪	৯৬.৮০	৯৮.৮০	৯৭.৭০
২০১৫	৯৭.১০	৯৮.৮০	৯৭.৯০
২০১৬	৯৭.০১	৯৮.৮০	৯৭.৯৬
২০১৭	৯৭.৬৬	৯৮.২৯	৯৭.৯৭
২০১৮	৯৭.৫৫	৯৮.১৬	৯৭.৮৫
২০১৯	৯৭.৬৫	৯৮.০১	৯৭.৩৪
২০২০	৯৭.৩৭	৯৮.২৫	৯৭.৮১
২০২১	৯৭.৩৯	৯৭.৪৪	৯৭.৪২

সূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ. ২২।

উপর্যুক্ত সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, MDG-2 অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষায় কাজিক্ষত লক্ষ্য প্রায় পূরণ হয়েছে। ২০১৫ সালে ভর্তি হার ৯৭.৯০% এ, উন্নীত হয়েছে। কোভিড-১৯ এর ফলে ২০২১এ, ভর্তি হার ৯৭.৪২% এ, নেমেছে।

সারণি-০৩ চিত্রে প্রদর্শিত হলো:



চিত্র-১: ভর্তি হার বৃদ্ধি

WFP এর স্কুল ফিডিং ও অন্যান্য কার্যক্রমের ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় বারে পড়ার হার ধীরে ধীরে কমছে:

সারণি-০৪

সাল	বারে পড়ার হার
২০০৫	৮৭.২%
২০০৬	৫০.৫%
২০০৭	৫০.৫%
২০০৮	৮৯.৩%
২০০৯	৮৫.১%

সূত্র: এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ. ১২।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: স্কুল ফিডিং কার্যক্রম

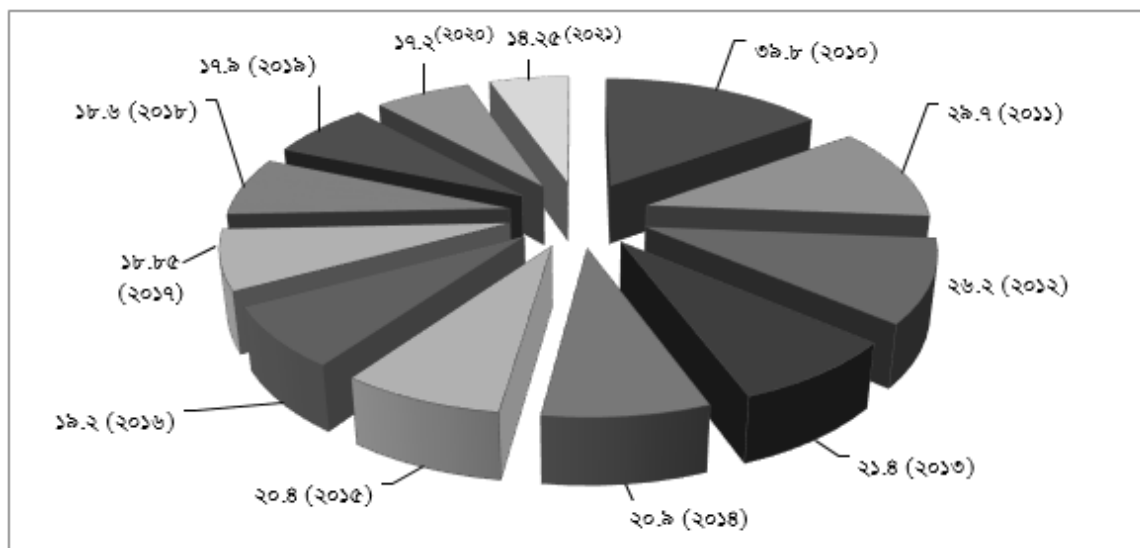
বাংলাদেশ সরকার ও WFP এর যৌথ প্রচেষ্টায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের ফলে ঝরে পড়ার হার নিম্নরূপ-

সারণি- ০৫

ঝরে পড়ার শতকরা হার	সাল	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
বালক		৪০.৩	৩২.৪	২৮.৩	২৪.৯	২৪.৩	২৩.৯	২২.৩	৩১.৭২	২১.৪৪	১৯.১	১৫.০৫	১৫.০৫
বালিকা		৩৯.৩	২৭.০	২৪.২	১৭.৯	১৭.৫	১৭.০	১৬.১	১৫.৯২	১৫.৬৯	১৫.৭	১৫.৫	১৩.২৫
মোট		৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯	২০.৪	১৯.২	১৮.৮৫	১৮.৬	১৭.৯	১৭.২	১৪.২৫

সূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ. ২৩।

সারণি- ০৫ অনুযায়ী MDG-2 এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষায় তার কাজক্ষিত প্রচেষ্টায় ২০১৫ সালে ঝরেপড়ার হার ২০.৪% এ, উন্নীত করেছে। যা ২০২১ এ, ১৪.২৫% অর্জন করেছে। সারণি-০৫ নিম্নোক্ত চিত্রে প্রদর্শিত হলো-



চিত্র-২, ঝরেপড়ার হার হ্রাস

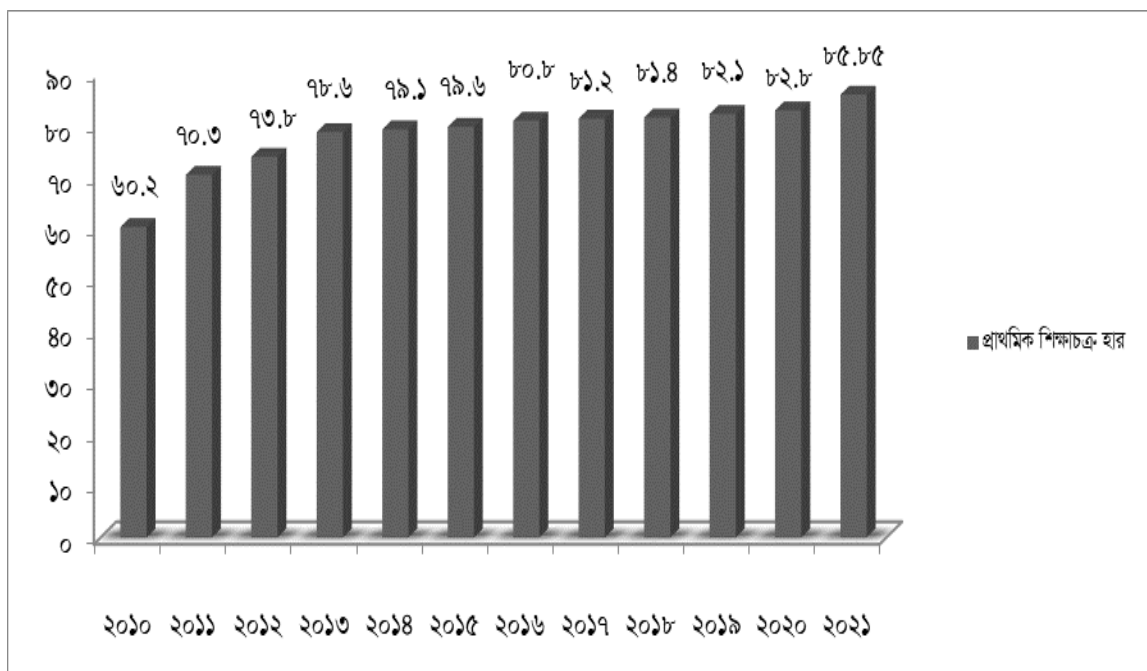
সারণি- ০৬

প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনীর হার-

বছর	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
প্রাথমিক শিক্ষাচক্র হার	৬০.২	৭০.৩	৭৩.৮	৭৮.৬	৭৯.১	৭৯.৬	৮০.৮	৮১.২	৮১.৮	৮২.১	৮২.৮	৮৫.৮৫

সূত্র : বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ.২৪।

উক্ত সারণি-০৬ এ, লক্ষ্য করা যায়, ২০১৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনীর হার ৭৯.৬% যা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রায় কাছাকাছি। ২০২১ এ, ৮৫.৮৫% উন্নীত হয়েছে। চিত্রে সারণি-০৬ উপস্থাপিত হলো:



চিত্র-৩, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের হার বৃদ্ধি।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: স্কুল ফিডিং কার্যক্রম

প্রাথমিক শিক্ষায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম সাক্ষরতার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে। যথা-

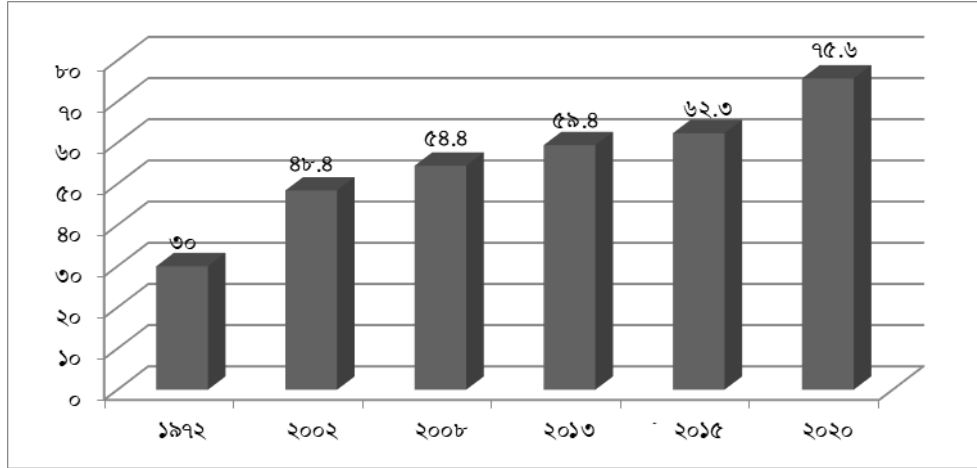
সারণি-০৭

সাক্ষরতার হার-

সাল	১৯৭২	২০০২	২০০৮	২০১৩	২০১৫	২০২০
সাক্ষরতার হার	৩০	৪৮.৪	৫৪.৪	৫৯.৪	৬২.৩	৭৫.৬

সূত্র : এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ. ১০ ও বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ. ৪৮।

সারণি-০৭ এ, লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ১৯৭২ সালে সাক্ষরতার হার ছিলো ৩০% যা ২০১৫ এ, ৬২.৩% এবং ২০২০ এ, ৭৫.৬% এ, উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষায় স্কুল ফিডিং ও অন্যান্য কার্যক্রমের অবদান রয়েছে। চিত্রে তা উপস্থাপিত হলো-



স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা:

শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ ও সুস্থ সবল স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিগত খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিদ্যালয়ে সকল চাহিদা পূরণ ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্কুল মিল কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এ কার্যক্রম পরিচালনা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা প্রয়োজন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ‘জাতীয় স্কুল মিল নীতি ২০১৯’ প্রণয়ন করেছেন। প্রণীত এ নীতির আলোকে স্কুল মিল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার (SDG-4) লক্ষ্যমাত্রা ও ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন সম্ভব হবে। কেননা বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষার-

রূপকল্প (Vision)

সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ (প্রতিবেদন ২০২১-২২, ১২)।

স্কুল ফিডিং কর্মসূচিকে সর্বজনীন করার মাধ্যমে শিক্ষায় সকল ধরনের বৈষম্য নিরসন, শিক্ষার্থীর জন্য খাদ্য নিরাপত্তাবলয় সৃষ্টি ও শিখনফল অর্জন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখা সম্ভব। কেননা টেকসই উন্নয়ন ২০৩০-এর লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ (মিল নীতি ২০১৯, ২)।

‘জাতীয় স্কুল মিল নীতি ২০১৯’ অনুযায়ী দেশের ৮টি বিভাগের ১৬টি উপজেলায় অক্টোবর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ৪,১০,০০০ শিক্ষার্থীকে বিস্কুটের পরিবর্তে ‘মিড ডে মিল’ তথা রান্না করা গরম গরম সবজি খিচুড়ি ও ডিম খিচুড়ি সরবরাহ করা হয়েছে (প্রতিবেদন ৪১)। স্কুল মিলের খাদ্যবৈচিত্র্য বৃদ্ধি ও খাবারের স্বাদে বৈচিত্র্য আনতে পুষ্টিচাল (fortified rice) ডাল, পুষ্টিতেল (fortified vegetable oil) ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিভিন্ন মৌসুমী তাজাসবজি এবং সম্ভাব্যক্ষেত্রে ডিম দিয়ে তৈরি খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদেরকে একদিন উচ্চপুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট ও অন্যান্য দিন রান্না-করা খাবার দেওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৫)।

স্কুল ফিডিং কর্মসূচি থেকে অর্জিত ফলাফল :

- ২০১২ সালে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি ২.৫ মিলিয়নের বেশি বিদ্যালয়গামী শিশুর কাছে পৌঁছেছে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিহার ১৬% বেড়েছে।
- শিশুদের আয়রণ উপদানের ঘাটতি কমেছে ১২%।
- উপস্থিতির হার ৮%-১৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ঝরেপড়ার হার কমেছে ৬%।
- ইতিবাচক শিখন (Learning) পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।
- অভিভাবক মহলে একটি কার্যকর প্রণোদনা হিসেবে কাজ করেছে।
- প্রাথমিক সমাপনের হার ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- স্বচ্ছভাবে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- সরকার ও স্থানীয় কমিউনিটি এই কর্মকাণ্ডে বেশ আন্তরিক।
- স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকার ও WFP এর মধ্যে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর অংশীদারিত্বের প্রতিফলন ঘটেছে (প্রতিবেদন ২০২০-২০২১, ৩৬)।
- ৩০ লক্ষের অধিক শিক্ষার্থীকে স্কুল মিল কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (প্রতিবেদন ২০১৬, ৩৮)।
- প্রকল্পের আওতায় যে সকল এলাকায় হোম গ্রোন স্কুল মিল বা মিড ডে মিল কার্যক্রম চলমান রয়েছে সে সকল এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থানীয় নারী উৎপাদনকারী সৃষ্টি হয়েছে, এতে তাদের পারিবারিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: স্কুল ফিডিং কার্যক্রম

- সরকারি অংশে বাজেট বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- প্রকল্পটি পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে (প্রতিবেদন ২০১৬, ৩৭)।
- প্রকল্পভুক্ত প্রায় ৬২% বিদ্যালয়ে প্রদর্শনী সবজি বাগান গড়ে উঠেছে। ক্লাস বিরতির সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বাগান পরিচর্যা করে। যেসব বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত চাষ উপযোগী জায়গা নেই; সেসব বিদ্যালয়ের ছাদে টবে সবজির চাষ হচ্ছে। এতে স্থান পেয়েছে টম্যাটো, মিষ্টিকুমড়া, বেগুন, লাউ, মরিচ, পেয়ারা ইত্যাদি। ফলে শিক্ষার্থীরা সবজি বাগান কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি বিদ্যালয় ও বাড়িতে সবজি বাগান তৈরিতে মনোনিবেশ করছে।
- ৮৪% বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা আছে।
- ৯১% বিদ্যালয় স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে।
- ৮৮% শিক্ষার্থী জুতা-স্যান্ডেল পরে স্কুলে আসে।
- প্রায় ৭৮% শিক্ষার্থী টিফিন-বক্স ব্যবহার করছে।
- ৮৭% বিদ্যালয় কমিউনিটি মবিলাইজেশন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে (প্রতিবেদন ২০১৬, ২১)।

স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ:

- বাংলাদেশে বর্তমানে ১১ ধরনের ১,১৮,৮৯১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ) ২,০১,০০,৯৭২ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। ৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় বর্হিত্ত শিশুর সংখ্যা কমপক্ষে ৪,১৪,৪৮০ জন (প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, ১০)। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৩০,০০,০০০ স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী। ১,৭১,০০,৯৭২ জন শিক্ষার্থী এই সুবিধার বাহিরে রয়েছে।
- বিস্কুট বা প্রদেয় খাবারের মান নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখা।
- বিস্কুট ও অন্যান্য উপকরণ যথাযথ সংরক্ষণের জন্য বিদ্যালয়ে উপযুক্ত স্থান সংকুলান করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ।
- দাতা ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সঙ্গে সরকারের ব্যবস্থাপনার সমন্বয় করা।
- প্রকল্প কার্যক্রম সরকারের রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি।

বাংলাদেশে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা। যেখানে সমগ্রদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ১,১৮,৮৯১টি। নিঃসন্দেহে এটি বিশ্বের অন্যতম একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। দুই দশকেরও বেশি আগে শিক্ষাকে বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশ সরকার সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তার জোরালো অঙ্গিকার এবং সন্তোষজনক সফলতার জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ২০১৩ সালে ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো একই সাথে ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,০৪,০০০ শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করা হয় (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ১৫)।

সুপারিশ : সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে করণীয়সমূহ নিম্নরূপ:

- শুধুমাত্র ৩৫টি জেলার ১০৪টি উপজেলার দারিদ্র্যপীড়িত এলাকা ছাড়াও অন্যান্য দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে।
- শিক্ষা বাজেট কাক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করে প্রাথমিক শিক্ষায় অধিক বরাদ্দ দেয়া জরুরি। নিম্নের সারণিতে বাংলাদেশে বিভিন্ন অর্থবছরে প্রাথমিক স্তরের শিশু শিক্ষার্থীর বরাদ্দ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-০৮

অর্থবছর	শিক্ষার্থী প্রতি বরাদ্দ (টাকা)
১৯৭২-৭৩	৪৪
১৯৮০-৮১	১৪২
১৯৯০-৯১	৬১১
২০০১-০১	১,৫৫৯
২০১০-১১	৪,৭৬৯
২০২০-২১	১২,৩৯৪

সূত্র: মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন, ৫০ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষা, ঢাকা: আদর্শ, ২০২২, পৃ.৬৮।

সারণি-০৮ এ, লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ধীরে ধীরে শিক্ষার্থী প্রতি বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে তা এখনো কাক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছেনি। গুণগত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি বছর বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি জরুরি।

- স্কুল ফিডিং কার্যক্রম ধীরে ধীরে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। জাতীয় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর জন্য রাজস্ব আয় বাড়াতে প্রচারণা জোরদার করতে হবে। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের একই ছাতার আওতায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রমকে একটি উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- স্কুল ফিডিং কর্মসূচির সাথে স্থানীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও বিশেষভাবে অনগ্রসর নারীদের কীভাবে সম্পৃক্ত করা যায়, সে জন্য একটি টেকসই মডেল প্রণয়ন জরুরি।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা ও নিয়মিতভাবে তা বাস্তবায়ন করা।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: স্কুল ফিডিং কার্যক্রম

- স্কুল ফিডিং কর্মসূচিকে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের মূলধারায় কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে বিষয়ে কর্মপরিচালনা গ্রহণ করা।
- স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় স্বচ্ছল ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করার কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- স্কুল ফিডিং কার্যক্রমটি শতভাগ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে নিরক্ষরতা শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। দেশের বিভিন্ন শহরে অসংখ্য বস্তি রয়েছে। এসব আলোকোজ্জ্বল শহর-নগরীতে মানব শিশু থাকতে বাধ্য হলেও তারা পাচ্ছে না শিক্ষার আলো, না পাচ্ছে প্রয়োজনীয় পুষ্টি। এমতাবস্থায়, এই প্রকল্পে তাদের অন্তর্ভুক্তিকরণ সময়ের দাবি মাত্র।

উপসংহার : বাংলাদেশে স্কুল ফিডিং বাস্তবায়নে যেসব দেশকে মডেল হিসেবে ধরা হচ্ছে তার মধ্যে ব্রুটেন, ভারত ফিনল্যান্ড অন্যতম। শিক্ষাবিদগণের ভাষ্য, বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে মধ্যাহ্ন খাবার দেওয়া প্রায় স্বাভাবিক ও প্রচলিত একটি নিয়ম হিসেবে স্বীকৃত। কোনো কোনো দেশ স্কুল মিলকে অবৈতনিক শিক্ষার একটি অংশ হিসেবে গণ্য করেছে। আবার কিছু কিছু দেশ এ কার্যক্রমকে শিশুর স্বাস্থ্য পুষ্টি ও মেধাবিকাশ তথা জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গুণগতমান উন্নয়নের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেছে। এছাড়াও আরো কিছু কিছু দেশ আছে যেখানে বিনামূল্যে খাবার বিতরণকে স্কুল শিশুদের ভর্তিহার বৃদ্ধি ও সামাজিক বৈষম্য দূর করার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখছে। ভারতে প্রতিদিন ২০ কোটি শিশুকে স্কুলে রান্না করা খাবার দেওয়া হয়। ব্রাজিলে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষির নানামুখী উন্নয়ন হয়েছে। বিদ্যালয়ে রান্নার প্রয়োজনীয় সবজিসহ কৃষি উপকরণ সরবরাহের জন্য এলাকায় এলকায় গড়ে উঠেছে কৃষি খামার। এর মাধ্যমে ব্রাজিলের কৃষি ব্যবস্থা পাল্টে গেছে (daily.janakhantha.com)। বাংলাদেশকে উপর্যুক্ত দেশগুলোর সফলতা বিবেচনায় রেখে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমকে প্রাথমিক শিক্ষায় আবশ্যিকীয় উপাদান হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তথ্যসূত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ২০১৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় স্কুল মিল নীতি ২০১৯।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২, World Food Programme।

হালদার, বিমেলেন্দু, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা অতীত ও বর্তমান, আগামী প্রকাশনী, ২০১৮।

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

সালাহউদ্দিন, মুহাম্মদ, ৫০ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষা, আদর্শ, ২০২২।

রহমান, মোহাম্মদ মুজিবুর, প্রারম্ভিক শিক্ষা বিজ্ঞান, প্রভাতী লাইব্রেরী, ২০২০।

<http://stp.dpe.gov.bd>

daily.janakhantha.com

মামুনুর রশীদকৃত ওরা কদম আলী: নিম্নবর্ণের মানুষের উত্থান

শাকিলা তাসমিন *

প্রতিপাদ্যসার: স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাট্যচর্চায় অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের মানুষের জীবনাচার, প্রতিবন্ধক সমাজ ব্যবস্থা। বিশেষত যুদ্ধকালীন নারী নির্যাতন, লুট, রাহাজানি, গুম, খুন প্রভৃতি নাট্য রচনার প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে। এ ধারার নাট্যকার হিসেবে মামুনুর রশীদ (১৯৪৮) অন্যতম। তাঁর নাটক সমূহে বিবৃত হয়েছে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবনাচারের প্রেক্ষাপট। মামুনুর রশীদে নাট্যকাহিনীতে ধ্বনিত হয়েছে মানুষের অন্তর্গত হৃদয়ের হাহাকার। মামুনুর রশীদ মূলত রাজনীতি, সমাজ ও শ্রেণি সচেতন একজন নাট্যকার। তাঁর রচিত নাটক সমূহের কাহিনি পর্যবেক্ষণ করলে বিষয়টির যথার্থতা প্রতীয়মান হয়। তাঁর এ ধারার নাটক সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ওরা কদম আলী (১৯৭৯), ওরা আছে বলেই (১৯৮১), রাষ্ট্র বনাম (১৯৯৭), ইবলিশ (১৯৮৩), মানুষ (১৯৯১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই নাটক সমূহে বিবৃত হয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনব্যবস্থা, জীবন ধারণের নানা ঘাত-প্রতিঘাত। তাঁর রচিত নাটকগুলো বিবেকবোধ সম্পন্ন মানবিক মানুষের হৃদয়ে প্রবলভাবে নাড়া দিতে সমর্থ হয়েছে। মূলত তিনি সমাজের শ্রেণি বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়। আলোচ্য প্রবন্ধে ওরা কদম আলী নাটকে নিম্নবর্ণের মানুষের প্রকৃত চিত্র কীভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে তা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন জীবিকা কঠোর ও কষ্টকর। যাদের বেশির ভাগই নিম্ন আয়ের অধিভুক্ত। দিন আয়ে দিনে খাওয়া অর্থাৎ যেদিনের আয় সেই দিনই ব্যয়, যদি সেটা না হয় তবে ভাগ্যে খাবারও জুটে না অধিকাংশ মানুষের। আমরা যদি আমাদের দেশের নিত্যকার পেশাদার মানুষের ধরন প্রত্যক্ষ করি তবে দেখা মেলে বেশিরভাগ মানুষ মাটি কাটছে ফসল ফলানোর নিমিত্ত, কাঁধে বোঝা বইছে, হাতুড়ি পিটিয়ে ইট ভাঙছে কিংবা অনেক মানুষ উচ্চ বিত্তের ময়লার ভাগাড়ে ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্ট থেকে নিজের পরিবারের অন্য সংস্থানের জোগান দিচ্ছে। এই চিত্র বাংলাদেশের সর্বত্র বিরাজমান। তেমনি একটি চিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক মামুনুর রশীদ তাঁর নাটকে অঙ্গীকৃত করেছেন। তিনি তুলে ধরেছেন ঢাকা শহরের সদরঘাটের এক বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনাচার। মামুনুর রশীদ মূলত এসকল নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনের নানা পর্যায় পর্যবেক্ষণ করে রচনা করেছেন নাটক ওরা কদম আলী। ওরা কদম আলী এই 'ওরা' শব্দটির মধ্যে নিহিত হয়েছে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবন কথন। যারা নিম্নবর্ণীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এখানে নিম্নবর্ণ শব্দের আভিধানিক অর্থ নিরুপিত হতে পারে এভাবে- এই শব্দটি ক্ষয়ে যাওয়া কিংবা অবহেলিত একটি জনগোষ্ঠীর আভাসরূপে বিবেচ্য। এই নিম্নবর্ণের প্রকারভেদ সম্পর্কে গবেষক বোরহান বুলবুল চারপ্রকার নিম্নবর্ণের কথা বলেছেন:

১. নৃতাত্ত্বিক নিম্নবর্ণ;
২. ধর্মীয় নিম্নবর্ণ;
৩. সামাজিক নিম্নবর্ণ;
৪. অর্থনৈতিক নিম্নবর্ণ।

* সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বাভাবিকভাবে এই চারপ্রকার শ্রেণি বিভাজন বিষয়ে আলোকপাত করলে দেখা যায় সাধারণত যে সকল জনগোষ্ঠী সমতল কিংবা ভাটি অঞ্চলে কিংবা দুর্গম কোন স্থানে বসবাস করে তাদের নিম্নবর্ণের মানুষ হিসেবে পরিচয় প্রদান করা হয়। আবার ধর্মীয়ভাবে বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, দাস, শূদ্র প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষ বলে বিবেচিত। অন্যদিকে সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন না হয়ে শ্রমজীবী জীবন যারা অতিবাহিত করে তারাই নিম্নবর্ণ। অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল জনগোষ্ঠী ও নিম্নবর্ণের আধারে বিবেচিত। মূলত এই বর্ণ, ধর্ম, সামাজিক পদ মর্যাদা, আর্থিক সচ্ছলতাকে কেন্দ্র করেই নিম্নবর্ণের উত্থান ঘটেছে।

সমাজের অবহেলিত নিম্নবর্ণ নামীয় এই জনগোষ্ঠীর স্বরূপ উন্মোচনে বিশেষ ভূমিকা পালনে ব্রতী হয়েছেন নাট্যকার মামুনুর রশীদ। তাঁর রচিত নাটকে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে সমাজের মানুষ ও মানুষের মানবিক বিপর্যয়ের দিক সমূহ। মূলত মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর নাট্য জগতকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। সেই ধারাতেই মূলত ১৯৭২ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আরণ্যক নাট্যদল। এই নাট্যদলের প্রথম নির্দেশিত নাটক মুনীর চৌধুরীর কালজয়ী রচনা ‘কবর’। দেশাত্মবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বারংবারই মামুনুর রশীদকে তাড়িত করেছে নব সৃজনে। নাট্যকার মামুনুর রশীদ মূলত শ্রেণি বৈষম্য, রাজনৈতিক স্বৈচ্ছাচারিতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও সোচ্চার ছিলেন। এ বিষয়ে জানা যায়: “সামরিক শাসনামলে যখন কোন রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক দল সাহস পায়নি ‘মে দিবস’ এর তাৎপর্য তুলে ধরতে; তখন আরণ্যক এক মে দিবস পালন করেছে” (গোস্বামী ৫৭)। মামুনুর রশীদ বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের দীর্ঘ ইতিহাসের সুযোগ্য ও নিষ্ঠীক পথযাত্রী। থিয়েটারের সুদীর্ঘ চর্চা ও অভিজ্ঞতার আলোকে নাট্যনির্দেশক নাসির উদ্দীন ইউসুফ বলেছেন: “মামুন ভাইকে আমি বলি নিঃসঙ্গ পথিক, শুরু থেকে যে আদর্শ নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, এখনো সেই আদর্শে অবিচল আছেন। তিনি কখনো আপস করেননি। স্বৈরশাসক এরশাদের দেওয়া বাংলা একাডেমি পুরস্কার তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন” (বাচ্চু ৭)।

বাংলা নাট্য সাহিত্য ভাণ্ডারে মামুনুর রশীদ ভিন্নমাত্রিক নাটকের উপাদান ও বিষয়ে কেবল নতুনত্ব আনয়ন করেননি, তিনি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী নাট্যচর্চার ধারাকে বেগবান ও নিরীক্ষাধর্মী নাটক উপস্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল শাসন ও শোষণের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে তিনি শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার পরিমণ্ডলে বিস্তৃত করেছেন গ্রাম, মহল্লায় এমনকি পথ নাটক প্রদর্শনীর মাধ্যমে। এই ধারায় মামুনুর রশীদ পথ নাটকের যাত্রা শুরু করেন। এ বিষয়ে জানা যায় ড. তাঁর এই চেষ্টার ফসল হিসেবে ‘আরণ্যক’ ১৯৮৩ সালে মান্নান হীরা রচিত ‘ক্ষুদ্রিরামের দেশে’ অভিনয়ের মধ্যদিয়ে ৭ম নাটকের যাত্রা শুরু করে। এছাড়াও সংগ্রামী নাট্যকার মামুনুর রশীদ উপস্থাপন করেন ওরা কদম আলী, মে দিবস (১৯৮৫), শেকল (মান্নান হীরা) আইজল সখিনার পালা (আব্দুল্লাহেল মাহমুদ, ১৯৯২) প্রভৃতি পথ নাটক। যা তাঁর নাট্যদল ‘আরণ্যক’ কর্তৃক প্রদর্শিত হয়। তাঁর এই নাটকসমূহে প্রবলভাবে তুলে ধরা হয়েছে রাজনীতির অসম সমন্বয়, সাধারণ জনমানুষের জীবন ও জীবিকার অসম বণ্টন, মানুষের জীবনের নানাবিধ সংকট প্রভৃতি। মামুনুর রশীদকৃত নাটক সেটা হোক রচনা কিংবা উপস্থাপনা তার প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র নানাবিধ সংকটের প্রতিচ্ছবি। মামুনুর রশীদ মূলত মানবতর মানুষের আশার কথা ভাবেন, উত্তরণের পথ দেখেন। তিনি তাঁর রচিত নাটকে কেবলই প্রধানতর করে তুলেছেন নিম্নতর মানুষের জীবনাচার। তাই তো তাঁর নাট্যদল আরণ্যক এই শ্লোগানকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে শিল্পবোধ জগত করছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। মামুনুর রশীদ প্রতিষ্ঠিত আরণ্যক নাট্যদল, যাদের শ্লোগান- ‘নাটক শুধু বিনোদন নয়। শ্রেণিসংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার’ (হক ১৯৭)। এই শ্লোগানকে ধারণ করে এগিয়ে চলেছে এবং শ্রেণী সংগ্রামের মূল বিষয় ও বক্তব্য থেকে প্রজন্ম, প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন সমর্থ হয়েছে।

ওরা কদম আলী তেমনি একটি নাটক যেখানে রয়েছে শ্রেণি সংগ্রাম এবং শোষক শ্রেণি থেকে পরিদ্রাণের তীব্র প্রতিবাদ। মূলত ঢাকায় অবস্থিত বুড়িগঙ্গা নদীপাড়ের বসবাসরত মানুষের নিঃশব্দ বঞ্চনার কাহিনি। নাটকটির চরিত্রসমূহ নিঃসাড়, নিস্তব্দ, আত্মাভিমান যেন সমগ্র নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে। আর এই চরিত্র নির্মাণে নাট্যকার বোবা কদম আলীকে সকল বঞ্চনার প্রতীক রূপে গ্রাহ্য করছেন। মামুনুর রশীদ টেলিভিশন ও মঞ্চনাটকে নাট্যকার হিসেবে সফলতার সাক্ষর রেখেছেন। তিনি একজন নন্দিত মঞ্চ অভিনেতাও বটে। বাংলা নাটক সমূহকে জীবনের মূল স্রোতে অঙ্গীকৃত করার অভিপ্রায়ে তিনি বলেছেন: “নাটক হোক কল্যাণের জন্য, নাটক হোক সুন্দরের জন্য। সমাজ ভাবনা ও শিল্পচেতনা দুইয়ের সমন্বয় সাধনের মধ্যদিয়ে সামগ্রিকভাবে নাট্যচর্চাকে আমরা অর্থবহ করে তুলতে চাই” (নাহার ৫১)।

ওরা কদম আলী জার্মান ভাষায় অভিনীত ও অনূদিত। অভিনেতাও ছিলেন জার্মান ভাষাভাষী, ওরা কদম আলী নাটকটির মূল উপজীব্য বাংলার সাধারণ মানুষের চলমান জীবনের নানামাত্রিক কাহিনি। নাটকটির শুরু হয় একজন সন্তানসম্ভবা নারীর প্রসবকালীন মর্মযন্ত্রণাকে কেন্দ্র করে। যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের অব্যবস্থাপনায় কিংবা শ্রেণি বৈষম্যের কারণে অনাগত সন্তান এবং মায়ের মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনাকে ছাপিয়ে একে একে আবিস্কৃত হয় নানা চরিত্র। এ ধরনের চরিত্র সমূহের মধ্যদিয়ে আলাদা আলাদা মানুষের জীবন চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। নাটকে আঠারটির অধিক চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়। প্রত্যেক চরিত্রের ভিন্নার্থক জীবন কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। নাট্য কাহিনিতে পরিদৃষ্ট হয় একটি জনপদে বসবাসকারী মানুষের কথা, যারা নিত্যকার জীবন ধারণের প্রয়োজনে প্রায়শই অভিমুখী হয় এই জীবন তরীর ঘাটে। সেখানে উপস্থিত চরিত্র সমূহের মধ্যে রয়েছে ড় বিক্ষুব্ধ হকার, হরেক রকম জিনিস বিক্রেতা, বই বিক্রেতা, চায়ের দোকান, পানি সরবারহকারী প্রমুখ। নাটকের অন্যতম চরিত্র 'কদম আলী' ও তাজু, মূলত কদম আলী ও তাজুর মধ্যদিয়ে নাট্যে সকল শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আহ্বান ধ্বনিত হয়। নাট্যে যে সংকটসমূহ বিবৃত হয় তা হলো শোষক শ্রেণি পুলিশের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সন্তান সম্ভবা নারীর সন্তানসহ মৃত্যু। অন্যদিকে রাবেয়া চরিত্রটি নানা প্রতিকূল পরিবেশ উপেক্ষা করে সে একজন নারী হিসেবে নিজেকে সমাজে টিকিয়ে রাখবার প্রাণান্তর চেষ্টা করে। এছাড়াও নাটকে বর্ণিত হয়েছে চাঁদাবাজ ইন্সপেক্টর ও পুলিশের কর্তা-ব্যক্তিদের দুঃসাহসের চিত্র।

প্রকৃতপক্ষে সত্তর দশকে রচিত ওরা কদম আলী নাটকে প্রতিফলিত হয় সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার দুর্বিষহ চিত্র। নাটকের শুরুতে সদর পরিলক্ষিত হয় সদর ঘাটের বাস্তব চিত্র ও ঘাটে বিচিত্র পেশার মানুষের আগমন। প্রত্যেক চরিত্রের সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর রূপধারণ করে। মূলত এই সদরঘাটের দৈনন্দিন চিত্রে এমন কিছু মানুষের সন্ধান মেলে যাদের আবাসস্থল খোলা আকাশের নিচে। মাথার উপর নেই কোনো আচ্ছাদন, রোদ, বৃষ্টি, ঝড় উপেক্ষা করে রাত দিনের আবর্তে ঘুরতে থাকে দিন, মাস কিংবা বছর। যখন কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সম্মুখীন হয় কিংবা গুটিকতক মানুষকে চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে তখন অজানা, অনামা বাসস্থানের উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। ওরা কদম আলী নাট্য কাহিনির স্তরে স্তরে বর্ণিত হয়েছে মানুষের সংগ্রামী জীবনকথা। নাট্যে বর্ণিত মলমওয়ালা ক্ষুধা নিবৃত্তির পূর্বে মলম বিক্রির তোড়জোড় শুরু করে সে বলে:

মলমওয়ালা: আমার বন্ধু, আপনার বন্ধু, আমাদের সকলের বন্ধু পাঁচশ সাত নম্বর আশ্চর্য মলম। তুফান এ্যাণ্ড কোম্পানীর নব্য আবিস্কৃত এই ধন্বন্তরী ব্যবহারে হান্ড্রেড পারসেন্ট কিওর। বিফলে মূল্য ফেরত ইন ক্যাশ। আছেন ভাই কেউ? (রশীদ ৭৬৫)।

এই মলম বিক্রি সমকালীন একটি পেশা যা এখনো দৃষ্টিভূত হয়। কোনো রকম মলম বিক্রির আয়ে দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের হিসাব মেলাতে গিয়ে পরিবারকে হিমশিম খেতে হয় কিংবা সাধারণ নুন-ভাতের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। অন্যদিকে নাট্যে উদ্ভাসিত রাবেয়া চরিত্রটি কলসি কাঁখে পানি সরবরাহের কাজ করছে বিভিন্ন দোকানে। তার নেই সাজানো ঘর নিকানো উঠান। রাতের আঁধারে পুরুষের পৌরুষের থাবা থেকে প্রতিনিয়ত নিজেকে আগলে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা। আমাদের এই সামাজিক ব্যবস্থায় নারী সর্বক্ষেত্রে অবজ্ঞার সাথে সমাজে টিকে থাকবার অবিরাম সংগ্রাম করে চলছে। এখানে রাবেয়া যেন সমগ্র নারীর প্রতিনিধিত্ব করছে। রাবেয়ার দৈনন্দিন জীবনধারণের একমাত্র উৎস দোকানে কলসি দিয়ে পানি সরবরাহ। তাতেই দেখা যায় পারিশ্রমিকের হিসাব মেলাতে গিয়ে শুনতে হয় নানা কটু কথা কিংবা অশালীন ইঙ্গিত। রাবেয়া এই ঘাটে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে রাখতে প্রতিনিয়ত তর্কযুদ্ধে নিজেকে জয়ী করবার চেষ্টা করে, উক্ত সংলাপে তাই প্রতিফলিত হয়েছে:

রাবেয়া: হুনছ তোমরা? হুন। ঘাটের পয়সায় কেউ দুই পাই কম দিলে যে ব্যাপারী হার্টফেল করে সাতকার হে আমারে দিবো ঠিলায় আট আনা কইরা। কিন্তু হুন ব্যাপারী, রাবেয়া পয়সা কামাই করে গতর খাটাইয়া, পরিশ্রম কইরা, ইজ্জত খাটাইয়া না (রশীদ ৭৬৭)।

রাবেয়ার প্রতি সর্দারের দুর্বলতাকে প্রশ্ন দেয় না রাবেয়া, তাইতো মাতাল সর্দার ঘুমঘোরে থাকা রাবেয়ার মাথায় স্পর্শ করলেই ক্ষীণ রাবেয়া সর্দারকে বলে:

রাবেয়া: কিন্তু কেন তুই আমার শরীরে হাত দিছস?

সর্দার: দিমু না কেন? তুইও আমার মতই ঘাটের বেওয়ারিশ মাল। (থেমে) হাছা কইছি না? (রশীদ ৭৬৮)

স্বামী ও সন্তানহীন রাবেয়া মূলত তাজু ও কদম আলীকে স্নেহ ও ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখতে তৎপর। তাজুকে স্থায়ী সন্তান জ্ঞান করে বুকের চাপা কান্না থামাতে চেয়েছিলো। কিন্তু সেখানেও ঘাটের কিছু মানুষের হিসাব নিকাশের খাতায় চলে যায় তাজু। তারা ভালোবাসায় নয় তাজুকে শিশুশ্রমের আশায় ভাগাভাগির পাল্লায় মাপতে থাকে, নায়েব আলীর সংলাপে সেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

নায়েব আলী: কেলা, উই পোলা রাখবো কেলা? আমার ঘর নাই, বাড়ী নাই? আমার ঘাটের বেবাক বেওয়ারিশ মাল আমার। উই নিবো কেলা? (রশীদ ৭৬৮-৭৬৯)।

একদিন গভীর রাতে সন্তানতুল্য তাজুকে ঘুম পাড়ানিয়া গানে ঘুম আর স্বপ্নের বিভোরতায় হঠাৎ সর্দারের আগমনে অসহায় হয়ে ওঠে রাবেয়া, সর্দারের অশালীন আচরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাইলে সর্দার বলে: “নেশা করছি নেশা। নেশা না করলে যে তর নেশা ছাড়ন যায় না। তুই আমার নেশা হারামজাদী, তুই আমার নেশা” (রশীদ, ৭৭৫)। রাবেয়া সমাজের অধিকাংশ মানুষের হিংস্র থাবা থেকে বাঁচতে চায়। তাই সে কদম আলী ও তাজুকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্নে নিমগ্ন হয়। মাতৃসম রাবেয়ার হৃদয়ের গহীনে বপিত স্বপ্ন পূর্ণ করতে হঠাৎ ক্ষুদার্থ তাজু খাবার খেতে অস্বীকৃতি জানিয়ে অভিমান বশত বলে:

তাজু: না, খামু না।

(কদম আলী জানতে চায়, কেন?) তাইলে এই রাস্তা ছাইড়া একটা ঘর ন্যাও। হেই ঘরে আমরা তিনজন থাকুম।

(কদম আলী জানতে চায়, কি ব্যাপার?) আমি, তুমি আর হে (রশীদ ৭৮৫)।

মামুনুর রশীদকৃত ওরা কদম আলী: নিম্নবর্ণের মানুষের উত্থান

সকল বঞ্চনা ভালোবাসার স্পন্দন কদমের প্রতি রাবেয়ার। কদমের সততা, দায়িত্ববোধ রাবেয়াকে উদাসী করে তোলে। সে যেন সকল কিছু উপেক্ষা করে মনমাঝি কদমের বৈঠা হাতে চলতে চায়। তাইতো রাবেয়া গায়নের সাথে গান ধরে-

মাঝি চলরে উজান বাইয়া, মাঝি চলরে উজান বাইয়া,

বেগে ছোটো পিছু না হটো সামনের দিকে চাইয়া

মাঝি চলরে উজান বাইয়া।।

ঐ দ্যাখা যায় আমার আলো, আগে চলো আগে চলো ও

ও জীর্ণ আবর্জনাগুলো ফুতকারে দাও উড়াইয়া

মাঝি চলরে উজান বাইয়া। (রশীদ, ৭৮৮)।

সেই থেকে রাবেয়া কদম আলীর ছায়ায় আবছায় ভালবাসায় অনুভবের সঙ্গী হয়ে আছে। রাবেয়া কদম আলীর সাথে ঘর বাধার স্বপ্নে যখন স্নীত হেসে ওঠে তখন বুকটা অজানা আশঙ্কায় কাঁপে। কারণ রাবেয়ার পূর্বের বিবাহে তার কপালে সুখ সহ্য হয়নি। আজ সে স্বামী, সন্তানহীন, গৃহছাড়া নারী হিসেবে সমাজে ধিকৃত। শুধু তা নয় স্বামীহীন নারী যখন পরপুরুষের লোলুপতার শিকার হয় তখন আত্মসম্মান ও সম্মম রক্ষার্থে হয়ে ওঠে বেপরোয়া ত্রুন্ধ, এর ফলে স্বার্থান্বেষী পুরুষ ভয় পেয়ে পিছু হটে। আসলে একটি নারীকে সমাজে ন্যূন্যতম খাদ্য ও বাসস্থান ও সংস্থানের নিমিত্ত একগুঁয়ে ও রুঢ় হতে হয়। অন্তত কতিপয় মানুষ ভয় পেয়ে কাছে যেতে চায় না। রাবেয়া তেমনি ত্রুন্ধ ও বেপরোয়া ভঙ্গিতে ঘাটের ব্যাপারী, রমিজুদ্দি, আব্দুল্লাহ মনসুর সকলের প্রতি এভাবে তার মনোভাব ব্যক্ত করে:

রাবেয়া: হুন্তে অইবো তর- আমারে তরা পাগল বানাইয়া দিছস। দিনের পর দিন রাইতের পর রাইত- এই ঘাটের ঐ হারামখোর ব্যাপারী, রমিজুদ্দীন, আব্দুল্লাহ, মনসুর, তুই তরা সবাই গাঙ্গের পানির মত বানাইছস আমাগো জান, আমাগো ইজ্জত- আর- (রশীদ ৭৯০-৭৯১)

মামুনুর রশীদকৃত প্রতিবাদী চেতনার নাটক ওরা কদম আলী নিপীড়িত, লাঞ্ছিত-বঞ্চিত মানুষের জীবনকথা। যেখানে নিপীড়নকারীর সংখ্যা অজস্র। আর প্রতিবাদ করছে শুধুমাত্র বোবা কদম আলী, রাবেয়া ও তাজু। বোবা কদম আলী সংলাপবিহীন মুখাবয়বের অভিব্যক্তি শারীরিক বলিষ্ঠতা ও চলন কদম আলী চরিত্রের প্রতিবাদী ভূমিকা প্রবলতর হয়ে ওঠে। নিম্নোক্ত সংলাপে তা উপলব্ধি হয়:

সারেং: তাইলে লন আমার লগে। [সর্দার ও সারেং বেরিয়ে যায়। কদম আলী উত্তেজিত হয়ে রাবেয়াকে আবারও মারতে এগোয়। বাধা দেয় আলীমুদ্দি। কদম আলী বোঝায়, সে রাবেয়াকে খুন করে ফেলবে।]

আলীমুদ্দি: ঠিক আছে, ঠিক আছে খুন করিস। আগে তাজুকে পাইয়া লই। (কদম আলী তবু উত্তেজিত।) ঠিক আছে, সর্দার তো গেছেই তাজুরে আনতে (রশীদ ৭৮৮)।

ওরা কদম আলী নাটকের চরিত্র সমূহ বিভাজিত করলে দেখা যায় নাট্য চরিত্র সমূহের মধ্যে রয়েছে আমাদের আবহমান বাংলার সাধারণ মানুষ। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডা বিক্রেতা, বই বিক্রেতা, হাড়ি পাতিল বিক্রেতা, পানি সরবরাহকারী, মলম বিক্রেতা, কুলি, সারেং, সিগারেট ও পান বিক্রেতা, তৈজসপত্র খেলনা বিশেষ বিক্রেতা

প্রভৃতি চরিত্র একেবারে খেটে খাওয়া মানুষ। যারা সারাদিনে উপার্জিত অর্থে সংসার চালায়। কেউ ঘর সংসারহীন ঘাটে বিন্দ্রায় রাত্রিযাপন করে। অন্যদিকে সর্দার, ইন্সপেক্টর, আলীমুদ্দি, মনসুর, আব্দুল্লাহ, কলিমুদ্দি, রমজান, পুলিশ এরা শাসক শ্রেণি। সমাজের যারা খেটে দুবেলা খেয়ে বাঁচতে চায় তাদের শোষণ করে। অত্যাচারে ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ নাট্যের সকল চরিত্রই নাটকের শেষে প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কদম আলী ও রাবেয়া চরিত্রের নেতৃত্বে শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে সমাজের চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। নাট্যের শেষান্তে সবার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়-“আমরা কদম আলী”। রাষ্ট্রীয় শাসক শ্রেণি নিরপরাধ কদমকে আসামী চিহ্নিত করে শাস্তির জন্য ধরে নিতে আসলে ইন্সপেক্টর বলে:

ইন্সপেক্টর : একটিও যেন পালাতে না পারে। কদম আলী কে?

সর্দার : আমি কদম আলী।

আলীমুদ্দি : আমি কদম আলী।

সারেং : আঁই কদম আলী।

রাবেয়া : আমি কদম আলী।

ইন্সপেক্টর : ননসেন্স, হু ইজ কদম আলী?

সবাই : আমরা কদম আলী। (রশিদ ৭৯০)

আমাদের দেশের বলিষ্ঠ নাট্যকারদের মধ্যে মামুনুর রশীদ অন্যতম সমাজ সচেতন নাট্যকার। তাঁর নাটকের মূল উপজীব্য শ্রেণি সংগ্রাম। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

মামুনুর রশীদ আমাদের বিবেচনায় সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সমাজ সচেতন। তাঁর নাটকে শ্রেণিসংগ্রাম বার বার ফিরে এসেছে। তাঁর প্রথম আলোচিত নাটক ওরা কদম আলী। এটিও বাংলাদেশে বহুল অভিনীত। ওরা কদম আলী-র পর মামুনুর রশীদ রচনা করেছেন ‘ওরা আছে বলেই’, ‘ইবলিশ’, ‘এখানে নোঙর’, ‘গিনিপিগ’। তাঁর প্রায় সব নাটকেই সামাজিক শোষণ এবং সম্মিলিত প্রতিরোধ এবং সবশেষে বিজয়ের প্রতিধ্বনি বিবৃত হয়েছে। শোষিতকে অধিকার সচেতন করতে তাঁর নাটক একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। থামের চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর নৈপুণ্য ঈর্ষণীয়।

মামুনুর রশীদেদের নাটকে প্রতিফলিত হয়-

১. রাজনৈতিক সচেতনতা
২. সমাজ সচেতনতা
৩. শ্রেণি সচেতনতা
৪. শোষক ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
৫. রাষ্ট্রের অসামঞ্জস্যতা

৬. নিম্ন শ্রেণির জীবনাচার
৭. বাঙালির মানবিক জীবন সঙ্কটের চিত্র
৮. জীবনবোধ
৯. শিল্পচেতনা
১০. মুক্তিযুদ্ধ

মামুনুর রশীদদের ওরা কদম আলী মঞ্চ ও শিল্প সফল নাটক। তিনি নিপুণতর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের বাস্তবধর্মী জীবনকে শিল্পিতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। নাটকটি প্রায় ১৮ টি চরিত্র ও চারটি দৃশ্য ও একটি দৃশ্যান্তর পর্বে বিভাজিত।

বাঙালি জীবনাচারের প্রেক্ষাপটে রাত্রি থেকে ভোর আসে সূর্যালোকের বিচ্ছুরণে। যেমনটি রয়েছে নাটক শুরুর প্রথম দৃশ্যে: “সময় সকাল বেলা। ঠিক সূর্য উঠবার আগের মুহূর্ত। কুলীদের চীৎকার। লোকজনের চীৎকার। লঞ্চের ভেঁপু শোনা যায় – ঘাটে ভিড়বার আগে যেমন বাজে...। নাট্যকার অত্যন্ত সুকৌশলে একটি সদর ঘাটের বাস্তব চিত্রকল্প তুলে ধরেছেন এবং চরিত্র সমূহের যে চলন বলন তাতে নিম্নবর্ণের উপস্থিতি সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়েছে। সদর ঘাটের ঘাট পারাপারের টাকা সংগ্রহ বেচা-কেনা, চরিত্রসমূহে রাত্রিযাপনের নানা চিত্র, চাঁদার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্ব, অবশেষে পিতা-মাতা হারা তাজুকে নিয়ে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর টানা হেঁচড়া, মদ্যপায়ী সর্দারের অশালীন আচরণ নাটকটিকে নিম্নবর্ণের মানুষের জীবন বোধের কিংবা জীবনাচারের কাছাকাছি নিয়ে যায়।

নাটকে রাবেয়া সন্ত্রম বাঁচাতে ধারালো অস্ত্রে নায়েব আলী ব্যাপারীর কান কেটে ফেলে। ছোট চরিত্র তাজুর মধ্যে মানবতা, সত্যতা, বীজ বুনতে সক্ষম হয় কদম আলী ও রাবেয়া। তাইতো সদরঘাটের শাসক ও শোষক শ্রেণি নানা বিরূপাচরণ তাকে প্রভাবিত করেনি। তাজু যে কোন পরিস্থিতিতে রাবেয়া ও কদম আলীকে আঁকড়ে ধরেছিল। শেষাবধি গুম ও খুনের মুখোমুখি হয়ে ফিরে যায় তার পিতার নিকট। নাট্য চরিত্র সমূহের মধ্যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের যে ভাষা তা পাঠক ও দর্শককে সত্যিই প্রতিবাদী হবার আহ্বান করে।

মামুনুর রশীদ ওরা কদম আলী নাটকে প্রধানত নিম্নশ্রেণির ছিন্নমূল ও ভাসমান মানুষের জীবনসংগ্রামের কষ্ট ও ক্লান্তিকর জীবনযুদ্ধের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। মূলত এই নাট্যঘটনা শাসক ও শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে কিংবা অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য উজ্জীবিত করে। এই নাটকে দেখা যায় নিম্নবর্ণ ও নিচুতলার মানুষের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সমুল্লত রাখতে ঢাকার আঞ্চলিক ভাষাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এতে করে নাট্যসংলাপে চরিত্রসমূহ আরও সুদৃঢ় ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছে। শুধু তা নয় নাট্য সংলাপ প্রক্ষেপণ নাটকের যথার্থতা তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে। যার মাধ্যমে নিম্ন শ্রেণির মানুষের চলন, বলন, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা এবং নাট্য কাহিনির প্রবাহমানতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে একথা যুক্তিযুক্ত।

তথ্যসূত্র

- বুলবুল বোরহান। বাংলাদেশের নাটকে নিম্নবর্ণ (২০১৪)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- হক, ড. মোঃ জাকিরুল। দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা (১৯৪৩-১৯৯০)। বাংলা একাডেমী, ২০০৭।
- রশীদ, মামুনুর। শতবর্ষের নাটক (সম্পাদিত ১ম খণ্ড)। বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।
- বাচ্চু, নাসির উদ্দিন ইউসুফ। ২০১৬, 'মামুনুর রশীদ আমাদের উৎপল দত্ত মামুনুর রশীদ সম্পর্কে নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু'র সাক্ষাৎকার, জাগো নিউজ২৪.কম, ২৪ এপ্রিল ২০১৬, বিনোদন।
- গোস্বামী, আশিস [সম্পা]। আরণ্যক একটি দলের নাট্যকথা। মধ্যমা, ২০০১।

ভাসের ত্রয়ীনাট্যকৃতিতে বিধৃত সমাজব্যবস্থা

ড. লিটন মিত্র *

প্রতিপাদ্যসার: বর্তমান সময়ে আমরা যে সমাজে বসবাস করছি তা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। কালের শ্রোতে প্রবাহিত হয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে। এই সময়ে এসে হাজার হাজার বছর পূর্বের সমাজ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা সত্যিকার অর্থেই দুরূহ কাজ। তবে সাহিত্য একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যার মাধ্যমে এই দুঃসাধ্য কাজটি সম্ভব হতে পারে। সংস্কৃত নাট্যাঙ্গনে ভাস এক অনন্য নাট্যকার যিনি তেরোটি রূপকের স্রষ্টা। অন্য কোনো লেখকের এত রচনা নেই। কেবল সংখ্যার দিক দিয়ে নয়; তিনি বিভিন্ন শ্রেণির রূপক রচনা করায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। তাঁর রচনাসমূহে উঠে এসেছে সেসময়ের লোকায়ত জীবন, সমাজ, রাজনীতি, ধর্মীয় আচারসমূহ, অর্থনীতি সহ প্রভৃতি বিষয়। তাঁর অধিকাংশ রচনার উৎস রামায়ণ বা মহাভারত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনো অলৌকিকত্বের আশ্রয় না নিয়ে নিজস্ব ভঙ্গিমায় সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় নবরূপে প্রকাশ করেছেন নাট্যসমূহ। আলোচ্য প্রবন্ধটি ভাসকৃত স্বপ্নবাসবদন্ত, প্রতিমা ও চারুদত্ত-এই নাট্যত্রয়ীর আলোকে সেসময়কার সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করার ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

সংস্কৃত নাট্যাঙ্গনে ভাস একজন প্রথিতযশা নাট্যকার হিসেবে খ্যাত। সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র কালিদাস যিনি সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বাঙ্গনে বিস্তৃতি লাভ করেছেন, তিনি স্বয়ং তাঁর *মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটকের প্রস্তাবনা অংশে ভাসকে প্রথিতযশা হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন “প্রথিতযশসাং ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধান্ অতিক্রম্য কথং বর্তমানস্য কবেঃ কালিদাসস্য কৃতো বহুমানঃ?” (প্রসূন বসু ২৫৯)। এদিক থেকে ভাসকে কালিদাসের পূর্ববর্তী বলা যায়। কেননা কালিদাস ভাসের নাম উল্লেখ করলেও ভাসের কোনো রচনাতেই কালিদাসের নাম উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রথিতযশা এই নাট্যকার ভাস কেবল নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন বহুকাল। যেমন- রাজশেখর (৯ম শতক) তাঁর *সুক্তিমুক্তাবলী*, দণ্ডী (৭ম শতক) তাঁর *কাব্যাদর্শ*, তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে বা চতুর্থ শতকের গুরু দিকের নাট্যকার কালিদাস তাঁর *মালবিকাগ্নিমিত্র*, বাণভট্ট (খ্রি. ৬ষ্ঠ শতক) তাঁর *হর্ষচরিত*, বাকপতিরাজ (৮ম শতক), জয়দেব (১২শ শতক) তাঁর *প্রসন্নরাঘব* নামক গ্রন্থে ভাসের নাম উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও বামন (৭ম শতক), অভিনবগুপ্ত (১০ম শতক), ভোজদেব (১১শ শতক) সহ আরো অনেকে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। এদিক থেকে বিবেচনা করে ভাসকে দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের নাট্যকার বলা যেতে পারে। অথচ তাঁর রচনার সাথে পরিচয় ঘটে ১৯০৯ সালে।^১ নাট্যকার ভাস মোট তেরোটি রূপক লিখেছেন। রূপকগুলো হচ্ছে- *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ*, *স্বপ্নবাসবদন্ত*, *প্রতিমা*, *অভিষেক*, *চারুদত্ত*, *অবিমারক*, *পঞ্চরাত্র*, *দূতঘটোৎকচ*, *মধ্যমব্যায়োগ*, *কর্ণভার*, *উরুভঙ্গ*, *বালচরিত* ও *দূতবাক্য*। রূপকগুলোর উৎস এবং কাহিনির মধ্যে বৈচিত্র্য নাট্যানুরাগীদের মনকে সহজেই যেমন আন্দোলিত করে, আবার একই সাথে তৎকালীন সমাজব্যবস্থারও একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। একারণে ভাস এবং তাঁর রচনাসমূহ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোচ্য প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে ভাস্কৃত স্বপ্নবাসবদন্ত, প্রতিমা এবং চারুদত্ত- এই তিনটি নাটকের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা। এই রচনাসমূহের কাহিনির উৎস যথাক্রমে গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, বাল্মীকির রামায়ণ এবং কল্পিত বিষয়বস্তু। অথচ ভাস্কর সমুজ্জ্বল প্রতিভায় রূপকসমূহ একদিকে যেমন মৌলিকত্বের স্থান পেয়েছে, তদুপরি পাঠক মনকেও প্রাণিত করেছে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন এ তিনটি রচনার মধ্যে স্বপ্নবাসবদন্ত, প্রতিমা অলঙ্কারশাস্ত্রানুযায়ী উৎকৃষ্ট নাটক হলেও চারুদত্ত প্রকরণ শ্রেণির রূপক। অঙ্কসংখ্যা বিচারে চারুদত্ত-কে নাটক বললেও বিষয়বস্তু নির্বাচন, নায়ক-নায়িকার বৈশিষ্ট্য বিচার করলে প্রকরণ বলাই শ্রেয়। তবে প্রকরণের নিয়ম অনুযায়ী অঙ্ক সংখ্যা এখানে কম। যদিও ভাস তাঁর কেনো রচনাতেই নাট্যশাস্ত্র যথাযথভাবে মেনে চলেন নি। চারুদত্ত নাটকটির ৫৫ টি শ্লোকের মধ্যে ১৩ টি ব্যতীত অন্য সব শ্লোকের সাথে শূদ্রক রচিত মৃচ্ছকটিক প্রকরণের সাথে সাদৃশ্য থাকায় C R Devadhar তাঁর চারুদত্ত নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "the Cārudatta is a mere abridgment of the Mṛcchakatika." (C R Devadhar)। যদিও Belvalkar এ মত সমর্থন করেন নি। বিধৃত সমাজব্যবস্থা আলোচনার পূর্বে রূপকগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা আবশ্যিক। সুতরাং এ আবশ্যিকতার প্রেক্ষিতে নাটকগুলোর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

স্বপ্নবাসবদন্ত নাটকের বিষয়বস্তু:

নাট্যকার ভাস্কৃত এ নাটকটি ছয় অঙ্কবিশিষ্ট। নাটকের শুরুতে অর্থাৎ মগধ রাজকন্যা তপোবনে এসেছেন। সেখানে বৎসরাজ উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ পরিব্রাজক এবং বাসবদত্তা আবন্তিকা বেশ ধারণ করে উপস্থিত ছিলেন। নেপথ্যে কোলাহল শুনে যৌগন্ধরায়ণ কারণ জানতে চাইলে কঞ্চুকী তাঁকে বলেন, মহারাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতী মায়ের সাথে দেখা করতে এসেছেন এবং রাত্রিবেলা তপোবনেই অবস্থান করবেন। 'পদ্মাবতী' নাম শোনা মাত্রই যৌগন্ধরায়ণের পুষ্পকভদ্র নামে প্রভৃতি দৈবজ্ঞদের কথা মনে পড়ে। কেননা পূর্বেই তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মগধ রাজকন্যা বৎসরাজের দ্বিতীয় মহিষী হবেন। আর তাই পদ্মাবতীর প্রতি মন্ত্রীর মনে পরমাত্মীয়তা জন্মে। অন্যদিকে বাসবদত্তাও ভগিনী-স্নেহ অনুভব করেন। এরপর পদ্মাবতী সেখানে উপস্থিত হয়ে সকলের প্রয়োজন অনুযায়ী ইচ্ছা পূরণ করতে চাইলে পরিব্রাজক (মন্ত্রী) বাসবদত্তাকে নিজের ভগিনী পরিচয়ে তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখার প্রার্থনা জানান। অভিজ্ঞ কঞ্চুকী 'ন্যাস' রক্ষা করা দুঃসাধ্য বললেও রাজকন্যা পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিধায় আবন্তিকাকে (বাসবদত্তাকে) নিজের কাছে রাখতে রাজি হলেন। ঠিক এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন এক ব্রহ্মচারী যিনি কিনা লাবাণক গ্রাম থেকে এসেছেন। মন্ত্রী তাঁর আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আরুণি কর্তৃক বৎসরাজ উদয়ন রাজ্য হারিয়ে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী বাসবদত্তা এবং প্রিয়জনদের নিয়ে লাবাণক গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। একদিন রাজা গ্রামের বাইরে মৃগয়ায় গেলে সেই গ্রামের এক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে বাসবদত্তা মারা যান। দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে সেই আশ্রমে মন্ত্রীও পতিত হন এবং মারা যান। এরপর রাজা মৃগয়া থেকে ফিরে এই মৃত্যুসংবাদ শুনে ভীষণ ভেঙ্গে পড়েন; এমনকী হা প্রিয়ে! হা বাসবদত্তে! বলে হাহাকার করতে করতে আশ্রমে ঝাপ দিতে চান। তখন সেনাপতি রুমগ্নান তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখেন এবং দিবারাত্রি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে রাজার সেবা করতে থাকেন। এরপর একসময় রাজাকে নিয়ে রুমগ্নান গ্রাম ছেড়ে চলে যান আর তখন গ্রামও শ্রীহীন হয়ে যায়। একারণে তিনি (ব্রহ্মচারী) বেদ অধ্যয়ন শেষ না করেই গ্রাম ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে তপোবনে এসে হাজির হয়েছেন। ব্রহ্মচারীর মুখ থেকে উদয়নের স্ত্রীর প্রতি এমন ভালোবাসা জেনে একদিকে বাসবদত্তাও যেমন রাজার জন্য আবেগে আপ্ত হন, অন্যদিকে পদ্মাবতীও তাঁর (রাজার) প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন। এরপর প্রথমে ব্রহ্মচারী এবং পরে যৌগন্ধরায়ণও অনুমতি সাপেক্ষে চলে যান। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায়, বাসবদত্তা আর পদ্মাবতী কন্দুকক্রীড়া করছে এমন সময় বাসবদত্তা পদ্মাবতীকে ভাবী মহাসেন-পুত্রবধূ বলে সম্বোধন করলে চোটা জানায় পদ্মাবতী বৎসরাজ উদয়নের গুণে মুগ্ধ তাই তাঁকেই রাজকন্যার পছন্দ। হঠাৎ সেখানে ধাত্রী এসে জানায় রাজা

উদয়ন কোনো এক কাজে রাজা দর্শকের কাছে আসলে তাঁর বংশ, কাল, রূপ, বয়স দেখে পছন্দ করেন। তাই পদ্মাবতী সেই রাজার (উদয়নের) বাগদত্তা হয়েছেন। তৃতীয় অঙ্কে রাজকন্যার বিবাহোৎসবে অন্তঃপুরের সবাই যখন উচ্ছ্বসিত তখন বাসবদত্তা দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে প্রমোদ বনে ক্রন্দনরত আছেন। ঠিক সেসময় চেষ্টা এসে জানায় মহারানি বিবাহের জন্য ‘অবিধবাকরণ’ এবং ‘সপত্নীসংহার’ নামে দুটি মালা গাঁথে দিতে বলেছেন। কিন্তু বাসবদত্তা অবিধবাকরণ নামে মালাটি গাঁথে দিতে রাজি হলে পরেরটি গাঁথতে রাজি হলেন না। চেষ্টাকে বললেন রাজার স্ত্রী তো আগেই মারা গেছেন। তাই সপত্নী সংহারের মালার আর প্রয়োজন নেই। চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়, বিবাহের পরদিন পদ্মাবতী তাঁর পরিজনসহ বাসবদত্তাকে নিয়ে প্রমোদ বনে গেছেন। তখন পদ্মাবতীর কাছে স্বামী প্রিয় হয়েছেন কিনা বাসবদত্তা জানতে চান। উত্তরে তিনি জানান স্বামীর বিরহে তাঁরও কষ্ট হয়। তিনি মনে করেন বাসবদত্তার গুণাবলি মনে করে রাজা এখনও কষ্ট পান। একথা শুনে বাসবদত্তা নিজেকে ধন্য মনে করেন। হঠাৎ সেখানে বিদূষক ও রাজার প্রবেশ ঘটে। হাঁটতে হাঁটতে যখন দুজনে মাধবীমণ্ডপে যাচ্ছিলেন, তখন পদ্মাবতীসহ সকলে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে চেষ্টা ভ্রমর বসা লতাটিকে একটু কাঁপিয়ে দিলেন। এতে ভ্রমরের আক্রমণ দেখে রাজা উদয়ন আর সামনে না গিয়ে সেখানে প্রস্তরখণ্ডে উপবিষ্ট হয়ে দুজনে গল্প আরম্ভ করেন। বিদূষক জানতে চান, কে তাঁর কাছে বেশি প্রিয়— বাসবদত্তা না পদ্মাবতী? উদয়ন প্রথমে উত্তর দিতে না চাইলেও বিদূষকের অনেক অনুরোধের পর বলেন, পদ্মাবতী যদিও রূপ, শীল ও মাধুর্যে আমার অত্যন্ত আদরণীয়, কিন্তু বাসবদত্তায় আবদ্ধ তাঁর মনটি হরণ করতে পারে নি। “পদ্মাবতী বহুমতা মম যদিও রূপশীলমাধুর্যে। বাসবদত্তাবদ্ধং ন তু তাবন্মো মনো হরতি।” (শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৪: ৪/৪)। একথা আড়াল থেকে শুনে বাসবদত্তা অনুভব করলেন— এ যেন তাঁর আত্মত্যাগেরই স্বীকৃতি। পঞ্চম অঙ্কে পদ্মিনীকা ও মধুকরিকার কথোপকথনে জানা যায়, একদিন পদ্মাবতী শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাচ্ছেন আর তাই বাসবদত্তাকে খুঁজতে বের হন মধুকরিকা। পদ্মাবতীর শয্যা সমুদ্রগৃহে করা হয়েছে। অন্যদিকে বিদূষকও রাজাকে এখনও দিয়ে সমুদ্রগৃহে নিয়ে আসেন। তবে তখনও পদ্মাবতী আসেন নি। এরপর সেখানে বিদূষক গল্প শুরু করলে উদয়ন সমুদ্রগৃহের শয্যায় শুয়ে শুনতে শুনতে একপর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তখন বিদূষক চলে যান। এর কিছুক্ষণ পর সেখানে বাসবদত্তা আসেন। দীপের আলো অল্প থাকায় ভিতরে ঢুকে তিনি পদ্মাবতী শুয়ে আছেন ভেবে তাঁর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়েন। হঠাৎ উদয়ন ঘুমের মধ্যে হা বাসবদত্তে বলে ডেকে ওঠেন। প্রথমে বাসবদত্তা শিউরে উঠলেও পরে কিছুটা সময় তাঁর প্রিয়তম স্বামীর পাশে থাকার লোভ পেয়ে বসে। কিন্তু ধরা পরার ভয়ে তিনি দৌড়ে চলে যান, আর উদয়ন বাসবদত্তাকে দৌড়ে গিয়ে ধরতে গিয়ে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। বিদূষক ঘরে ঢুকতেই উদয়ন বলেন, তিনি বাসবদত্তা জীবিত আছেন। বিদূষক এটা যে স্বপ্ন ছিল বোঝাতে চাইলে রাজা বলেন— এটা সত্যি না স্বপ্ন বুঝতে পারলেও পূর্বে বাসবদত্তা পাশে থাকলে যেমন লাগত ঠিক যেন তেমনই লাগছে বলে জানান। এমন সময় আরুণির বিরুদ্ধে অভিযানের সময় এসেছে বলে জানান হয়। ষষ্ঠ অঙ্কে মিশ্র বিষ্ণুকে কঞ্চুকী আর প্রতিহারী (বিজয়া)-র কথোপকথনে জানা যায়, বৎসরাজ্য ফিরে পেয়েছেন রাজা উদয়ন। এ উপলক্ষে মহাসেন ও অঙ্গারবতী কঞ্চুকী ও ধাত্রী বসুন্ধরাকে প্রেরণ করেন রাজা উদয়ন ও বাসবদত্তার একটি চিত্রফলক দিয়ে। ধাত্রী উদয়নের হাতে ছবিটি দিয়ে বলেন, তিনি বাসবদত্তাকে উজ্জয়িনী নগর থেকে হরণ করে নিয়ে আসলে মহারাজ আর রাণী মা এই ছবিটি দিয়েই সামাজিকভাবে বিবাহের কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। আর আজ বাসবদত্তার প্রতি দুঃখ লাঘবের জন্য এটি পাঠিয়েছেন। রাজার পাশে উপবিষ্ট পদ্মাবতী ছবিটি দেখে চিনতে পেরে রাজাকে সব কথা বলেন। এমন সময় একদিকে পরিব্রাজক বেশে যৌগন্ধরায়ণ এবং অন্তঃপুর থেকে আবন্তিকা বেশে বাসবদত্তা উপস্থিত হলেন। রাজা দেখে দুজনকেই চিনতে পারলেন। মন্ত্রী এমন কাজ না করলে আরুণিকে পরাস্ত করা সম্ভব হতো না বলে জানান এবং সব পরিকল্পনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সকলের সুখের মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিমা নাটকের বিষয়বস্তু:

সাত অঙ্কবিশিষ্ট এ নাটকের শুরুতে প্রতিহারী কাঞ্চুকীয়কে জানায় মহারাজ দশরথের আদেশে দাশরথি রামের রাজ্যাভিষেক হবে। তাই মঙ্গলানুষ্ঠানের আয়োজন শুরু হয়। অন্যদিকে অন্তঃপুরে সীতা পরিচারিকার কাছ থেকে বঙ্কল নিয়ে কৌতূহলবশত পরিধান করে দেখছেন তাঁকে কেমন মানায় দেখার জন্য। ঠিক সেসময় একজন চেটী এসে জানায় অভিষেক অনুষ্ঠানের পটহ একবার ধ্বনিত হয়ে থেমে গেছে। এরই মধ্যে সেখানে রাম স্বয়ং উপস্থিত হন এবং সীতাকে জানান তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানকালে মন্দির এসে পিতার কানে কিছু কথা বলেন। এরপর দশরথ দুঃসহ কষ্ট নিয়ে কৈকেয়ীর ইচ্ছানুসারে রামের অভিষেক বন্ধ করে চৌদো বছরের জন্য বনবাস আর ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির আদেশ দেন। রাম বনে যাওয়ার জন্য রঙ্গশালা থেকে বঙ্কল চেয়ে নেন। কিন্তু প্রথমে সীতা এবং এরপর লক্ষ্মণও অন্তঃপুরে উপস্থিত হয়ে রামের সঙ্গে বনে যেতে চান। রামের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। যাওয়ার পূর্বে অযোধ্যাবাসীদের সামনে রামের আদেশে সীতা অবগুষ্ঠন খুলে মুখদর্শন করান। এরপর তাঁরা তিনজন একত্রে যাত্রা শুরু করেন। দ্বিতীয় অঙ্কে রাম বনে যাওয়ায় অযোধ্যা যেন শূন্যতায় ভাসতে থাকে। মহারাজও শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। কাঞ্চুকীয় সমুদ্রগৃহে অসুস্থ দশরথকে যখন সুমন্ত্রের আশ্রম থেকে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ ব্যতীত শূন্য রথ নিয়ে ফিরে আসার কথা জানান তখন রাজা তাঁদের স্পর্শ পাবার জন্য ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর পিতৃপুরুষদের (রাজা দিলীপ, রঘু ও অজ) দেখতে পান। এর কিছুকাল পরেই তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন এবং লোকান্তরিত হন। তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায় ভরত মাতুলগৃহ থেকে অযোধ্যায় ফেরার পথে বিশ্রামের উদ্দেশে এক মন্দির দেখে রথ থামান। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করে দেখেন, সেখানে শিল্পনৈপুণ্যে পূর্ণ কিছু মূর্তি। দেবতা ভেবে প্রণাম করতে যাবেন, এমন সময় দেবকুলিক উপস্থিত হন এবং প্রণাম করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি জানান মূর্তিগুলো ক্ষত্রিয়দের, দেবতাদের নয়; তাই কোনো ব্রাহ্মণ যেন ভুল করে দেবতা ভেবে প্রণাম না করেন, একারণে নিষেধ করেছেন। অবশেষে ভরত তাঁর কাছ থেকে আরো জানেন যে, মূর্তিগুলো ইক্ষ্বাকুবংশের— যাঁরা সকলেই অযোধ্যার রাজা ছিলেন। তিনি তখন শ্রদ্ধাভরে একে একে প্রণাম করলেন— রাজা দিলীপ, রঘু ও অজকে। কিন্তু এরপরই দেখলেন রাজা দশরথের মূর্তি। জীবিত জনের মূর্তি রাখা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে দেবকুলিক জানান তিনি দেহরক্ষা অর্থাৎ মারা গেছেন। ভরত আরো শুনলেন পত্নী (কৈকেয়ী)—র পণ রক্ষা করতে গিয়ে রামকে চৌদো বছরের জন্য বনে পাঠিয়েছেন, সঙ্গে সীতা ও লক্ষ্মণও গেছেন। আর এ শোক সহিতে না পেরে রাজা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এসব কথা জেনে ভরত রাজ্যে ফিরে মাতা কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করলেন এবং সুমন্ত্রকে নিয়ে তখনই রামের সন্ধানে যেতে চাইলেন। চতুর্থ অঙ্কে প্রবেশক অংশে বিজয়া এবং নন্দিনিকার আলাপে জানা যায়, মন্ত্রীরা ভরতের অভিষেকের সমগ্রী আনলেও ভরত সবকিছু উপেক্ষা করে রাম যে তপোবনে আছেন সেখানে চলে গেছেন। এরপর ভরত ও সুমন্ত্র রামের সঙ্গে দেখা করেন। ভরত রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিতে চাইলেও রাম পিত্রাদেশ পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়ায় বনেই থেকে যান। সীতা ও লক্ষ্মণও ভরতকে সমবেদনা জানিয়ে চলে যেতে বলেন। ভরত তখন রামের কাছে দুটি প্রার্থনা জানান, তা হলো: (১) চৌদো বছর বনবাসের পর রাম রাজ্যভার গ্রহণ করবেন এবং (২) অভিষেক বারি ঢালতে রামের পাদুকা জোড়া দিতে। রাম রাজি হলে ভরত সানন্দে অযোধ্যার পুরবাসীদের সম্ভষ্ট করতে রামের পাদুকা নিয়ে আসেন। পঞ্চম অঙ্কে রাম-সীতা পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের ক্রিয়ানুষ্ঠান কিভাবে করবেন আলাপ করছেন, এমন সময় রাবণ পরিব্রাজক বেশে উপস্থিত হন। রামের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। এরপর রামের সঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্র বিষয়ক আলাপ শুরু করেন। আলাপ চলাকালে রাম শ্রাদ্ধকর্ম সম্পর্কে জানতে চাইলে রাবণ বলেন, স্বর্ণমৃগ দিয়ে তর্পণ করলে পিতৃপুরুষের আত্মা শান্তি লাভ করেন। হঠাৎ করে সেই আশ্রমেই স্বর্ণমৃগ দেখা গেলে রাম তখনই সে মৃগ আহরণে বের হন। আর শঠকারী রাবণ সুযোগ পেয়ে ছদ্মবেশ পরিহার করে সীতাকে নিয়ে শূন্যে পাড়ি দেন। জটায়ু বাধা দিতে গেলে রাবণের খড়্গ হাতে প্রতিহত করতে উদ্যত হলেন। ষষ্ঠ অঙ্কে বিক্ষুব্ধ অংশ থেকে জানা যায় আকাশে জটায়ু ও রাবণের মধ্যে

যুদ্ধের সময় রাবণের তরবারির আঘাতে জটায়ুর ডান কাঁধে পড়লে তিনি ভূমিতে পতিত হন। এসব কথা রামকে জানাতে যাওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয় এ অংশ। অন্যদিকে রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে রাজ্যে ফিরে সুমন্ত্র ভরতকে সীতা হরণের কথা জানালে ভরত আবেগে ভেঙ্গে পড়েন এবং অন্তঃপুরে গিয়ে মাতা কৈকেয়ীকে সব জানিয়ে পুনরায় ভর্ৎসনা করেন। রামের বনবাস, পিতার মৃত্যু এমনকি রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের জন্য মাতাকেই দায়ী করেন ভরত। তখন কৈকেয়ী ভরতকে জানান মহারাজ অন্ধমুনির দ্বারা অভিশপ্ত ছিলেন বলেই এসব ঘটেছে। ভরতকে তখন সুমন্ত্রও এ অভিশাপের কথা জানান। “তেনোক্তং রুদিস্যান্তে মুনিনা সত্যভাষিণা! যথাহং ভোক্তুমপ্যেবং পুত্রশোকাদ্ বিপৎস্যতে।।” (প্রসূন বসু ৩৬২: ৬/১৫)। সব শুনে ভরত অনুতপ্ত হন মাতার সঙ্গে এমন আচরণ করার জন্য। সপ্তম অঙ্কে মিশ্র বিষ্ণুকে একজন তপস ও নন্দিলকের আলাপে জানা যায়, সীতার অপহরণকারী রাবণকে রাম পরাজিত করে বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অধিষ্ঠিত করেছেন, দেব ও দেবর্ষির সামনে সীতা নিষ্কলঙ্ক প্রতিপন্ন হওয়ায় রাম সীতাকে নিয়ে আকাশপথে বিমানে চড়ে ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। এ অংশের পর দেখা যায়, রাম আশ্রমের পুরোনো স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এমন সময় আশ্রমে ভরত মায়েদের নিয়ে উপস্থিত হলেন। সকলের অভিবাদন শেষে মাতা কৈকেয়ী রামকে অভিশেক গ্রহণ করতে বলেন। সব বিঘ্ন অবসান ঘটিয়ে রামের অভিশেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এরপর ভরতবাক্যের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

চারুদত্ত নাট্যের বিষয়বস্তু:

চারুদত্ত নামক রূপকটি চার অঙ্কবিশিষ্ট। অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসারে এ রূপকে প্রকরণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান। তবে প্রকরণের ক্ষেত্রে দশ অঙ্ক বা তার অধিক থাকবে বলা হলেও এখানে চার অঙ্ক রয়েছে। এ নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রস্তাবনা শেষে বিদূষক মৈত্রেয় ও নায়ক চারুদত্তের কথোপকথনে জানা যায় জাতিতে ব্রাহ্মণ আর পেশায় বণিক চারুদত্ত একদা সম্পদশালী থাকলেও ভাগ্যচক্রে তিনি আজ দরিদ্র হয়েছেন।

অন্যদিকে রাতে উজ্জয়িনী নগরের গণিকা বসন্তসেনাকে পথমধ্যে একলা পেয়ে তাড়া করে শকার ও তাঁর সহযোগী বিট। বসন্তসেনা তখন কোনো উপায় না পেয়ে চারুদত্তের বাড়িতে ঢুকে পড়েন। সেখানে চারুদত্তকে দেখে তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণে বসন্তসেনা অনুরক্ত হন। একইভাবে দরিদ্র চারুদত্তের মনে অনুরাগের সঞ্চার হয় গণিকা কন্যা নাট্যরঙ্গিনী বসন্তসেনার জন্য। বসন্তসেনা দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা পেতে তাঁর শরীরের সমস্ত গহনা চারুদত্তের হাতে গচ্ছিত রেখে চলে যান। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায় চারুদত্তের প্রেমে কাতর উদাসীন বসন্তসেনাকে। চেটী মদনিকা বুঝতে পারেন তিনি কাউকে ভালোবেসেছেন। এরপর বসন্তসেনা মদনিকার কাছে চারুদত্ত সম্পর্কে যখন কথা বলছিলেন এমন সময় সংবাহক ভীষণ ভয়াবহ হয়ে বসন্তসেনার কাছে আশ্রয় নেন। পূর্বে তিনি চারুদত্তের অস্ত্রসংবাহনের কাজ করতেন। কিন্তু চারুদত্ত দু হাতে দান করতে করতে নিঃস্ব হওয়ায় সবাইকে পাওনা বুঝিয়ে বিদায় জানিয়েছেন। আর তাই দুর্ভাগ্যবশত আজ সংবাহক জুয়াড়ি এবং ঋণগ্রস্ত। সংবাহকের কাছে চারুদত্তের প্রশংসা শুনে বসন্তসেনা ঋণমুক্ত করে তাঁকে বিদায় জানান। তৃতীয় অঙ্কে চারুদত্তের দাস বর্ধমানবক অষ্টমী তিথিতে গচ্ছিত গহনার ভাণ্ড বিদূষকের হাতে হস্তান্তর করেন। এরপর সবাই ঘুমিয়ে পরলে ঐ রাতেই চারুদত্তের গৃহ থেকে সজ্জলক সিঁধ কেটে সুবর্ণভাণ্ড চুরি করে। কারণ তার প্রেমিকা মদনিকা (বসন্তসেনার দাসী)। আর মদনিকাকে পেতে হলে বসন্তসেনাকে মুক্তিপণ দিতে হবে। সকালে যখন চারুদত্ত জানলেন গহনাপাত্র চুরি হয়েছে তখন খুব অনুশোচনায় ভুগছিলেন কি জবাব দিবেন বসন্তসেনাকে? ঠিক এ সময় ব্রাহ্মণী (চারুদত্তের স্ত্রী) দাসী মদনিকার কাছ থেকে চুরির কথা জেনে তাঁর বাবার বাড়ি থেকে পাওয়া লক্ষ মুদ্রা দামের রত্নহার দান করেন বিদূষককে পূজার অঙ্গুহাতে। চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়, একদিন বসন্তসেনা চিত্রফলকে চারুদত্তের ছবি আঁকছেন। ঠিক এমন সময় চেটী

এসে জানায় রাজার শ্যালক সংস্থান পদ্মমুখী গাড়ি পাঠিয়েছেন। তাই মা আড্ডা করেছেন সজ্জিত হয়ে বসন্তসেনা যেন বের হয়। শুনে কিছুটা রেগে বসন্তসেনা বলেন চারুদত্তের সাথে অভিসারে যাওয়ার সময়ই সাজবেন তিনি। এমন সময় হঠাৎ সজ্জলকের কণ্ঠ শুনে চেঁচা সেখানে। সজ্জলক মদনিকাকে চুরি করা গহনা দেয় বসন্তসেনাকে দেয়ার জন্য। গহনা দেখেই মদনিকা বুঝে ফেলে এগুলো চারুদত্তের কাছে বসন্তসেনার গচ্ছিত গহনা। তখন মদনিকা গহনা চারুদত্তের কাছে ফিরিয়ে দিতে বলে; কিন্তু সজ্জলক রাজি না হওয়ায় বলে এগুলো বসন্তসেনাকে দিয়ে বলতে যে চারুদত্তই তার মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। আর তাদের এ পরিকল্পনার কথা আড়াল থেকে সবটাই শুনে বসন্তসেনা। এরই মধ্যে বিদূষক সেখানে বসন্তসেনাকে মুক্তাহারটি দিয়ে বলেন চারুদত্ত এটি পাঠিয়েছেন। কেননা তাঁর দেওয়া সমস্ত গচ্ছিত গহনা জুয়াখেলায় খুইয়ে ফেলেছেন তিনি। বসন্তসেনা হারটি গ্রহণ করেন এবং চারুদত্তের ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিদূষক চলে যাওয়ার পর সেখানে মদনিকা আর সজ্জলক এসে বসন্তসেনাকে বলে, চারুদত্ত তার মাধ্যমে গচ্ছিত গহনা ফিরিয়ে দিয়েছেন। বসন্তসেনা তাঁকে চারুদত্তের কাছে পুনরায় দিয়ে আসতে বলেন; কিন্তু সজ্জলক অপারগতা প্রকাশ করলে বসন্তসেনা তাঁকে বলেন, চারুদত্তের ঘরে তিনি যে সিঁধ কেটেছিলেন তা তিনি জানেন। সজ্জলককে অবাক করে দিয়ে মদনিকাকে নিজের গহনা দিয়ে সাজিয়ে সজ্জলকের হাতে তুলে দেন। এভাবেই নাটকের সমাপ্তি হওয়ায় মনে করা হয় রচনাটি অসম্পূর্ণ।

উল্লিখিত ভাস্কৃত নাট্যদ্রব্যীতে বিধৃত সমাজব্যবস্থা:

ভাস্কর রচনায় রামায়ণ, মহাভারতের বিষয়াবলিসহ লোকমুখের প্রচলিত কাহিনি স্থান পেয়েছে। তবে তা লেখকের নিজস্বতার ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ পেয়েছে। ভাস্কৃত এ তিনটি রূপক খুব জীবনঘনিষ্ঠ। অলৌকিকত্বের আশ্রয় না নিয়ে মানবজীবনের বিভিন্ন বিষয় পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর নাটকগুলোতে। একারণে ভাস্কর রচনায় তৎকালীন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়। মূলত কোনো সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম, পেশা, বিবাহপ্রথা, জাতি, বর্ণ প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে হলে সাহিত্য খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। ভাস্কর নাটক বাস্তবধর্মী হওয়ায় সেসময়ের রাজা ও রাজ্যপরিচালনার ব্যবস্থাপনা, নারীদের অবস্থান, সামাজিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, বিবাহ, পেশা প্রভৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

স্বপ্নবাসবদত্ত নাটকে ভাস্কর তৎকালীন রাজতন্ত্র তথা রাজ পরিবারের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে বৎসরাজ উদয়ন প্রজাহিতৈষী রাজা। তিনি সর্বদা প্রজাদের জন্য হিতকর ছিলেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সার্বক্ষণিক রাজাকে বিপদমুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন এবং রাজা ও রাজ্যের মঙ্গলার্থে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেও দ্বিধা করেননি। সেসময় যে রাজ্যকে সুরক্ষার জন্য পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী রাজাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বিবাহ একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল তা এই নাটকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন। বৎসরাজ উদয়নের ও মগধরাজ দর্শকের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করার লক্ষ্যে রাজকন্যা পদ্মাবতীর সাথে উদয়নের বিবাহের তিনি পরিকল্পনা করেন। এভাবে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয় এবং বিবাহোত্তর উদয়ন রাজা দর্শকের সহযোগিতায় আরুণির কাজ থেকে হতরাজ্য উদ্ধার করেন। এছাড়াও মন্ত্রী বাসবদত্তকে পদ্মাবতীর কাছে গচ্ছিত রাখেন। কারণ ভবিষ্যতে বাসবদত্তের চরিত্র নিয়ে রাজার মনে কোনো আশঙ্কা সৃষ্টি হলে পদ্মাবতীই যেন সেই সংশয় দূর করতে পারেন। রাজা এবং রাজ্যের মঙ্গল কামনায় মন্ত্রী অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। এ নাটকেও এ বিষয়টি বারংবার উঠে এসেছে। রাজা উদয়নের ব্যক্তিগত বিষয়ে মন্ত্রী একাধিক হস্তক্ষেপ করেছেন। রাজ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে একজন মন্ত্রীর বিচক্ষণতা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা অত্যন্ত সুচারুভাবে তুলে ধরেছেন ভাস্কর।

ভাস তাঁর এই নাটকে রাজমহিষী বাসবদত্তাকে একজন পতিব্রতা নারী রূপে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর প্রাণপ্রিয় স্বামী উদয়ন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন বৎসরাজ্য আরুণি কর্তৃক হত হয়েছে, মগধরাজ দর্শকের সাহায্য ছাড়া হতরাজ্য ফিরে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তখন তিনি নিজের প্রাণপ্রিয় স্বামীকে অন্যের হাতে সমর্পণ করতেও দ্বিধা করেন নি। অর্থাৎ পদ্মাবতীর সাথে উদয়নের বিবাহকার্য সম্পন্ন করতে সাহায্য করেন। লক্ষ্য তখন একটাই, তা হলো হত রাজ্য স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া। একজন নারীর জন্য এ এক আত্মত্যাগই বটে। রাজা যে বাসবদত্তার জীবিত অবস্থায় বিয়ে করতে রাজি হবেন না— তিনি তা জানতেন। আর তাই নিজের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ রটিয়েছেন এবং রাজ্য উদ্ধারে মন্ত্রীর পরিকল্পিত প্রতিটি কাজে সহযোগিতা করেছেন। এসব কাজে তিনি বারংবার মানসিক আঘাত সহ্য করেছেন। তথাপি তিনি রাজ্য উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত একজন সাধারণ আবৃত্তিকার বেশ ধারণ করেছেন। এমনকী পদ্মাবতী আর উদয়নের বিয়ের মালাও গাঁথে দিয়েছেন। স্বামীর মঙ্গলের জন্য এমন দুঃসাধ্য কাজ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। পতিব্রতা এ নারীর পাশাপাশি অত্যন্ত ধীরস্বভাবসম্পন্ন বুদ্ধিদীপ্ত পদ্মাবতী নামক নারী চরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে এ নাটকে। পদ্মাবতীর আচরণের মধ্যে রাজপরিবারের পরম্পরা এবং আভিজাত্য দৃশ্যমান। রাজপরিবারের আভিজাত্যের পরিচয় দিয়েছেন পদ্মাবতী। অভিজ্ঞ কণ্ঠস্বর দিয়ে নিষেধ সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পদ্মাবতী আবৃত্তিকা (বাসবদত্তা)-কে ন্যাস রাখতে দ্বিধা করেননি। ভাসের এ নাটকে বাসবদত্তা এবং পদ্মাবতী দুটি নারী চরিত্র দেখলে সহজেই অনুমান করা যায় সেসময়ের নারীদের অবস্থান সম্পর্কে। কেবল তাই নয়; এই দুই চরিত্রের বিভিন্ন আচরণে তৎকালীন পারিবারিক মূল্যবোধ প্রস্ফুটিত হয়েছে। রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করলেই যে কেবল নিজের সুখের বিষয় বিবেচনা করার সুযোগ নেই তা আমরা যেমন রামায়ণ, মহাভারত সহ প্রভৃতি রচনায় বহুবার দেখতে পাই; ঠিক তেমনি এক্ষেত্রেও বাসবদত্তার আত্মত্যাগ বা পদ্মাবতীর সত্য রক্ষা বা তাঁকে রাজা উদয়নের জন্য সহানুভূতিশীল হয়ে বিয়ে করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে দেখতে পাই। বৃহৎ স্বার্থে তাঁরা দুজনেই নিজের সুখ বিসর্জন দিতে কখনো কুণ্ঠিত হননি।

উল্লিখিত তিনটি নাটকের ক্ষেত্রেই বিবিধ কারণে একাধিক প্রণয় বা বিবাহের প্রচলন দেখা যায়। প্রতিমা নাটকে অযোধ্যার রাজা দশরথের কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামে তিনজন স্ত্রী রয়েছে। চারুদত্ত নাটকে চারুদত্তের একজন স্ত্রী ছিল তথাপি গণিকা বসন্তসেনার প্রতি অনুরাগ জন্মেছিল। যদিও প্রকরণ শ্রেণির এ রূপকটি অসম্পূর্ণ বলে হয়তো তাঁদের এ অনুরাগ নাটকে সফল পরিণয় পায়নি। স্বপ্নবাসবদত্ত নাটকেও রাজা উদয়নকে প্রাণপ্রিয় স্ত্রী বাসবদত্তার বিয়োগে এক বুক ভালোবাসা নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করতে দেখা গিয়েছে। এছাড়া এ নাটকে মহাসেনের ষোড়শ পত্নীর উল্লেখ রয়েছে।^২ সুতরাং সেসময়ের সমাজব্যবস্থায় বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল বলা যায়। তিনটি নাটকেই নারীদের অবস্থান অন্তঃপুরে দেখা যায়। রাজকন্যা বা রাজবধূদের রাজকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনোরূপ অংশগ্রহণ নেই। তবে রাজা বা রাজ্যের হিতসাধনে পরোক্ষভাবে বাসবদত্তা, পদ্মাবতী, সীতার অংশগ্রহণ দৃষ্টিগোচর হয়।

আলোচ্য নাট্যসমূহে বিভিন্ন ধরনের বিবাহের বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন: স্বপ্নবাসবদত্ত-এ পদ্মাবতী ও রাজা উদয়নের ব্রাহ্ম বিবাহ (অর্থাৎ সদ্বংশজাত পাত্র-পাত্রীর পারিবারিকভাবে কন্যা সম্প্রদানের মধ্য দিয়ে) হয়। এ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়, এ ধরনের বিবাহ রীতিতে ‘অবিধবাকরণ’ ও ‘সপত্নীমর্দন’ নামক দুটি মালা গাঁথার রেওয়াজ ছিল। প্রতিমা-নাটকের তৃতীয় অঙ্কে শুক্ল দানের মধ্য দিয়ে কৈকেয়ী-রাজা দশরথের আসুর বিবাহ, চারুদত্ত-এ চতুর্থ অঙ্কে সজ্জলক ও মদনিকার অনুলোম শ্রেণির বিবাহের বর্ণনা রয়েছে। এসব বর্ণনায় বোঝা যায়, সেসময়ের সমাজে এধরনের বিবাহ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

ভাস্কর্য তথা মৃত রাজাদের মূর্তি সংরক্ষণের বর্ণনা পাওয়া যায় *প্রতিমা* নাটকে। ভরত মাতুলগৃহ থেকে অযোধ্যায় ফেরার পথে ইক্ষ্বাকু বংশের রাজাদের মূর্তি দর্শন করেছিলেন। এ নাটকে সত্য রক্ষার্থে মহারাজ দশরথ ইচ্ছার বিরুদ্ধে রামকে চৌদো বছরের জন্য বনে পাঠানো, অন্যদিকে রামের পরিবর্তে ভরতকে রাজার আসন গ্রহণের প্রস্তাব দিলে ভরতের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা, রামকে ফিরিয়ে আনতে বনে যাওয়া, পিত্রাদেশ পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রামের অযোধ্যায় না ফেরা, ভরত ফিরে আসার সময় রামের পাদুকা নিয়ে আসা, পাদুকা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করা, ভরতের মাতা কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করা – এসব ঘটনায় সেন্সময়ের রাজপরিবারের চিত্র তুলে ধরেছেন ভাস। এখানে ভরতের ভ্রাতৃত্ববোধ, রামের পিতার আদেশ পালনে নিদারুণ কষ্টকে মেনে নেওয়া, মাতা কৈকেয়ীর বর চাওয়া এবং দশরথের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে বর প্রদান সত্য পালনের জন্য, ভরতকে কৈকেয়ীর পরবর্তীতে অন্ধমুনির অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, ভরতের অনুশোচনা এবং মাতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা – এসবই যেন ঐ সময়ের পরিবার তথা সমাজের চিত্র। এ নাটকে স্পষ্টভাবে বর্ণভেদ প্রথা দৃশ্যমান। ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণ বিধায় তাঁরা ক্ষত্রিয়দের প্রণাম করতেন না। আর তাই দেবকুলিক ভরতকে ক্ষত্রিয় মূর্তিতে প্রণাম না করতে নিষেধ করেছিলেন। “ন খল্বেতৈঃ কারণৈঃ প্রতিষেধয়ামি ভবন্তু। কিন্তু দৈবতশঙ্কয়া ব্রাহ্মণজনস্য প্রণামং পরিহরামি।” (প্রসূন বসু ৩৪২)।

রাজপরিবারের নারীদের মুখদর্শন করা সাধারণ লোকের জন্য দুঃসাধ্য ছিল। অযোধ্যা থেকে সীতাকে নিয়ে রাম বনবাসী হয়ে বনবাসের উদ্দেশ্যে যাবার সময় প্রথমবাবের মতো সীতাকে অবগুণ্ঠন খুলে প্রজাদের মুখদর্শন করিয়ে তিনি বলেন—

স্বেরং হি পশ্যন্তু কলত্রমেতদ বাস্পাকুলান্ধবনৈর্ভবন্তঃ।

নির্দোষদৃশ্যা হি ভবন্তি নার্যো যজ্ঞে বিবাহে ব্যসনে বনে চ।।

(প্রসূন বসু ৩৪২: ১/২৭)।

অর্থাৎ হে পুরবাসীজন! শুনুন শুনুন, আপনারা সাক্ষরনেত্রে অবাধে আজ আমার পত্নীকে দর্শন করুন। যজ্ঞানুষ্ঠানে, বিবাহে, বিপদে এবং বনগমনে নারী দর্শনে দোষ নেই।

কবি-কল্পনায় তখনকার সময়ে যানবাহন হিসেবে আকাশপথে বিমানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম অঙ্কে লঙ্কার যুদ্ধ শেষে সীতাকে নিয়ে রাবণের বিমানে করে আশ্রমে ফিরেছিলেন এবং বিমানে বসে নিচের দৃশ্যের অপূর্ব বর্ণনা করেছেন।

চারুদত্ত নামক রূপকটি যেন লোকায়ত জীবনের প্রতিচ্ছবি। নিদারুণ দারিদ্র্যের বর্ণনা রয়েছে এখানে। বণিক চারুদত্ত দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণে নগরের সকলেই চরিত্রটির গুণের অনুরক্ত ছিলেন। শত দারিদ্র্যের মাঝেও চারুদত্ত তাঁর আত্মসম্মান হারাতে রাজি নন। যার ফলে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর কাছ থেকে রত্নহারটি পাওয়া বলে খুব তিনি খুব অনুতপ্ত হন। এখানে স্ত্রীর দান যেন তাঁর ব্যক্তিত্বকে আঘাত হানে। তিনি বলে উঠেন—

“ময়ি দ্রব্যক্ষয়ক্ষীণে স্ত্রীদ্রব্যেণানুকম্পিতঃ।

অর্থতঃ পুরুষো নারী, যা নারী সার্থতঃ পুমান্।।”

(প্রসূন বসু ১১৫: ৩/১৭)।

অর্থাৎ বিভবনাশের দরুন আমার এমনি শোচনীয় দশা যে, স্ত্রী তাঁর দ্রব্য দিয়ে আমায় অনুকম্পা করছেন। বস্তুতঃ, পুরুষ হয়েছে নারী, আর যিনি নারী তিনিই কার্যক্ষেত্রে হলেন পুরুষ।

এখানে এই বর্ণনায় যেন পুরুষ প্রধান পরিবারের চিত্র পাওয়া যায়। একটা পরিবারের সমস্ত দায় যেন কেবল পুরুষের। সেখানে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে স্ত্রীলোক সহযোগিতার হাত বাড়ালে যেন পুরুষের পরাজয়। একারণেই হয়তো চারুদত্ত তাঁর স্ত্রীর সহযোগিতাকে অনুকম্পা মনে করছেন।

প্রকৃতপক্ষে ভাস তাঁর রচনায় রাজপরিবার থেকে চারুদত্তের মতো সাধারণ মানুষের পরিবারে দেখিয়েছেন পরিবারের মূল একজন রাজা বা পুরুষ। কেবল তাই নয়; সকলেই পরিবার-প্রধানকে খুব সম্মান বা শ্রদ্ধা করতেন। প্রতিমা নাটকে পিতা দশরথের সত্য পালনে রাম বঙ্কল ধারণ বিনা বাক্যে বনবাসে যান। স্বপ্নবাসবদত্ত-এ বাসবদত্তা রাজা উদয়নের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে পদ্মাবতীর আশ্রয়ে থাকেন। চারুদত্ত-এ ব্রাহ্মণীর চরম দারিদ্র্যের মাঝে বেঁচে যাওয়া একমাত্র রত্নহার দিতেও দ্বিধা করেন নি।

ভাসের চারুদত্ত-এর নায়িকা একজন গণিকাকন্যা। অর্থাৎ সেসময়ের সমাজে গণিকা বৃত্তি ছিল এবং লোকসমাজ তাদের ঘৃণার চোখেই দেখতো। বসন্তসেনা ও চারুদত্ত পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হলেও গণিকার রাখা গচ্ছিত গহনা বলে চারুদত্ত নিজের ঘরের অন্তঃপুরে তা রাখেন নি। “...বাহ্যজনধারিতমলঙ্কারং গৃহজনো ন দ্রক্ষ্যতি।” (প্রসূন বসু ১১০)। আবার জীবনের প্রয়োজনে গণিকা বৃত্তি কবলেও চারিত্রিক গুণাবলির দিক থেকে বসন্তসেনা একজন আত্মমর্যদাবোধসম্পন্ন নারী। অর্থের লোভ তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি বলেই তিনি চারুদত্তের মতো একজন হতদরিদ্র লোকের প্রেমে পড়েন। এভাবে এ রূপকে বারংবার প্রকাশ পেয়েছে সেসময় অর্থের চেয়ে গুণের কদর বেশি ছিল। তবে সমাজে গণিকাদের বৃত্তিটি নিন্দনীয় থাকায় হয়তো শেষঅবধি সফল পরিণয় দেখানো হয়নি। এর পাশাপাশি সজ্জলক ও মদনিকার প্রণয় সফল দেখানো হয়েছে। তবে মদনিকা আর সজ্জলককে গণিকালয় থেকে চির মুক্তি দিয়ে পাঠিয়ে দেন বসন্তসেনা। কারণ গণিকালয়ে থাকলে তাদের প্রণয় বা স্বাভাবিক জীবনযাপন হয়তো সমাজ গ্রহণ করত না।

ভাসকৃত আলোচ্য এয়ীনাট্যের আলোকে বলা যায়, তৎকালীন সমাজে বিভিন্ন রকমের পেশা ছিল। যেমন- বাণিজ্য, দাসত্ব, জুয়াখেলা, চুরি, গণিকা বৃত্তি প্রভৃতি। চারুদত্ত নামক নাটো চারুদত্ত পেশায় বণিক, বিট শকারের দাস ছিলেন। সংবাহক জুয়া খেলতে খেলতে নিঃস্ব হলে জুয়াড়ি মহাজনের ভয়ে পালাতে পর্যন্ত দেখা যায়। সমাজে সাধারণদের ভালো কাজ করতে দেখা গেলেও রাজপথেই জুয়ার আসর দেখা যায়। তৃতীয় অঙ্কে চারুদত্তের গৃহে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সিঁধ কেটে সজ্জলকের চুরির বর্ণনা রয়েছে।

তখনকার সমাজ-ব্যবস্থায় তিন ধরনের নারী দেখা যায়- (১) কুলবধূ (২) গণিকা এবং (৩) দাসী। চারুদত্ত নাটকে কুলবধূ চারুদত্তের স্ত্রী ব্রাহ্মণীকে অন্তঃপুরে আর বারাজনায় বসন্তসেনাকে দেখা যায়। কুলবধূর সম্মান ছিল সর্বোচ্চ। ভাস তিনটি রচনার কুলবধূকেই দেখা যায় পতিব্রতা নারী অর্থাৎ স্বামীর মঙ্গলের জন্য নিজের সর্বোচ্চ সুখও বিজর্সন করেছেন। স্বামীর সুখ-দুঃখের সাথে কুলবধূ/স্ত্রী। বাসবদত্তা রাজমহিষী, রাজকন্যা হয়েও স্বামীকে ব্রাহ্মণী স্বামীর সম্মান রাখতে নিজের মূল্যবান হারখানি দিতে একটুও দ্বিধা করেননি। স্বপ্নবাসবদত্ত নাটকে বাসবদত্তা, পদ্মাবতী এমনকী প্রতিমা নাটকে স্বামীর সম্মান বৃদ্ধিতে সীতার চরিত্রে এমন বিষয়গুলো রয়েছে। সীতা বিনা অপরাধে কেবল স্বামীর পাশে থাকার জন্য কুলবধূ হওয়া সত্ত্বেও বনে গমন করেছিলেন। নিজের সুখের কথা ভাবেন নি সীতা। স্বামীর সঙ্কটকালে সহচরী হয়ে কুলবধূর দায়িত্ব পালন করেছেন।

গণিকা শ্রেণির নারীদের সমাজে সম্মান না থাকলেও সমাজের বিত্তবানদের কাছে চাহিদা ছিল। রাজার শ্যালক গাড়ি পাঠিয়েছিলেন বসন্তসেনাকে নিতে। তখনকার সময়ে দাসীরা নিষ্ঠার সাথে প্রভুর সেবা করতেন এবং সর্বদা তাঁদের হিতার্থে কাজ করতেন। মদনিকা ঠিক এমন শ্রেণিরই উদাহরণ। সর্বদা বসন্তসেনার সেবায় নিজেস্ব নিয়োজিত করেছেন। গণিকা বৃত্তিতে বসন্তসেনা তাঁর জীবননির্বাহ করছেন। তবে এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, মদনিকা-সজ্জলকের প্রেমের বিষয়ে বুঝতে পেরে বাসবদত্তা নিজের গহনা দিয়ে মদনিকাকে সাজিয়ে দেন এবং সজ্জলকের হাতে নিজে তাকে অর্পণ করেন। মোট কথা মদনিকাকে মুক্তি দেন গণিকালয় থেকে। এ থেকে ধারণা করা যায়, কেউ যদি গণিকা বৃত্তি ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চায় সেসময়ের সমাজে সেই সুযোগ বা ব্যবস্থা ছিল।

বসন্তসেনার চতুরিকা ও বিচ্ছিতিকা নামেও আরো দুজন দাসী ছিল। চারুদত্ত-এ ব্রাহ্মণীর দাসী রদনিকা, স্বপ্নবাসবদত্ত-এ রাজকন্যা পদ্মাবতীর মধুকরিকা ও পদ্মিনিকা নামে চেটী অর্থাৎ দাসীএবং প্রতিমা নাটকে মন্সুরা ছাড়াও বিজয়া ও নন্দিলীকা নামে দুজন দাসী ছিল রানি কৈকেয়ীর।

প্রাচীন সাহিত্য বা ধর্মশাস্ত্রে চতুর্বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) এবং চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বৈদিক যুগের কর্মের ভিত্তিতে সমাজে চতুর্বর্ণ প্রচলিত থাকলেও ধীরে ধীরে তা জনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে থাকে। ভাস্কর রচনায় মধ্যে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের উল্লেখ রয়েছে। স্বপ্নবাসবদত্ত-এর প্রথম অঙ্কে বেদাধ্যয়নের জন্য ব্রহ্মচারী লাভাণক গ্রামে বসবাস করতেন এমনটাই জানান। অর্থাৎ এখানে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও যোগেশ্বরায়ণের মুখে প্রথম অঙ্কের নবম শ্লোকে শোনা যায় তিনি জীবিকার জন্য কাষায় বস্ত্র (অর্থাৎ গেরুয়া) ধারণ করেন নাই। তিনিও সন্ন্যাস বৃত্তির উদ্দেশ্যে পরিব্রাজক বেশ ধারণ করেছেন। প্রথম অঙ্কে পদ্মাবতী তপোবনে এসেছিলেন তাঁর সন্ন্যাসিনী মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে। চারুদত্ত-এর দ্বিতীয় অঙ্কে সংবাহক সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা হওয়ায় প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রতিমা নাটকের পঞ্চম অঙ্কে পরিব্রাজক বেশে রাবণ রামের দ্বারে উপস্থিত হলে রাম তাঁকে ভগবান্ সম্বোধন করে গভীর শ্রদ্ধা ভরে সেবা করেন। এ থেকে বোঝা যায়, সে যুগে যারা সন্ন্যাস আশ্রম পালন করতেন তাঁদের সকলে ভক্তি সহকারে সেবা করতেন। প্রতিমা নাটকে প্রথম অঙ্কে ভট্টিনী সীতাকে জানান, “ময়া শ্রুতং- ভর্তৃদারকম-ভবিষ্য মহারাজো বনং গমিষ্যতীতি” (প্রসূন বসু ৩২৯) অর্থাৎ আমি শুনলাম কুমারের অভিষেকের পর মহারাজ বনে যাবেন। রাজা দশরথের এমন ইচ্ছা থেকে বোঝা যায়, গার্হস্থ্য জীবনের দায়িত্ব পালন শেষে বাণপ্রস্থে যাওয়ার রীতি সেযুগে ছিল। এভাবে চতুরাশ্রমের পাশাপাশি চতুর্বর্ণও গুরুত্বের সাথে রচনাসমূহে স্থান পেয়েছে। প্রতিমা নাটকের পঞ্চম অঙ্কে পরিব্রাজক বেশে রাবণ এসে প্রথমেই ব্রাহ্মণের পালনীয় আচারসমূহ সম্পন্ন করেন। তিনি জানান অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহ বেদ, মনু প্রণীত ধর্মশাস্ত্র, মহেশ্বর-ভাষিত যোগশাস্ত্র, বৃহস্পতি প্রণীত অর্থশাস্ত্র মেধাতিথির ন্যায় শাস্ত্র এবং বরুণ রচিত শ্রাদ্ধবিধি অধ্যয়ন করেছেন।^৩ সমাজে ব্রাহ্মণেরই অবস্থান উঁচুতে ছিল বলে তাঁরা সকলের দ্বারা সম্মানিত হতেন। এরপরই ছিল ক্ষত্রিয়ের অবস্থান। প্রতিমা নাটকে তৃতীয় অঙ্কে ভারত প্রতিমাগৃহে দেবতাদের প্রতিমা মনে করে প্রণাম করতে গেলে দেবকূলিক তাঁকে নিষেধ করেন। কারণ বলতে গিয়ে জানান প্রতিমাগুলো ক্ষত্রিয়দের বলে কোনো ব্রাহ্মণ যেন প্রণাম না করেন। অর্থাৎ সেসময়ে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দের প্রণাম করতেন না। ক্ষত্রিয়দের প্রধান কর্তব্য ছিল, যুদ্ধ করা। ক্ষাত্রধর্মের পরাক্রম সম্বন্ধে রাবণ সীতাকে হরণ করার সময় নাটকের পঞ্চম অঙ্কে বলেন, রাম যদি ক্ষাত্রধর্ম পালন করে থাকে তবে অবশ্যই সীতাকে রক্ষা করতে আসবে-

মণ্ডুজাকৃষ্টনিষ্ক্রিংশ কৃতপক্ষক্ষতচ্যুতৈঃ।

রুধিরৈরার্দ্রগাত্রং ত্বাং নয়ামি যমসাদনম্।।

(প্রসূন বসু ৩৫৮: ৫/২২)।

চারুদত্ত-এ বৈশ্যদের সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অঙ্কে সংবাহক এবং চতুর্থ অঙ্কে সজ্জলকের বর্ণনায় জানা যায়, বণিকদের পেশা ছিল ব্যবসা। তারা খুব অতিথি সেবা করতে ভালোবাসেন। এমনকী বণিকদের বসবাসের জন্য পৃথক পাড়াও ছিল। চারুদত্ত পেশায় বণিক হলেও জাতিতে ব্রাহ্মণ। এজন্যই তাঁর স্ত্রীকে ব্রাহ্মণী বলা হয়েছে। তিনি নিজেও আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। বণিকদের পাড়ায় থাকতেন। এ রচনা থেকে জানা যায় সেসময় জাতিতে বণিক হলেও অন্য পেশা গ্রহণের সুযোগ ছিল বলেই সংবাহক বণিক হওয়া সত্ত্বেও অঙ্গমর্দনের কাজ করতেন। এছাড়া প্রতিমা নাটকে শূদ্র সম্পর্কে তৃতীয় অঙ্কে জানা যায় তারা মন্ত্রহীণ প্রণাম করতে পারতেন।^৪

পরিশেষে বলা যায়, ভাস তাঁর আলোচ্য নাট্যসমূহে কাহিনি বর্ণনার মধ্য দিয়ে সেসময়ের সমাজচিত্র চিত্রণ করেছেন। যেখানে পরিবার তথা পারিবারিক মূল্যবোধ, বিবাহ, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি, জাতি প্রথা, চতুরাশ্রম সহ যাবতীয় তথ্যাদি উঠে এসেছে। বৈদিক যুগ পরবর্তী সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল তা-ই যেন স্পষ্ট হয়েছে আলোচ্য ত্রয়ীনাট্যে।

টীকা:

১. “... in 1909, Ganapati Sastri discovered palm-leaf manuscripts of ten plays in an old manor house near Padmanabha Puram, some twenty miles from Further investigation brought to light three more plays. All the thirteen plays were published by him as the works of Bhasa.”- (Krishna Chaitanya ed. 1977, 289-290).
২. “ষোড়শাঙ্কুপুরজ্যেষ্ঠা পুণ্যা নগরদেবতা।
মমপ্রবাসদুঃখার্থা মাতা কুশলিনী ননু? ৬/৯” (রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর সম্পা। ২০০৬, ২১৩)।
৩. “রাবণঃ- (আত্মগতম্) যাবদ হমপি ব্রাহ্মণসমুদাচারমনুষ্ঠামি। (প্রকাশঃ) ভোঃ! কাশ্যপগোত্রেন হস্মি।
সঙেড়পাঙ্গাং বেদমধীয়ে, মানবীয়ং ধর্মশাস্ত্রং, মহেশ্বরং যোগশাস্ত্রং, বার্ষস্পত্যমর্থশাস্ত্রং, মেধাতিথেনর্যায়শাস্ত্রং, প্রাচেতসং
শ্রাদ্ধকল্পং চ” (প্রসূন বসু সম্পা। ২০১১, ৩৫৫)।
৪. “কামং দৈবতমিত্যেব যুক্তং নময়িতুং শিরঃ।
বার্ষলম্ প্রণামঃ স্যাদমন্ত্রার্চিতদৈবতঃ।। ১/৫” (প্রসূন বসু সম্পা। ২০১১, ৩৪২)।

তথ্যসূত্র

- প্রসূন বসু (সম্পাদিত)। সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার ১১তম খণ্ড। নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮১।
- শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা ও অনুবাদ। -স্বপ্নবাসবদত্তম্, বিধান সরণী।
- প্রসূন বসু (সম্পাদিত)। সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার ১ম খণ্ড। নবপত্র প্রকাশন, ২০১১।
- প্রসূন বসু (সম্পাদিত)। সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার ১১তম খণ্ড। নবপত্র প্রকাশন, ২০১১।

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

রবীন্দ্রনাথ ষোষ ঠাকুর সম্পাদিত। স্বপ্নবাসবদত্তম্, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬।

C R Devadhar. Cārudattam. Oriental Book Agency: 1943.

Krishna Chaitanya ed. *A New History of Sanskrit Literature*, 2nd edition, 1977.

পঞ্চ মহাযজ্ঞ: সনাতনী সমাজব্যবস্থায় ঋণমুক্তির বিধান

রাজপতি দাশ*

প্রতিপাদ্যসার : মোক্ষই জীবের পরম লক্ষ্য। বেদানুগ ষড়দর্শনের প্রতিটি দর্শনই ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ –এই বর্গচতুষ্টয়ের মধ্যে মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ হিসেবে স্বীকার করেছে। কিন্তু জীবের ইহজাগতিক ঋণগ্রস্ততা পারলৌকিক এই মোক্ষপথের অন্তরায়। মানুষ কয়েক প্রকার ঋণে আবদ্ধ হয়েই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর ক্রমে সেই ঋণের প্রকার আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পার্থিব এ ঋণ মৃত্যুর পূর্বে পরিশোধ করতে না পারলে মানুষের দেহান্তে মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না। তাই প্রতিটি মানুষকেই জীবন ব্যাপিয়া এই ঋণ শোধে সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়। এক এক প্রকারের ঋণশোধের চেষ্টার অভ্যাস হল এক একটা যজ্ঞ। কারণ এই ঋণশোধের প্রচেষ্টাহেতু মানুষ প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু উৎসর্গ বা ত্যাগ স্বীকারে ব্রতী হন। এই ত্যাগাত্মক কর্মই যজ্ঞ। তাই জগতসৃষ্টা এবং তাঁরই সৃষ্টিলীলার অংশরূপ বিভিন্ন দেব-দেবতার পাশাপাশি দুর্লভ মানবজন্মদাতা পিতামাতা, জীবনপ্রবাহে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সতত অবদান রেখে চলেছেন সেই ঋষি-মহাত্মাগণ, মনুষ্যাদি ইত্যেতের প্রাণী প্রত্যেকের কাছে ঋণ স্বীকার করে তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সাথে প্রত্যহ কোনো কিছু ত্যাগ স্বীকার করা তথা যজ্ঞ সম্পাদন করা বিধেয়। মানবজীবনে এরূপ ঋণগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সনাতন ধর্মে পাঁচ প্রকার যজ্ঞের বিধান রয়েছে, যা পঞ্চ মহাযজ্ঞ নামে অভিহিত। আলোচ্য প্রবন্ধে পারলৌকিক মুক্তির পথ সুগম করার লক্ষ্যে মানবজীবনে কীরূপে বৈদিক যুগ থেকে সনাতনী সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত এ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসরণ করে পার্থিব ঋণগ্রস্ততা থেকে মুক্তিলাভ করা যায়, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ভূমিকা: ‘ঋ’ ধাতুর উত্তর ‘জ’ প্রত্যয় যোগে ‘ঋণ’ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে যার অর্থ হল- পুনরায় ফিরিয়ে দেবার স্বীকৃতি দিয়ে যা গ্রহণ করা হয় তাই ঋণ- “পুনর্দেয়ত্বেন স্বীকৃত্য যৎ গৃহীতম্” (রাধাকান্তদেব ৪৯৬)। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে-“জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্তিভিঃ ঋণৈঃ ঋণবান্ জায়তে” (৬/৩/১০) - অর্থাৎ জন্ম থেকেই মানুষ তিনটি ঋণযুক্ত হয়। এই ঋণগুলো হল দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ। সাংসারিক প্রপঞ্চে জীবন ধারণ করতে গিয়ে মানুষ মহাপ্রকৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন বস্তু এবং ব্যক্তি দ্বারা প্রতিনিয়ত উপকার লাভ করে। এতে করে মানবের এ ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন, দেবগণ মানুষের ভাগ্যবিধাতা; পিতৃপুরুষের পরম্পরায় মানুষ মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন; ঋষিগণ কর্তৃক প্রদেয় অপৌরুষেয় বিদ্যাই মানুষ দ্বিতীয় জন্মের অধিকারী হতে সক্ষম হয়েছেন; আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, প্রতিবেশী কিংবা সাধারণ কোনো মানুষের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষ নিয়ত সহায়তাপ্রাপ্ত হচ্ছেন; বিশ্বের সমস্ত ভূতগণের অর্থাৎ পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি যাবতীয় প্রাণীর নিকট হতে প্রতিনিয়ত মানুষ কোনো না কোনোভাবেই সাহায্য গ্রহণ করছেন। অতএব, প্রতিটি মানুষের জাগতিক জীবনব্যবস্থার সাথে মহাপ্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপ অলৌকিক দেবতা থেকে শুরু করে লৌকিক জগতের প্রতিটি জীব কিংবা বস্তুর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এভাবে জগতের লৌকিক-অলৌকিক শক্তিরাজি ও প্রাণিসকল যেহেতু একযোগে প্রতিটি মানুষের বাঁচা ও বিকাশকার্যে সহায়তাপূর্বক তাঁদেরকে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত রেখেছে, তাই প্রতিনিয়ত এসব ঋণের কথা স্মরণ রেখে এদের প্রতি প্রত্যহ শ্রদ্ধার সাথে কোনো কিছু প্রতিদান হিসেবে ত্যাগ করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য। ব্যাপক অর্থে, এই ত্যাগের নামান্তরই যজ্ঞ। আর উল্লিখিত দেবতা, পিতৃগণ ও ঋষিগণের নিকট ঋণের পাশাপাশি ভূতগণ ও মনুষ্যগণের নিকট ঋণ –এই পঞ্চঋণ শোধের জন্য প্রত্যহ পাঁচপ্রকার ত্যাগাত্মক কর্মানুষ্ঠানই পঞ্চ মহাযজ্ঞ। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞই জীবের পার্থিব ঋণগ্রস্ততা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়, যে উপায় অবলম্বন করে

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

জীব পরকালে মোক্ষলাভ করতে সক্ষম হন। প্রাচীন আর্যসমাজে প্রত্যহ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ ভক্তিপূতহৃদয়ে ঋষিগণকর্তৃক অনুষ্ঠিত হতো। বৈদিক যুগের ঋষিদের নির্লোভতা, নিঃস্বার্থতা, তপোবল, ধর্মপরায়ণতা, উদারতা তথা সর্বোপরি সর্বভূতে সমদর্শনের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পঞ্চ মহাযজ্ঞরূপ এ আচার অদ্যাবধি সনাতনী সমাজব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

যজ্ঞ: প্রিয় দেবতার প্রীতি সাধনকল্পে তাঁদের উদ্দেশ্যে কোনো প্রিয়বস্তু দান করাই হল যজ্ঞ। সংস্কৃত ‘যজ্’ ধাতু থেকে ‘যজ্ঞ’ শব্দের উৎপত্তি; যার অর্থ দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগরূপ পূজার অনুষ্ঠান। বৈদিক যুগে ঋষিগণ দেবতাদের অলৌকিক শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং জগদ্ব্যবস্থায় তাঁদের অপরিসীম অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থে দেবসম্মুখি বিধানের জন্য বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে নিজেদের প্রিয়বস্তু আহুতি প্রদানের মাধ্যমে এ যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করতেন। যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী যজ্ঞমানের এ যজ্ঞক্রিয়া হোতা, অধ্বর্যু, উদ্বাতা ও ব্রহ্মা -এই চারজন বৈদিক পুরোহিতের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। যাগানুষ্ঠানের মাধ্যমে যজ্ঞমানের জাগতিক অভীষ্ট যেমন সিদ্ধ হতো তেমনি যজ্ঞের মাধ্যমে মহাজাগতিক অভীষ্ট প্রাপ্তিও সম্ভব হতো। বেদে তাই যজ্ঞকে বলা হয়েছে পার্থিব এবং অপার্থিব বস্তুলাভের নিশ্চিত উপায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে- “যজ্ঞো হি শ্রেষ্ঠতমং কর্ম” (৩/২/১/৪) - অর্থাৎ, সর্বপ্রকার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ।

বৈদিক যুগের এ সামাজিক আচারকে যজ্ঞ বলা হলেও ব্যাপকার্থে মানুষের ত্যাগাত্মক কর্মমাত্রই যজ্ঞ। মানুষের সর্বদা কর্ম করে যেতে হবে এবং জীবনের প্রতিটি কর্মকেই যজ্ঞরূপে দেখতে হবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন-

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়োহ্যকর্মণঃ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকর্মণঃ॥ (৩/৮)

এখানে অর্জুনের প্রতি যে নিয়ত কর্ম বা নিত্যকর্মের কথা বলা হয়েছে তা হলো চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কামভাবে শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত কর্ম। এখানে এও বলা হয়েছে- কর্ম না করলে শরীরযাত্রাও নির্বাহ করা যায় না। কি কৌশলে সেই শরীরযাত্রাদি নির্বাহকর্ম করতে হবে, যাতে বন্ধনের কারণ হয় না, তা পরবর্তী শ্লোকেই বিবৃত হয়েছে-

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধন।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচরা॥ (৩/৯)

এখানে কর্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এক- যজ্ঞার্থে কর্ম বা ঈশ্বরের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম, যা বন্ধনের কারণ নয়; দুই- যজ্ঞার্থ কর্ম ব্যতীত অন্য সকল কর্ম, যে কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। দেহ নিয়ত ব্যাপারশীল। তাই এক মূহূর্তও কর্ম না করে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই কর্ম যদি দেবতার প্রীতিসাধনের পাশাপাশি মনুষ্য থেকে গুরু করে জগতের প্রাণীকুল, উদ্ভিদ প্রভৃতির পোষণ ও বর্ধনের জন্য হয়, তাহলে সেই কর্ম যজ্ঞরূপে পরিণত হয় অর্থাৎ সর্বজীবে বিরাজিত পরমাত্মার সেবার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কর্মই সম্পন্ন হয়, যাকে ব্রহ্মকর্ম বলে। ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বলেছেন- “জ্ঞানাবস্থিত” ব্যক্তি জীবনের সমুদয় কর্মই যজ্ঞময় দর্শন করেন। তাঁহার নিজ জীবনটি যজ্ঞ। বিশ্বজীবনের বিরাট কর্মও ব্রহ্মাণ্ডশালার একটি মহাযজ্ঞ। যজ্ঞবুদ্ধিতে কর্ম করিতে করিতে- “যজ্ঞাচারতঃ কর্ম” (৪/২৩) ঐ সকল মহদনুভূতির উদয় হইয়া থাকে।” (মহানামব্রত ১৪৩)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নানাবিধ যজ্ঞ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

অন্যে সংযমরূপ অগ্নিতে চক্ষুর্কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে হোম করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে রূপরসাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান করেন, ইহার নাম সংযম-যজ্ঞ বা ব্রহ্মচর্য্য; অন্যে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সমূহকে আহুতি দেন-অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু তিনি রাগদ্বেষশূন্যচিত্তে অনাসক্তভাবে থাকেন। মুমুক্শু নির্লিপ্ত সংসারীরা এই যজ্ঞ করেন; ইহাকে বলা যায় ইন্দ্রিয়-যজ্ঞ। অন্য কেহ (ধ্যানযোগীগণ) সমস্ত ইন্দ্রিয়-কর্ম ও সমস্ত প্রাণকর্মকে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রদীপিত আত্মসংযম বা সমাধিরূপ যোগাগ্নিতে হোম করেন অর্থাৎ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ ইহাদের সমস্তকর্ম নিরোধ করিয়া আত্মানন্দসুখে মগ্ন থাকেন। ইহার নাম আত্মসংযম বা সমাধি যজ্ঞ। কেহ কেহ দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ তপোরূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ যোগরূপ যজ্ঞ করেন, কোন কোন দৃঢ়ব্রত যতিগণ বেদভ্যাসরূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ বেদার্থপরিজ্ঞানরূপ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। আবার অন্য যোগীগণ অপান বায়ুতে প্রাণবায়ু আহুতি প্রদান করেন, (কেহ কেহ) প্রাণে অপানের আহুতি দেন, অপর কেহ পরিমিতাহারী হইয়া প্রাণ ও অপানের গতিরোধপূর্ব্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে প্রাণে আহুতি দেন। (জগদীশচন্দ্র ১৫৮-১৬১, শ্লোক- ৪/২৬-২৯)

উল্লিখিত যজ্ঞগুলোর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, প্রতিটি যজ্ঞই ত্যাগাত্মক কর্ম। এদের কোনোটি দেবতা বা ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে ত্যাগ, কোনোটি ইন্দ্রিয়সংযমরূপ ত্যাগ, কোনোটি আসক্তির ত্যাগ, কোনোটি বা আত্মসংযমরূপ ত্যাগ। এছাড়া দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, প্রাণায়াম-যজ্ঞ প্রভৃতি ত্যাগেরই অপূর্ব মহিমা রয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে এরূপ বহুবিধ যজ্ঞ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। যেমন- হোমযাগ, ইষ্টিযাগ, সোমযাগ, সত্রযাগ, রাজকীয় যাগযজ্ঞ প্রভৃতি। অনুরূপভাবে পঞ্চ মহাযজ্ঞ নামেও বেদশাস্ত্রাদিতে পাঁচটি মহাযজ্ঞের বিধান রয়েছে যা বৈদিক সমাজব্যবস্থায় প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ হিসেবে পালন করা হতো।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ: বৈদিক যুগে আর্যঋষিগণ প্রত্যহ পাঁচ প্রকারের মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন যা শাস্ত্রে পঞ্চ মহাযজ্ঞ নামে অভিহিত। এই পাঁচ প্রকার মহাযজ্ঞ হল- (১) ভূতযজ্ঞ, (২) নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ, (৩) পিতৃযজ্ঞ, (৪) দেবযজ্ঞ এবং (৫) ব্রহ্মযজ্ঞ। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে- “পঞ্চ এব মহাযজ্ঞাঃ। তান্যেব মহাসত্রাণি - ভূতযজ্ঞো, মনুষ্যযজ্ঞঃ, পিতৃযজ্ঞো, দেবযজ্ঞো, ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি” (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১/৫/৬/১)। প্রাচীন আর্যসমাজে ঋষিগণ ভক্তিপূতহৃদয়ে প্রত্যহ উক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন, যা তাঁদের নিত্যকর্ম হিসেবে পরিগণিত ছিল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে- “পঞ্চ বা এতে মহাযজ্ঞাঃ সততি প্রতায়ন্তে সততি সন্তিষ্ঠন্তে দেবযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞঃ ইতি” (২/১০) - অর্থাৎ দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই দিনেই তার সমাপ্তি ঘটে। এ প্রসঙ্গে মনু বলেছেন-

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।

হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোতিথিসেবনম্॥ (মনুসংহিতা, ৩/৭০)

অর্থাৎ অধ্যাপনা ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দৈবযজ্ঞ, পশুদের জন্য খাদ্যাদি প্রদান ভৌতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবা হল মনুষ্যযজ্ঞ। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে এ পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক (২/১০) ও শতপথ ব্রাহ্মণ (১১/৫/৬) প্রভৃতি উত্তর বৈদিক সাহিত্যে এই মহাযজ্ঞের বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

এছাড়া মনুসংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রেও পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। নিম্নে এই পাঁচ প্রকার মহাযজ্ঞ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

দেবযজ্ঞ: দৈবযজ্ঞ হল দেবতার আরাধনা। আর্যঋষিগণ প্রকৃতির বক্ষে যেখানেই শক্তির বা সৌন্দর্যের উৎস আবিষ্কার করেছেন, তাঁর উপরেই দেবত্ব আরোপ করেছেন এবং তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পদে বরণ করে আন্তরিক গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতারূপ উপহার প্রদানে পরিতুষ্ট করেছেন। সূর্যের জ্বলন্ত প্রভা, তুষারমণ্ডিত হিমালয়, উষার রক্তিমচ্ছটা, প্রখর রশ্মিপ্রদীপ্ত, নিদাঘ মধ্যাহ্ন, বেগবতী নদী, ঝড়ের প্রবল বেগ, বৃষ্টির হিতকর জল, পর্বতাকার তরঙ্গবিশিষ্ট প্রসারিত সমুদ্র, অসংখ্য তারকামণ্ডিত গগনমণ্ডলের বিচিত্র সৌন্দর্য প্রভৃতি প্রকৃতির অনন্ত গৌরব অবলোকন করে তাঁরা এসব শক্তিকে দেবতা বোধে উপাসনা করেছেন। যে কারণে বিবিধ স্তব-স্তুতির মাধ্যমে বৈদিক যুগের ঋষিগণ অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র, তুষ্টা, সোম, সূর্য, উষা, সরস্বতী, পুষা, পৃথিবী, অর্যমা, অদিতি, প্রজাপতি, পর্জন্য, মিত্র, বিশ্বকর্মা প্রভৃতিকে দেবতার পদে অধিষ্ঠিত করে তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেছেন।

প্রকৃতির অফুরন্ত নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও অনন্ত শক্তিসম্পন্ন কার্যকলাপসমূহকে অলৌকিকত্ব আরোপপূর্বক এক একটি দেবতারূপে কল্পনা করলেও তাঁরা এ সত্যও উপলব্ধি করেছেন যে প্রকৃতির প্রতিটি কার্য একই নিয়মে চালিত হয় এবং সেই মহাপ্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা একমাত্র জগদীশ্বর। প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত দেবগণের কার্যসমূহ ভিন্ন নয়। তাঁদের সমবেত শক্তি, ক্ষমতা ও সামর্থ্যই সেই একক সত্ত্বাসম্পন্ন ঐশ্বরিক বল। তাই ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক ক্রিয়া অনন্তরূপী জগদীশ্বরের বিভিন্ন শক্তি ও সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি ছাড়া কিছুই নয়। বেদসংহিতার সর্বত্রই ঋষিদের কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়েছে বহুত্বের মধ্য দিয়ে একত্বের মহিমা প্রকাশ। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে (১/১৬৪/৪৬) দীর্ঘতমা ঋষি বলেছেন-

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণং অগ্নিমাহুঃ, অথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্ ।

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

অর্থাৎ- ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি ও দিব্যালোকের সুপর্ণ, সকলেই সৎ স্বরূপের প্রকাশ। ইনি এক হলেও বিদ্বানগণ একে বহু বলে বর্ণনা করেন। তাঁকেই অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলে অভিহিত করেন।

অথর্ববেদেও ধ্বনিত হয়েছে নিখিল বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপ-প্রকাশক একই সুর-

স ধাতা স বিধর্তা স বায়ুর্নভ উচ্ছিতম্॥

সো অর্যমা স বরুণঃ স রুদ্রঃ স মহাদেবঃ॥

সো অগ্নিঃ স উ সূর্যঃ স উ এব মহাযমঃ॥ (১৩/৪/১,৩-৫)

“তিনি ধাতা, তিনি বিধর্তা, তিনি বায়ু এবং তিনি উর্ধ্বস্থিত নভ। তিনি অর্যমা, তিনি বরুণ, তিনি রুদ্র, তিনিই মহাদেব। তিনি অগ্নি, তিনি সূর্য এবং তিনিই মহাযম।” ঋগ্বেদে সপ্রি ঋষি বলেছেন-

সুপর্ণং বিপ্রা কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি ।

ছন্দাংসি চ দধতো অধ্বরেষু গ্রহান্ত্ৰসোমস্য মিমতে দ্বাদশা॥ (১০/১১৪/৫)

“সুপর্ণ (পরম ব্রহ্ম) একই আছেন। কবিরা তাঁকে বহুরূপে কল্পনাপূর্বক বর্ণনা করে থাকেন।

তাঁরা যজ্ঞের সময় নানা ছন্দ উচ্চারণ করেন এবং দ্বাদশসংখ্যক সোমপাত্র সংস্থাপন করেন।” ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে কাণ্ব ঋষি বলেছেন-

এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ ।

একৈবেষাঃ সর্বমিদং বিভাত্যিকং বা ইদং বি বভূব সর্বম্ ॥ (৮/৫৮/২)

“এক অগ্নি বহুপ্রকার সমৃদ্ধ হয়েছেন, এক সূর্য সমস্ত বিশ্বে প্রভূত হয়েছেন। এক উষা এ সকলকে প্রকাশ করেছেন। এ একই সর্বপ্রকার হয়েছেন।” বিশ্বের অনন্ত কার্যপরম্পরাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে স্তুতি করা হলেও সে কার্যসমূহ যে ভিন্ন নয় অর্থাৎ সমস্ত দেবগণের মধ্যে যে একটি মহৎ প্রাণশক্তি সমাহিত তা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ধ্বনিত হয়েছে ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে (৩/৫৫) ঋষি প্রজাপতির কণ্ঠে। সূক্তটির ২২টি ঋকের প্রত্যেকটিতেই শেষে উল্লেখ করা হয়েছে ‘মহদেবানামসুরত্বমেকম্’। অর্থাৎ- সমস্ত দেবগণের মধ্যে ‘অসুরত্ব’ তথা মহান চৈতন্যশক্তি একই। প্রচলিত অর্থে সুরবিরোধীকে অসুর বোঝানো হলেও, এখানে অসুর অর্থে প্রাণকে বোঝানো হয়েছে এবং নিখিল বিশ্বময় বিরাজিত প্রাণশক্তির মূলকেই বলা হয়েছে ‘অসুরত্ব’।

আর্যঋষিগণ এভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, একটি মহৎ প্রাণশক্তি সমস্ত দেবতার মধ্যে সমাহিত থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে যাচ্ছেন আর ভিন্ন ভিন্ন দেবতার এই শক্তিসমূহ একই পরমা শক্তির বিভূতি মাত্র। এক বৃক্ষ যেমন তার শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব, কাণ্ড-মূল প্রভৃতির সাহায্যে নিজেকে পরিপুষ্ট করে, আবার তার প্রাণশক্তি দিয়ে এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখে এবং এগুলোকে বাদ দিয়ে যেমন বৃক্ষের আলাদা কোনো সত্তা কল্পনা করা যায় না, তেমনি বহু দেবতার মূল প্রাণশক্তি এক পরব্রহ্মের মধ্যেই নিহিত এবং এই পরব্রহ্মের অনন্ত বিভূতির সম্যক প্রকাশ এই বহুদেবতার মধ্য দিয়ে।

পরমেশ্বরের অসীম গুণরাজির ভিন্ন ভিন্ন বহিঃপ্রকাশ এই দেবগণের নিকট মানুষের ঋণ অপরিসীম। পরব্রহ্মের অনন্ত শক্তি ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপে ক্রিয়াশীল থেকে মানব জীবনকে পরিচালিত করছে। তাই এসব দেবতার ঋণ স্বীকার করে তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ আরাধনা করা বিধেয়। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবগণকে প্রত্যহ পরিতুষ্ট করাই দেবযজ্ঞ। বৈদিক যুগ হতে আর্যঋষিগণ কর্তৃক প্রচলিত দেবযজ্ঞ ঋষিপরম্পরায় অদ্যাবধি সনাতনী জীবনব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে- “যদ্ অগ্নৌ জুহোত্যপি সমিধং তদ্ দেবযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে” (২/১০)। অর্থাৎ, অগ্নিতে সমিধ আহুতি দিলে দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। যজুর্বেদে বলা হয়েছে,

সমিধাগ্নিং দুবম্যত ঘৃতৈর্বোধয়াতিথিম্।

অগ্নিন্ হব্যা জুহোতন॥ (৩/১)

অর্থাৎ- হে মনুষ্য! ঘৃতাди শুদ্ধ দ্রব্যের সহিত কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত কর। এই অগ্নিতে পুষ্টি মধুর-সুগন্ধি রোগনাশক পদার্থের বিশেষভাবে আহুতি প্রদান কর। এই দেবযজ্ঞ বা অগ্নিহোত্র পালন কর।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সকল মানবকে সম্বোধন করে বলেছেন-

দেবান্ ভাবয়তাংনেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তুঃ শ্রেয়ঃ পরমবান্ধ্যথা॥ (৩/১১)

অর্থাৎ- তোমরা যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণকে সম্বর্ধনা কর, দেবগণও তোমাদিগকে সম্বর্ধিত করুন। এইরূপে পরম্পরের সম্বর্ধনাদ্বারা পরম্পর মঙ্গললাভ করিবে।

সূর্য আমাদেরকে কিরণ দান করে, চন্দ্র জ্যোৎস্না বিতরণ করে, বৃষ্টির ধারা ধরণীকে রসসিক্ত করে, বায়ু জীবের প্রাণশক্তি সঞ্চালন করে, ধরণী ফসলাদি বিভিন্ন আহার্য উৎপাদন করে। এভাবে মহাপ্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপ দেবতারা আলো, বাতাস, জল, বায়ু, আহার্য প্রভৃতি জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য উপাদানসমূহ সরবরাহের মাধ্যমে জীবের জীবনযাত্রাকে সচল রেখেছে। তাই দেবতাদের কল্যাণে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি শুধুমাত্র ভোগের নিমিত্ত ব্যয়

না করে এর কিছু অংশ দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা অর্থাৎ দেবদত্ত দ্রব্যাদির দ্বারা দেবযজ্ঞ সম্পাদন করা বিধেয়। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সং॥ (৩/১২)

অর্থাৎ- যজ্ঞের ফলে সম্ভূষ্ট হয়ে দেবতারা তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ্য বস্তু প্রদান করবেন। সুতরাং দেবতাদের দেওয়া বস্তু দেবতাদের নিবেদন না করে যিনি ভোগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই চোর।

সুতরাং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা দেবগণকে প্রত্যহ পরিতৃপ্ত করা আবশ্যিক। দেবসেবাদ্বারা মানুষের চিত্তদেহাদি বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়, ক্রমশ মানুষের অন্তরে সত্ত্বগুণের পরিস্ফুরণ হয়ে দেবভাব আবির্ভূত হয় এবং কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপে ক্রিয়াশীল নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি জন্মে।

পিতৃযজ্ঞ: পিতৃযজ্ঞ হল পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যজ্ঞ। পিতৃযজ্ঞ দ্বিবিধ- শ্রাদ্ধ ও তর্পণ। পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাপূর্বক শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে যথোপচারে নির্দিষ্ট সময় পর পর যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাকে শ্রাদ্ধ বলে। এই শ্রাদ্ধকর্ম মাসিক কিংবা বার্ষিক অনুষ্ঠিত হয়। পরলোকগত পিতৃপুরুষের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় কৃত কর্মানুষ্ঠান হল তর্পণ। অর্থাৎ, পার্থিব শরীর ত্যাগ করে পিতৃপুরুষের আত্মা পরলোকে গমন করলে তাঁদের উদ্দেশ্যে উত্তরসূরী কর্তৃক শ্রাদ্ধ ও ভক্তি সহকারে প্রত্যহ জল-তিলাদি উৎসর্গ করাকে তর্পণ বলে।

পিতৃপুরুষের বংশ পরম্পরায় মানুষ এই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করে থাকে। পিতামাতা শুধুমাত্র আমাদেরকে জন্মদান করেন না, স্নেহ, মায়া ও পরম মমতায় তাঁরা আমাদেরকে লালন পালন করে থাকেন। তাই মনুষ্যজন্ম লাভ ও পৃথিবীতে এই মানব শরীর ধারণে পিতামাতার ঋণ কখনো শোধ করার নয়। এতদসত্ত্বেও সেই ঋণ স্বীকারার্থে জীবিতাবস্থায় পিতামাতাকে যথাযথ সেবাপ্রদান এবং পরলোক গমন করলে তাঁদের ঔদ্ধদৈহিক প্রেতকৃত্য যথাবিধি সমাপন করে তাঁদের পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে প্রত্যহ তর্পণ করা প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য। প্রতিদিন স্নানান্তে পবিত্র মনে পরলোকস্থিত পিতৃপুরুষকে স্মরণ এবং তাঁদের প্রতি ভক্তি ও শ্রাদ্ধাপূর্বক জলাঞ্জলি প্রদান করাই পিতৃযজ্ঞ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে- “যৎপিতৃভ্যঃ স্বধা করোতাপস্তং পিতৃযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে।” (২/১০) অর্থাৎ- পিতৃগণের উদ্দেশ্যে স্বধা মন্ত্রে জল প্রদান করলে পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। যজুর্বেদে বলা হয়েছে-

উর্জং বহস্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিশ্রুতম্।
স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৃন। (২/৩৪)

অর্থাৎ- আমরা প্রত্যেকে জীবিত মাতা পিতা, গুরু জন ও বিদ্বান্ পুরুষদিগকে উত্তম রস, সুস্বাদু জল, সুমিষ্ট রোগ নাশক পদার্থ, ঘৃত, দুগ্ধ, সুরক্ষিত অন্ন ও সুপক্ক রসাল ফল দ্বারা তৃপ্ত করিব। পরধনে লোভ না করিয়া নিজধনে তৃপ্ত থাকিব।

পুনর্জন্মবাদ সনাতন ধর্মের মূল স্তম্ভ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে- “জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ” (২/২৭)। অর্থাৎ- যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যসম্ভাবী; এবং যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও অবশ্যসম্ভাবী। কিন্তু যাদের মোক্ষলাভ হয় তাঁদের জন্মমৃত্যুর আবর্তে পতিত হতে হয় না। এ প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন-

আব্রক্ষভুবনান্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ (৮/১৬)

অর্থাৎ- হে অর্জুন! এই ভুবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল অর্থাৎ পুনর্জন্মপ্রাপ্ত। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

সুতরাং জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি না হলে পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে আত্মা কোনো বিশেষ দেহ প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। সেই দেহের মাধ্যমে কিছুকাল জড় জগতে অবস্থান করার পর দেহের বিনাশ হয় তথা জীবাত্মা মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর জীবের সূক্ষ্ম বা কারণ-শরীরের বিনাশ হয় না, কেবল স্থূল পাক্ষণ্ডভৌতিক শরীরেরই ধ্বংস হয়। এই সূক্ষ্ম পাক্ষণ্ডভৌতিক দেহের নাম আতিবাহিক দেহ (দেবেন্দ্রবিজয় ৪৭৪)। এই আতিবাহিক দেহে জাগতিক কামনা-বাসনা ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি থাকে কিন্তু তা গ্রহণ করার সক্ষমতা থাকে না। এ অবস্থায় ইহজগতের কোনো পুত্রাদি প্রিয়জন যদি তাঁদের স্মরণে জলধারার সঙ্গে তার প্রিয় বস্তু শ্রদ্ধার সাথে উৎসর্গ করে, তাহলে সেই সূক্ষ্ম দেহ পরিতৃপ্ত হয়। তাই পিতৃপুরুষের ঋণ স্বীকারার্থে তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সাথে প্রত্যহ তর্পণ ক্রিয়ার মাধ্যমে পিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সকলের বিধেয়। পিতামাতার ঋণ সন্তানের পক্ষে কখনো শোধ করা সম্ভব নয়। তথাপি আর্ঘ্যঋষিগণ পরলোকস্থিত পিতামাতার প্রতি আমৃত্যু ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উপায়স্বরূপ তাঁদেরকে প্রত্যহ স্মরণপূর্বক জলাঞ্জলি প্রদানের যে বিধান রেখে গেছেন, এতে করে প্রত্যেক সনাতনিকে পিতামাতার প্রতি অকৃতজ্ঞতারূপ মহাপাপ-পক্ষে নিমজ্জিত হওয়া থেকে পরিত্রাণের উপায় নির্দেশ করে গেছেন।

ভূতযজ্ঞ: ‘ভূত’ অর্থ প্রাণি। প্রাণিবর্গের আহারের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ নিবেদিত দ্রব্যাদি ত্যাগরূপ যজ্ঞই ভূতযজ্ঞ। মানুষের চারপাশে ঘিরে আছে জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের সমন্বয়ে বিশাল এক প্রাণের জগৎ। এই প্রাণের জগৎ অর্থাৎ ভূতাদি জগৎ এবং মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষ এই ভূতাদির দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে। মানুষ তাই এদের নিকট অশেষভাবে ঋণী। তাই এই ঋণ হতে পরিত্রাণের জন্য জগতের দৃষ্ট-অদৃষ্ট, স্থূল-সূক্ষ্ম সমস্ত রকম প্রাণীকুল হতে শুরু করে বৃক্ষরাজি প্রভৃতির প্রতিনিয়ত সেবা ও পরিচর্যা করা মানুষের অন্যতম কর্তব্য।

প্রাচীন ভারতীয় আর্ঘ্যগণ সর্বতোভাবে সমদর্শী ও উদার ছিলেন। স্বোদর ও স্বার্থ পরিতৃপ্তিকে চিরকাল তাঁরা হীন বলে মনে করতেন। তাঁরা প্রাণীবর্গের সুখ দুঃখ অনুভব করতে পারতেন। তাঁরা উপলব্ধি করতেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুর মধ্যে একই ইষ্টদেবতার প্রাণশক্তি বিদ্যমান। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্র পরিব্যপ্ত রয়েছেন, তিনি ভূতাদি কাল এবং স্বরাদি লোকত্রয় ধারণ করে আছেন। তিনি অনন্ত ও অন্তবান, তিনি বিশ্বরূপ ধারণপূর্বক প্রাণিবর্গের অভ্যন্তরে অদৃশ্যভাবে বিরাজমান। এ প্রসঙ্গে অথর্বসংহিতায় বলা হয়েছে-

যো ভূতঞ্চ ভব্যঞ্চ, সর্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি।

স্বর্ষস্য চ কেবলং, তস্মৈ জেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥

ঋস্তে নেমে বিষ্টভিতে, দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ তিষ্ঠতঃ।

ঋস্ত ইদং সর্বমাত্মনং, যৎ প্রাণং নিমিষচ্চ যৎ॥ (১০/৮/১-২)

তাঁরা বিশ্বাস করতেন সর্বদেহধারী প্রাণিবর্গের মধ্যেই একই পরমাত্মা বিরাজিত। তাই সর্ববিধ প্রাণিবর্গকে আহার্য বস্তু প্রদান ও যথোচিত সৎকারের দ্বারা পরিতুষ্ট করার মাধ্যমে পরমেশ্বরেরই সন্তুষ্টি বিধান করতেন আর্ঘ্যঋষিগণ। এ কারণে তাঁরা স্ব স্ব আহার্য বস্তুর কিছু অংশ ভূতবর্গের ক্ষুদ্রনিবারণার্থে নিয়োগ করে ভূতযজ্ঞের বিধান করে গেছেন। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে-

প্রজাভ্যঃ পুষ্টিং বিভজন্ত আসতে রয়িমিব পৃষ্ঠং প্রভবন্তমায়তে।

অসিষন্দংষ্ট্রৈঃ পিতুরতি ভোজনং যন্তাকৃণোঃ প্রথমং সাসুক্খ্যঃ। (২/১৩/৪)

অর্থাৎ- গৃহাগত সৎ পুরুষের জন্য ধারক ও পোষকধনকে গৃহস্থ যেমন ভাগ করে দেন, পুত্র পিতৃগৃহে যেমন ভোজন করে তেমনই হে ভগবন্! গৃহমেধী ভক্তেরা ভগবান প্রদত্ত পোষকধনকে প্রজাদের মধ্যে সমবন্টন করে নিজ গৃহে সুখে বাস করেন। যিনি এই সুখকর কর্মের বিধান করেছেন তিনিই আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা।

বৈদিক যুগ হতে পঞ্চ মহাযজ্ঞের অংশ হিসেবে সনাতনী সমাজে এ ভূতযজ্ঞের বিধান চলে আসছে। আর্যঋষিদের নিকট প্রতিটি জীবই ছিল কাছে সমান গুরুত্বসম্পন্ন। চিত্ত তাঁদের উচ্চ-নীচ ভেদশূন্য হওয়ায় মনুষ্য থেকে শুরু করে যাবতীয় ইতর প্রাণীর মধ্যে তাঁরা প্রভেদ কল্পনা করতেন না। বিশ্বের সকল প্রাণীর মধ্যে তাঁরা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেছেন। সর্বভূতেই যে ব্রহ্ম বিরাজমান তা উপনিষদে ধারণিত হয়েছে-

যন্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মান্যেবানুপশ্যতি।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজগুস্ততো॥ (ঈশোপনিষদ, ৬)

অর্থাৎ- যিনি সমস্ত ভূত অর্থাৎ প্রাণীমাত্রকে সেই পরমাত্মাতেই স্থিত দর্শন করেন এবং সমস্ত ভূতে অর্থাৎ প্রাণীমাত্রেরই অবস্থিত সেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি তখন কোনো প্রাণীকেই ঘৃণা করেন না। প্রকাশমান বিশ্বের যে কোনো জীবসত্তার এভাবে সেবা করার নামই ভূতযজ্ঞ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে- “যদ্ ভূতেভ্যো বলিং হরতি তদ্ ভূতযজ্ঞঃ সন্তীষ্ঠতে” (২/১০)। অর্থাৎ- ভূতগণের তথা প্রাণীকুলের উদ্দেশ্যে বলিপ্রদান অর্থাৎ আহার্য দ্রব্যাদি উৎসর্গ করলে ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। শংকরাচার্যের মতে- “জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ।” অর্থাৎ- জীবই ব্রহ্ম, অপর কিছু নয়। এ কারণে সনাতনী ঋষি ও সাধু-মহাত্মাগণ মনুষ্য থেকে শুরু করে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি প্রভৃতি প্রাণীজগৎ ও বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদি উদ্ভিদজগৎ -সমস্ত ভূতাদিতে পরমাত্মার উপলব্ধিহেতু এবং জগদ্ব্যবস্থায় এসব ভূতাদির উপকার তথা ঋণ স্বীকারার্থে প্রত্যহ এদের উদ্দেশ্যে আহার্য দ্রব্য প্রদান অথবা অন্য কোনো উপায়ে এদের সেবা করা তথা ভূতযজ্ঞ সম্পাদন করার বিধান রেখেছেন।

অতিথিযজ্ঞ বা ন্যূজ বা মনুষ্যযজ্ঞ: যাঁর আগমনের কোনো তিথি বা নির্ধারিত ক্ষণ থাকে না অর্থাৎ যিনি অকস্মাৎ গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হন, তাঁকে অতিথি বলা হয়। এই অতিথিদের যথোচিত সৎকার এবং জগতের যে কোনো প্রকার দুর্গত মানুষকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করাই অতিথিযজ্ঞ বা ন্যূজ বা মনুষ্যযজ্ঞ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে- “যদ্ ব্রাহ্মণেভ্যোহন্নং দদাতি তন্মানুষ্যযজ্ঞঃ সন্তীষ্ঠতে” (২/১০)। অর্থাৎ- কমপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণকে ann প্রদান করলে মনুষ্যযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। মানুষ একাকী জগতে বাস করতে পারে না। কোনো না কোনো ভাবে সে প্রতিবেশী, সমাজ অথবা দেশ কিংবা সমগ্র বিশ্বের মানবকুলের দ্বারা প্রতিনিয়ত উপকার লাভ করে থাকেন। তাই মানুষের এ ঋণ শোধ করার জন্য প্রত্যহ মানবসেবায় আত্মনিয়োজিত থাকা প্রতিটি মানুষের উচিত। সময়ে হোক বা অসময়ে হোক, গৃহে কোনো অতিথির আগমন ঘটলে নিজের আহার্য দ্রব্য সেই অতিথিকে দিয়ে হলেও তাঁর সেবা করা বিধেয়। বৈদিক ঋষিগণ অতিথিসেবাকে কতটুকু গুরুত্ব দিতেন এবং তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় তার কিরূপ অপরিহার্যতা ছিল তা বেদশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। অথর্ববেদে (৯/৬/৩/১-৯) অতিথিযজ্ঞ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

ইষ্টং চ বা এষ পূর্তং চ গৃহাণামশ্লাতি যঃ পূর্বোহতিথেরশ্লাতি॥

পয়শ্চ বা এষ রসং চ গৃহাণামশ্লাতি যঃ পূর্বোহতিথেরশ্লাতি॥

উর্জাং চ বা এষ স্ফাতিং চ গৃহাণামশ্লাতি যঃ পূর্বোহতিথেরশ্লাতি॥

প্রজাং চ বা এষ পশুং চ গৃহাণামশ্লাতি যঃ পূর্বোহতিথেরশ্লাতি॥

কীর্ত্তিং চ বা এষ যশশ্চ চ গৃহাণামশ্লাতি যঃ পূর্বোহতিথেরশ্লাতি॥

শ্রিয়ং চ বা এষ সংবিদং চ গৃহাণামশ্লাতি যঃ পূর্বোহতিথেরশ্লাতি॥

এষ বা অতিথির্যচ্ছোত্রিয়ন্তুমাৎ পূর্বো নান্নীয়াৎ॥

অশিতাবতিথাবল্লীয়াদ্ যজ্ঞস্য সাত্বাত্ম্য যজ্ঞস্যাবিচ্ছেদায় তৎ ব্রতম্॥

এতদ্বা উ স্বাদীয়ো যদধিগবৎ ক্ষীরং বা মাংসং বা তদেব নাল্লীয়াৎ॥

অর্থাৎ- যে গৃহস্থ অতিথির পূর্বে ভোজন করেন, তিনি গৃহের ইষ্টসুখ, পূর্ণতা, পরাক্রম, বৃদ্ধি, কীর্তি, যশ, শ্রী এবং জ্ঞান ভোজন করেন। বেদজ্ঞানী মাত্রই অতিথি। সুতরাং অতিথির পূর্বে ভোজন করা অনুচিত। অতিথির ভোজন করার পরে গৃহস্থ ভোজন করবে। যজ্ঞের অনুভূতি এবং যজ্ঞের নিরন্তর প্রবৃত্তির জন্য এটাই নিয়ম। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে-

অদত্ত্বা তু য এতেভ্যঃ পূর্বং ভুক্ত্বৈবিচক্ষণঃ ।

স ভুঞ্জানো ন জানাতি ঋগ্ধৈর্জক্ষিমাঅনঃ॥

ভুক্তবৎস্থ বিপ্রেসু স্বেসু ভূত্যেসু চৈব হি ।

ভুঞ্জীয়াতাং ততঃ পশ্চাদবশিষ্টন্তু দম্পতিঃ ॥ (৩/১১৫-১১৬)

অর্থাৎ- যে অজ্ঞ ব্যক্তি অতিথি ও ভূত্য প্রভৃতিকে অন্ন না দিয়ে নিজেই ভোজন করে, সে জানে না যে, সে মারা গেলে শকুনি-কুকুরেরা তার দেহ ভক্ষণ করবে। প্রথমে ব্রাহ্মণ-অতিথি ও দাসদাসী ভোজন করবে, পরিশেষে অবশিষ্ট যা কিছু থাকবে, গৃহস্থ সপত্নীক তা ভোজন করবে। সনাতন ধর্মশাস্ত্রসমূহে এভাবে অতিথি ও মনুষ্যসেবার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই অতিথিসেবার পাশাপাশি প্রত্যহ কোনো না কোনো উপায়ে মনুষ্যসেবা করাও সকলের উচিত। নির্বিশেষে ক্ষুধার্ত মানুষকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, গৃহহীনকে আশ্রয়দান, শারিরীক পীড়াগ্রস্ত মানুষকে সেবাদান প্রভৃতির মাধ্যমে এ মনুষ্যযজ্ঞ সম্পাদন করা যায়। সর্বদেবময় অতিথি ও মনুষ্য পূজনে ইহকালে যেমন যশোলাভ হয়, তেমনি পরকালেও সুকৃতিজনিত স্বর্গলাভ বা মোক্ষলাভ ঘটে থাকে।

ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ: বেদশাস্ত্রের অধ্যয়ন অর্থাৎ স্বাধ্যায় এবং অপরকে অধ্যয়ন করানোই ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ। আর্যঋষিগণ যে অসীম অধ্যাত্ম জ্ঞানের ভাণ্ডার বেদশাস্ত্র এবং বেদানুকূল অপরাপর শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে সঞ্চিত রেখে গেছেন, প্রত্যেকের উচিত ঋষিযজ্ঞরূপ ক্রিয়ার মাধ্যমে সেই পরম জ্ঞান আত্মস্থ করা, সেই জ্ঞান প্রত্যহ চর্চা করা এবং সর্বসাধারণের মধ্যে নিয়ত সেই জ্ঞানের দীপ্তি ছড়িয়ে দেয়া। সনাতন ধর্ম ঋষিশাসিত ধর্ম এবং এ ধর্মের বিধি-বিধান ঋষিদর্শিত জ্ঞানের আকর বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থেই নিহিত। এসব শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার দ্বারাই মানবমন পার্থিব বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্বক সেই অনন্ত শক্তিমান পরব্রহ্মে লীন হতে পারে। এজন্য এর নাম ব্রহ্মযজ্ঞ। তাই সনাতনী চেতনায় উদ্ভাসিত প্রতিটি মানুষের প্রতিদিন এই বেদশাস্ত্রের আংশিক হলেও অধ্যয়ন ও পাশাপাশি অধীত বিদ্যা অপরকে শেখানোর প্রয়াস করা উচিত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে- “যৎ স্বাধ্যায়ম্ অধীয়াতৈকামপ্যচং যজুঃ সাম বা তদ্ ব্রহ্মযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে” (২/১০)। অর্থাৎ- স্বাধ্যায় বা বেদ অধ্যয়ন করলে, অন্তত একটি ঋক্, একটি যজু বা একটি সাম অধ্যয়ন করলে ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ সম্পন্ন করা হয়।

বৈদিক ঋষিগণই সনাতনী সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরা যে বেদবিদ্যা দর্শন করেছেন, সেই বেদবিদ্যাই এ সমাজের প্রাণ। এ বেদশাস্ত্র ছাড়াও যুগে যুগে সনাতনী ভাবধারার বহু ধর্মশাস্ত্র ঋষিগণ কর্তৃক রচিত হয়েছে। তাই বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেকের উচিত ঋষিপরম্পরা প্রাপ্ত সেই শাস্ত্রগ্রন্থাদি হতে অধীত বিদ্যা হৃদয়ে লালন করা, প্রত্যহ চর্চা করা এবং অপরের নিকট সেই বিদ্যা পৌঁছে দেয়া। ঋগ্বেদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জন্য ইব ততনঃ ।

গায় গায়ত্রমুক্খ্যম্ ॥ (১/৩৮/১৪)

অর্থাৎ- মুখে শ্লোক রচনা করা, পর্জনের ন্যায় তা বিস্তার করা; উকথস্ততি বিশিষ্ট গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত (সূক্ত) পাঠ করা উচিত। অর্থাৎ- প্রত্যেক মানুষকেই বেদমন্ত্র কণ্ঠস্থ করে তা থেকে আহরিত ও সঞ্চিত জ্ঞান অন্যদের নিকট

প্রচার করা উচিত। এভাবে বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের দ্বারা যে অপৌরুষেয় বেদবিদ্যা প্রাপ্ত হওয়া গেছে, তা রক্ষা করা বেদপন্থী প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। আর সে দায়িত্ব পালনার্থে প্রত্যহ বেদশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা আবশ্যিক। বেদশাস্ত্রাদির যে শাখা পুরুষানুক্রমে প্রচলিত হয়ে আসছে, প্রত্যহ সেই বেদশাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই ব্রক্ষযজ্ঞ।

স্বকীয় বেদশাখা অধ্যয়নের নামই স্বাধ্যায়। যজ্ঞ সম্পাদনে বিবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই স্বাধ্যায় বা ব্রক্ষযজ্ঞ সম্পাদনে এরূপ কোনো দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয় না। এ প্রসঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণে (১১/৫/৬/৩) বলা হয়েছে-

অথ ব্রক্ষযজ্ঞঃ। স্বাধ্যায়ো বৈ ব্রক্ষযজ্ঞঃ। তস্য বৈ এতস্য ব্রক্ষযজ্ঞস্য বাগেব জুহু, মন উপভূৎ, চক্ষু ধ্রুবা, মেধা শ্রবঃ, সত্যং অবভূথঃ, স্বর্গো লোকঃ উদয়নং। যাবজ্জ হ বৈ ইমাঙ পৃথিবীং বিত্তেন পূর্ণাং দদং, লোকং জয়তি ত্রিষ্টাবজ্জং, জয়তি ভূরাংসং চ অক্ষযাং, -য এবং বিদ্বানহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োহুদ্যেতব্যঃ।

“এই যে ব্রক্ষযজ্ঞ, বাক্যই এই যজ্ঞের জুহু, মন এর উপভূৎ, চক্ষু এর ধ্রুবা, মেধা এর শ্রব, সত্যই এর অবভূথ লান, স্বর্গলোক এর উদয়ন বা সমাপ্তি। যিনি ব্রক্ষযজ্ঞের বিষয় এরূপে সম্যক অবগত হয়ে স্বকীয় শাখায় প্রচলিত বেদ প্রত্যহ অধ্যয়ন করেন, তিনি ধন পূর্ণা মেদিনীমণ্ডল প্রদাতা অপেক্ষা তিন গুণ অবিনশ্বর লোক লাভের অধিকারী হন।” ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের মন্ত্র অধ্যয়নে কিরূপ আত্মত্যাগ ফল লাভ করা যায় এবং ভক্তিপূতহৃদয়ে এসব শাস্ত্রাদির স্বাধ্যায়ের ফলস্বরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম পূর্বক জীবাত্মার পরব্রহ্মে লীন হওয়ার বিষয়েও বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে শতপথ ব্রাহ্মণে,

পয়াহুতয়ো হ বৈ এতা দেবানাং, যদ্ ঋচঃ। স য এবং বিদ্বান্ ঋচোহরহঃ স্বাধ্যায়ং অধীতে, পয়াহুতিভিরেব তদ্ দেবাংস্তপয়তি। ত এণং তৃপ্তাস্তপয়ন্তি যোগক্ষেমেণ প্রাণেন রেতসা সর্বাঅনা সর্বাভিঃ পুণ্যাভিঃ সম্পত্তিঃ ঘটকুল্যা মধুকুল্যাঃ পিতৃন্ স্বধা অভিবহন্তি।

আজ্যাহুতয়ো হবৈ এতো দেবানাং যদ্ যজুঃষি। স য এবং বিদ্বান্ যজুঃষ্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে, আজ্যাহুতিভিরেব তদ্ দেবাংস্তপয়তি। তে এণং তৃপ্তা স্তপয়ন্তি যোগক্ষেমেণ ইত্যাদি।

সোমাহুতয়ো হ বৈ এতা দেবানাং যৎ সামানি। স য এবং বিদ্বান্ সামানি, অহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে, সোমাহুতিভিরেব তদ্ দেবাংস্তপয়তি। ইত্যাদি।

মেদাহুতয়ো হ বৈ এতা দেবানাং যৎ অথর্বাসিরসঃ। স য এবং বিদ্বান্ অথর্বাসিরসো, অহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে, মেদাহুতিভিরেব তদ্ দেবাংস্তপয়তি। ইত্যাদি।

মধ্বাহুতয়ো হ বৈ এতা দেবানাং, যদ্ অনুশাসনানি, বিদ্যা, বাকোবাক্যং, ইতিহাসঃ, পুরাণং, গাথা, নারাসংস্যাঃ। স যঃ এবং বিদ্বান্ ইত্যাদি।

তস্য বৈ এতস্য ব্রক্ষযজ্ঞস্য চত্বারো বষট্কারাঃ যদ্ বাতো বাতি, যদ্ বিদ্যোততে, যৎ স্তনয়তি, যদ্ অবস্কৃজ্জতি ন অধীয়ীত এব বষট্কারাণাং অচ্ছবষট্কারায়,। অতি হ বৈ পুনর্মৃত্যুং মুচ্যতে, গচ্ছতি ব্রাহ্মণঃ সাত্মতাম্। স চেদপি প্রবলমিব ন শকুয়াদপ্যেকং দেবপদং অধীয়ীত এব। তথা ভূতেভ্যো ন হীয়তে। (১১/৫/৬/৪-৯)

“প্রতিদিন ঋগ্বেদীয় ঋগধ্যয়নে দেবতাগণের উদ্দেশ্যে ঘটাহুতির ফল পাওয়া যায়। ঋগধ্যয়নরূপ ঘটাহুতি দ্বারা যিনি প্রত্যহ দেবতাগণের পরিতৃপ্তি বিধান করেন, তিনি দেবগণের আশীর্বাদবলে বীর্যবান, পুণ্যাত্মা, ধর্মশীল, ধনশালী ও নিরোগী হয়ে থাকেন। স্বধামন্ত্রে ঘট-মধু সলিলাদি পিতৃলোকগণের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ প্রদান করলে পিতৃলোক যেমন তুষ্ট হন, সেই রূপ স্বশাখা প্রচলিত ঋগ্বেদ অধ্যয়নে তাঁরা পরিতৃপ্তি লাভ করেন সন্দেহ নেই।

এইরূপ যজুর্বেদ অধ্যয়নে ঘৃতাছতির, সামবেদ অধ্যয়নে সোমরসপূর্ণ আহুতির এবং অথর্বঙ্গিরস বেদ অধ্যয়নে মেদাহুতির ফল লাভ হয়। এতে করে দেবগণ ও পিতৃগণ সকলেই সন্তুষ্ট থাকিয়া আশীর্বাদ করেন। ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, গাঁথা ও স্তুতি প্রতিদিন রীতিমত অধ্যয়ন দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে মধুদ্বারা প্রদত্ত আহুতির ফল লাভ হয়। তাঁর প্রতি দেবলোক ও পিতৃলোক সদা সন্তুষ্ট থেকে তাঁর সর্বাঙ্গীন কল্যাণ বিধান করেন। ব্রহ্মযজ্ঞের চতুর্বিধ বষট্কার বা নিবৃত্তি। ঝড়ের কালে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকলে, বিদ্যুৎ দৃষ্ট হলে, মেঘগর্জন ও বজ্রনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হলে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। যিনি এ সকল বিষয় সম্যকরূপে অবগত হয়ে প্রত্যহ বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন, তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম পূর্বক পরব্রহ্মে বিলীন হন। সমগ্র বেদ অধ্যয়নে অসমর্থ ব্যক্তি একটি দেবস্তুতি অধ্যয়ন করলেও পরকালে সদগতি প্রাপ্ত হয়।”

এভাবেই শতপথ ব্রাহ্মণের উল্লেখিত মন্ত্রসমূহে প্রত্যহ ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের মন্ত্র অধ্যয়নের ফল অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। শুধুমাত্র বেদশাস্ত্র নয়, এসব অধ্যয়নের পাশাপাশি অপরাপর শাস্ত্রগ্রন্থাদি যেমন- ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, গাঁথা ও স্তুতি প্রভৃতিরও চর্চা করা উচিত। এসব শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মাধ্যমেই মানুষ একদিকে যেমন ঋষিঋণ শোধ করতে সক্ষম হন, অপরদিকে এই শাস্ত্রলব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের ফলে অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন সংসার হতে পরিত্রাণপূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করতে সক্ষম হন। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে- ব্রহ্মযজ্ঞের দ্বারা জীবাত্মা অবিদ্যা ও অন্ধকার হতে মুক্ত হয়ে পরমাত্মার সাথে মিলিত হতে পারে-

যুঞ্জন্তি ব্রহ্মমরুৎ চরন্তু পরিতস্থুঃ।

রোচন্তে রোচনা দিবি। (১/৬/১)

অর্থাৎ-বিদ্বানগণ ব্রহ্মযজ্ঞ বা উপাসনা যোগদ্বারা স্বীয় আত্মাকে মহান, হিংসারহিত, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত যুক্ত করেন। তাঁদের আত্মা অবিদ্যা, অন্ধকার হতে মুক্ত হয়ে জ্যোতির্ময় পরমাত্মার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। অতএব ঋষিঋণ শোধ এবং সেই সাথে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে একীভূতকরণের লক্ষ্যে বৈদিক যুগ থেকে আর্ষঋষিগণ কর্তৃক প্রচলিত এ ব্রহ্মযজ্ঞ প্রত্যহ সম্পাদন করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

উপসংহার: বৈদিক ঋষিগণ দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করেছেন যে, একত্র যেমন সত্য তেমনি বহুত্বও সত্য। ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ এর স্বপ্রকাশের রহস্য উন্মোচনের মধ্য দিয়ে বৈদিক ঋষিগণ এক ও অদ্বিতীয় সত্তাকেই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির উৎস হিসেবে অনুভব করেছেন। একই সাথে এই চরম সত্যে উপনীত হয়েছেন যে, সৃষ্টির পূর্বেই যিনি জীবিত ছিলেন, স্থিতিশীল, গতিশীল, নিমিষবান, উদ্ভাসমান, চৈতন্যময় প্রাণীবর্গের এবং অচেতন পদার্থসমূহের একমাত্র স্রষ্টা ও নিয়ন্তা সেই দেবাদিদেব বিশ্বের সর্বত্র নিরন্তর বর্তমান আছেন। তাঁরই অলঙ্ঘ্য শাসন প্রভাবে সূর্য উদিত হয়, তাঁরই জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে বিশ্বভুবন প্রকাশিত করে এবং তাঁরই নির্দেশে অন্তিমিত হয়,

যতঃ সূর্য উদেতি, অন্তঃ যত্র চ গচ্ছতি।

তদেব মন্যে অহং জ্যেষ্ঠং, তদ্ উ নাতেতি কিঞ্চন॥ (অথর্ববেদ, ১০/৮/১৬)

এভাবে নিখিল বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও নিয়ন্তার ভিন্ন ভিন্ন দেবশক্তিই মানুষকে যেমন নিয়ত পরিচালনা করেছেন, তেমনি পরমাত্মার সৃষ্ট সমস্ত ভূতাদি মানুষের জীবনপ্রবাহে বিভিন্নভাবে উপকার সাধন করেছেন। দৈবশক্তির পাশাপাশি বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে কালে কালে আবির্ভূত ঋষিকুল বেদাদি ও বেদানুকুল বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের মাধ্যমে পরব্রহ্মের এই স্বরূপ ও সৃষ্টিরহস্য মানুষের সম্মুখে উন্মোচন করে মানুষকে সেই পরম সত্য, শিব ও সুন্দরের পথে চলতে নিয়ত সহায়তা করেছেন। এভাবে মানুষ পরব্রহ্মের এই ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপ দেবগণ এবং পরম সত্যের পথপ্রদর্শক ঋষিগণের পাশাপাশি মনুষ্যাদি, ভূতাদি, জন্মদাতা পিতৃপুরুষাদির নিকট জন্মসূত্রে এবং জন্মের পরে

ঋণগ্রহণ হয়েছেন যা থেকে মুক্তির পথ একমাত্র ঋষিনির্দেশিত বিধান পঞ্চ মহাযজ্ঞ। শুধুমাত্র পঞ্চঋণ শোধই এ মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য নয়। আর্যঋষিগণ যে পরব্রহ্মের অংশভূত দেবতা থেকে গুরু করে মনুষ্যাদি, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদরাজি প্রভৃতির মধ্যেই পরমাত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করতেন তথা সর্বভূতে সমদর্শী ছিলেন, সর্বদা বিশ্বের সর্বভূতের শান্তি কামনায় ব্রতী ছিলেন পঞ্চ মহাযজ্ঞ তারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যজুর্বেদের শান্তিমন্ত্র ঋষির বিশ্বশান্তি কামনার এরূপ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত,

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ
শান্তিরোধয় শান্তি। বনস্পত্যঃ শান্তির্বিশ্বে
দেবাঃ শান্তির্বক্ষ শান্তিঃ শান্তিরেব
শান্তি সামা শান্তিরেধি॥ (৩৬/১৭)

“দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ লোক ও পৃথ্বীলোক শান্তিময় হোক। জল, ওষধি ও বনস্পতি শান্তিময় হোক। সকল দেবগণ, ব্রহ্ম এবং জগতের যা কিছু সবই শান্তিময় হোক। সর্বত্র শান্তি শান্তিময় হোক। সেই শান্তি আমি যেন প্রাপ্ত হই।” মন্ত্রটিতে ঋষি বিশ্বের সকল লোক যেন সুখে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, ত্রিলোকের সকল সৃষ্টিই যেন সর্বজন-কল্যাণময় হয় সেজন্য দেবতাদের নিকট উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, যার মর্মবাণীতে পঞ্চ মহাযজ্ঞতত্ত্বেরই প্রতিফলন ঘটেছে। তাই শুধুমাত্র পার্থিব ঋণমুক্তির উপায়স্বরূপ নয়; সর্বভূতে সমদর্শী হয়ে বিশ্বজনীন মঙ্গল কামনার্থে, সর্বোপরি মানুষের মোক্ষপথকে কলুষমুক্ত করার লক্ষ্যে সনাতনী সমাজব্যবস্থায় আর্যঋষিগণ যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান প্রবর্তিত করে গেছেন, প্রত্যহ ভক্তিপুতহৃদয়ে তা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ ইহলোকে ঐশ্বর্যলাভ এবং পরলোকে পরব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হবেন।

তথ্যসূত্র

- Ram, Tulsī, trans. *Rigveda*. Delhi: Vijaykumar Govindram Hasanand, 2013.
Ram, Tulsī, trans. *Yajurveda*. Delhi: Vijaykumar Govindram Hasanand, 2013.
Ram, Tulsī, trans. *Atharva-Veda*. Delhi: Vijaykumar Govindram Hasanand, 2013.
Sarma, Subramania, ed. *Taittirīya-Brāhmaṇa*. Chennai: 2005. E-book.
Taittirīya Samhita, sanskritdocuments.org, November 5, 2024. E-book.
ঘোষ, জগদীশচন্দ্র, সম্পাদিত। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*। কলকাতা: প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ২০০৫।
ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত। *গীতা-ধ্যান (সমগ্র)*। ষষ্ঠ সংস্করণ, কলকাতা: মহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ২০০০।
ভট্টাচার্য্য, বিধুশেখর। *মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।
Taittirīya Aranyaka, sanskritdocuments.org, August 6, 2023. E-book.
তর্কভূষণ, প্রমথনাথ। *মনুসংহিতা*। কলকাতা: বহুবাজার স্ট্রীট, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ।
দত্ত, রমেশচন্দ্র। *ঋগ্বেদ সংহিতা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)*। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ২০০০।
গোস্বামী, শ্রীবিজনবিহারী, অনুদিত ও সম্পাদিত। *অথর্ববেদ*। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৮।
বসু, শ্রীদেবেন্দ্রবিজয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*। পঞ্চম ভাগ, কলিকাতা: দীনবন্ধু লেন, ১৩২৩।
গম্ভীরানন্দ, স্বামী। *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী*। কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬২।
বিদ্যারত্ন, কালিপ্রসন্ন, অনুদিত। *বিবেকচূড়ামণিঃ*। কলিকাতা: বীডনস্ট্রীট, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।

বাঙালির ধর্মীয় সংস্কৃতি ও সমন্বয়বাদী ধারা

মো: আবু বকর ছিদ্দিক *

প্রতিপাদ্যসার: প্রাচীন অনার্য ধর্ম বাঙালির একটি সমৃদ্ধ ধর্ম ছিল। ৩০০-৩৫০ খ্রি. দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদ এসে এর অধিকাংশ গ্রাস করে ফেলে। তারপর আসে ইসলাম। আবারও প্রচণ্ড আঘাত খায় অনার্য ধর্ম। প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে সমন্বয় খুঁজেন চৈতন্যদেব। মঙ্গল কাব্যের কবিরা অনার্য দেবদেবীর প্রশস্তি গেয়ে অনার্য যুগ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তারপর দেখা দিল সুস্পষ্ট সমন্বয়বাদী ধর্ম ‘পীর নারায়ণ সত্য’ ধর্ম। তারা শ্রীকৃষ্ণ ও মুহাম্মদকে(স:) একত্র করে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয়ে একটি ধর্মের সৃষ্টি করতে চাইলেন। কিন্তু এ প্রয়াসও সফল হয়নি। এরপর রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার করেন। তার মৃত্যুর পর এটি হিন্দু ধর্মের একটি শাখায় পরিণত হয়। অসাম্প্রদায়িক ও সমন্বয়বাদী চেতনা নিয়ে সবশেষে লালনের আবির্ভাব। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাঙালি তার নিজস্ব আচার ও ধর্ম দ্বারা পরিচালিত। বাহির থেকে আসা ধর্মসমূহকে বাঙালি নিজের মত করে গড়ে নিয়েছে। আর্য ও আরবীয়দের মত বাঙালিরও একটি ধর্ম ছিল।

চবিশদ: অনার্য ধর্ম, আচার, বহিঃধর্ম, ধর্মীয় সমন্বয়বাদিতা, সংস্কার।

বঙ্গ, রাঢ়, গৌড়, সমতট, হরিকেল, পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদে ঠিক কখন থেকে জনবসতি শুরু হয়েছিল তার ইতিহাস সুস্পষ্ট নয়, তবে একটি সংহত জনগোষ্ঠী যে নিজস্ব কৃষ্টি-কালচার, ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিল তা সুস্পষ্ট। তখনকার বিশ্বাস ও আচার সাময়িকভাবে লুপ্ত হলেও আবার তা প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। বিংশ শতাব্দীতে এসে উপনিবেশ থেকে মুক্তির পর তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে আত্মজিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ওরিয়েন্টালিজম এশিয়ার দেশসমূহে নতুন চেতনার জন্ম দেয়। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, পুরাণের নতুন তাৎপর্য, ভূ-রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ বিশ্বব্যাপী সবকিছু নতুন করে ভাববার প্রেক্ষাপট তৈরি করে। ইতিহাসবিদ, নৃতত্ত্ববিদ, ভাষাবিদ, ধর্মতত্ত্ববিদ প্রভৃতি গবেষকের গবেষণায় প্রাচীন বাংলার ধর্ম-দর্শন নিয়ে নতুন চিন্তার সূচনা হয় এবং একটি কাঠামোর সন্ধান পাওয়া যায়। এ অনুসন্ধান জাতির মনে নিজস্ব ঐতিহ্য সম্পর্কে গৌরববোধ ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। নিজ জাতিসত্তা সম্পর্কে এ ধারণা জাতীয় সংহতির সারবস্তু।

প্রাচীন বাংলা সম্পর্কে লিখিত কোন ইতিহাস পাওয়া যায়নি কিন্তু প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষের ব্যবহৃত আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলার বহু স্থানে। সুনীতি ভূষণ কানুনগো বলেন,

বাংলায় দ্রাবিড় ও আর্যসংস্কৃতি বিস্তারের পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিকযুগের নিদর্শন গাঙ্গেয় বদ্বীপের নিম্নাঞ্চল ছাড়া বাংলার প্রায় সর্বত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের অজয়, দামোদর, কাঁসাই (কংসাবতী), শিলাই (শিলাবতী), সুবর্ণরেখা, ভাগীরথী ইত্যাদি নদনদীর অববাহিকায় খননকার্যের ফলে প্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর যুগের বিভিন্ন প্রকারের বস্তুসামগ্রীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পূর্ববঙ্গে গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলের সানুদেশে, ময়নামতি-লালমাই এর উচ্চভূমিতে, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ের পাদদেশে, শীতলক্ষ্যা নদীর অববাহিকায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তর ও ধাতুপ্রস্তর যুগের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। (সুনীতি ১৫)

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলার মাটি উর্বর। নব্যপ্রস্তর যুগের কৃষি সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল এখানে। এ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, ভোটচীণীয় জাতির সমন্বয়ে গঠিত সংকর বাঙালি জাতি। তাদের নিজস্ব ধর্ম, আচার ও সংস্কৃতি ছিল। বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলামের আগমনের পর এ জীবনাচারমূলক আবহমান সনাতন ধর্মটি চাপা পড়ে যায়। এর অধিকাংশ হিন্দু ধর্ম কর্তৃক আত্মীকরণ হয়। বাকিটা অবহেলায়, অনাদরে ক্ষয় হতে থাকে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলায় ধর্মেরও পালাবদল হতে থাকে। কিন্তু বাঙালি জাতিসত্তার জন্য তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ সাধন হিতকর। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এরূপ অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়। এছাড়া বাঙালির আচরণ চিরকালই ছিল সমন্বয়বাদী। এ অবশেষও সাম্প্রদায়িক বৈরীতার বিপরীতে সহনশীল আচরণের প্রেরণা দিতে পারে। বাংলার আদি ধর্ম, আগত ধর্ম ও দুয়ের সমন্বয় ধারা বর্তমান প্রবন্ধের পর্যালোচনার বিষয়।

অনার্য ধর্ম

প্রত্যেক সমৃদ্ধ জাতি তিনটি যুগ অতিক্রম করে আধুনিকতায় পৌঁছেছে, বলে অভিমত দেন ফ্রেজার; ‘জাদুবিদ্যা-ধর্ম-বিজ্ঞান।’ (হাসান ২০০৩, ৫৫) মর্গান সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলেন, ‘প্রত্যেক সভ্য জাতির তিনটি পর্যায় রয়েছে: বন্যদশা (Savagery), বর্বরদশা (Barbarism), সভ্যদশা (Civilization)।’ (Morgan 1877, 12) বন্য ও বর্বরদশায় মূলত জাদুবিশ্বাস ও পৌরাণিক ধর্মসমূহের প্রচলন ছিল। বাঙালিকে অবশ্যই আজকের অবস্থানে আসতে এ সকল অতীত পার হতে হয়েছে। তার অসংখ্য নিদর্শন আজও নামে বেনামে টিকে আছে। অসংলগ্ন অবস্থায় বাংলার প্রাক আর্য যুগের ধর্মীয় আচারের যে কয়টি নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলো হল: গ্রাম-দেবতা, গাছপূজা, যাত্রা, ব্রতোৎসব, ধর্মঠাকুর, চড়কপূজা, হেলী, মনসাপূজা, জাঙ্গুলী, ঘটলক্ষ্মীরপূজা, ষষ্ঠীপূজা ইত্যাদি। জন্মান্তরবাদ ছিল তাদের ধর্ম দর্শনের মূল ভিত্তি। বাঙালি জাতির উৎস আদিম গোষ্ঠীসমূহ কোন এক কেন্দ্রিক শাসন কিংবা একই আচারের অধীন ছিল না। একেক অঞ্চলে একেক টোটেম ও সেজন্য নানারকম টাবু প্রচলিত ছিল। তাই ভিন্ন ভিন্ন জীবনাচার, পূজা-পার্বণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এসবের কোন লিখিত গ্রন্থ না থাকায় এর অধিকাংশই আজ বড় বড় ধর্মসমূহ আত্মীকরণ করে ফেলেছে। একটু পরীক্ষানিরীক্ষা করলেই এগুলোর সাথে বাঙালির আদি ধর্মের সংযোগ সূত্র বেরিয়ে আসে। অনেক বাঙালি গবেষক তা প্রমাণ করেছেন।

জন্মান্তরবাদ

মৃত্যুর পর মানুষ আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসে এ ছিল প্রাচীন অনার্য ধর্মসমূহের বিশ্বাসের ভিত্তি। মানুষ কিংবা অন্য কোন প্রাণী হয়েও ফিরে আসতে পারে। পরকাল, স্বর্গ, নরক এসকল ধারণা আদি বাংলার ধর্মে ছিল না। হিন্দু ও বৌদ্ধের জন্মান্তরবাদ এ প্রাক আর্য ধারণা থেকে আহরিত। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে,

হিন্দুর জন্মান্তরবাদ, পরলোক সম্বন্ধে ধারণা, প্রেততত্ত্ব, পিতৃতর্পণ, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধাদি সংক্রান্ত অনেক অনুষ্ঠান, আভ্যুদয়িক ইত্যাদি সমস্তই আমাদেরই প্রতিবাসীর এবং আমাদের অনেকেরই রক্তশ্রোতে বহমান সেই আদিবাসী রক্তের দান। (রায় ৪৭৮)

এই আদিবাসী হল বাঙালির উৎস আদিম নৃগোষ্ঠীসমূহ।

গ্রাম-দেবতা

প্রাচীন অনার্য সমাজ ছিল গ্রাম সভ্যতার সমাজ। তারা প্রত্যেকটি গ্রামের জন্য একজন করে দেবতা কল্পনা করতো। দেবতা গ্রাম পাহারা দিতো। দেবতার জন্য মান্নত করতো তারা। নীহাররঞ্জন বলেন,

‘গ্রাম দেবতা’ সর্বত্র একই নামে বা একই রূপে পরিচিত নহেন; সাম্প্রতিক বাঙলায় কোথাও তিনি কালী, কোথাও ভৈরব বা ভৈরবী, কোথাও বনদুর্গা বা চণ্ডী, কোথাও বা অন্য কোনও স্থানীয় নামে পরিচিত। কিন্তু যে নামেই পরিচিত তিনি হউন, পুরুষ বা প্রকৃতি-তত্ত্বেরই হউন, সংশয় নাই যে, সর্বত্রই তিনি প্রাক-আর্য আদিম গ্রামগোষ্ঠীর ভয়-ভক্তির দেবতা।’ (রায় ৪৮১)

ধ্বজা পূজা

ধ্বজা পূজা প্রাচীন অনার্য বাঙালিদের পূজা। যদিও হিন্দু ধর্ম পরবর্তীতে তা আত্মীকরণ করেছে। এর নিদর্শন আজও বাংলার প্রান্তিক শ্রেণির মধ্যে পাওয়া যায়। নীহাররঞ্জনর অভিমত,

সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়া, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি আদিবাসী কোম এবং বাঙালীর তথাকথিত অন্ত্যজ বা নিম্নস্তরের জনসাধারণের মধ্যে কোনও ধর্মকর্ম ধ্বজা এবং ধ্বজাপূজা ছাড়া অনুষ্ঠিতই হয় না প্রায় বলা চলে। (রায় ৪৮২)

গাছপূজা

প্রাচীন কৃষিজীবী সমাজের মানুষ প্রকৃতির পূজা করতো। তারা ছিল প্রকৃতির কোলে অসহায়। ঝড়, বন্যা, খড়া প্রভৃতি থেকে গাছ তাদের রক্ষা করতো। আবার গাছের ফলমূল ও শস্য খেয়ে তারা জীবন ধারণ করতো। অসুখ হলেও ওষধি গাছ ছিল তাদের আশ্রয়। সেজন্য গাছপালার প্রতি তাদের ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা ছিল অতি নিবিড়। তাই সেগুলিকে তারা দেবত্ব আরোপ করে পূজা করতো। নীহাররঞ্জন বলেন,

বাংলাদেশে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজের মেয়েদের মধ্যে, বিশেষত পাড়াগাঁয়ে, গাছপূজা এখনো বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে তুলসী গাছ, সেওড়া গাছ ও বটগাছ।.... এ-সমস্তই সেই আদিবাসীদের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের এবং বিশ্বাস ও ধারণার স্মৃতি বহন করে। (রায় ৪৭৯)

গাছকে শাড়ি ও সিঁদুর পরিয়ে নারী রূপে কল্পনা করে এসব পূজা হয়ে থাকে। প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সংস্কার আজও নিবু নিবু অবস্থায় টিকে আছে। দেবব্রত নস্কর বলেন, ‘বট-অশ্বখ-শিব, নিম-পঞ্চানন্দ, বেল-ব্রহ্মদিত্য, সিজবৃক্ষ-মনসা, কদম-রাধাকৃষ্ণ, তুলসী-নারায়ণ, ধান-গম-যব ইত্যাদিতে লক্ষ্মীর অবস্থান বলে মনে করা হয়।’ (নস্কর ৫২)

যাত্রা

হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানে ঢুকে পড়া আদিবাসী অনুষ্ঠান হল যাত্রা। আজ তা হিন্দুর সম্পত্তি হলেও এর মূল অনার্য সমাজে নিহিত।

ধ্বজা বা কেতনপূজার মত নানাপ্রকারের যাত্রাও বাঙালার আদিবাসী কোমগুলির অন্যতম প্রধান উৎসব বলিয়া গণ্য করা হইত। রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি ধর্মোৎসব মূলত তাঁহাদেরই; পরে ক্রমশ ইহাদের আয়ীকরণ নিষ্পন্ন হইয়াছে। (রায় ৪৮৩)

ব্রতোৎসব

সারা বছরব্যাপী জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘটনার পূর্বে বাঙালি নারীরা ব্রতপালন করতো। সৈঁজুতি ব্রত, ভাদুরি ব্রত, বসুন্ধরা ব্রত, ধানগোছানো ব্রত প্রভৃতি। বাঙালি ব্রত পালন করতো বলে আর্যরা তাদের ব্রাত্য বা পতিত বলে গাল দিত। ‘এই ব্রতোৎসবের ইতিহাস অতি জটিল ও সুপ্রাচীন তবে এই ধরনের ধর্মোৎসব যে প্রাক-বৈদিক আদিবাসী কোমদের সময় হইতেই সুপ্রচলিত ছিল এ-সম্বন্ধে সংশয় বোধ হয় নাই।’ (রায় ৪৮৩)

ধর্মঠাকুর

ধর্মঠাকুরের আসল প্রতীক পাদুকা চিহ্ন। ধর্মপূজার পুরোহিতেরা ঠাকুরের গলায় ঝুলিয়ে রাখেন এক খণ্ড পাদুকা বা পাদুকার মালা। ‘ধর্মঠাকুর মূলত ছিলেন প্রাক-আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা।’ (রায় ৪৮৬) ধর্মঠাকুর গ্রন্থ হন বৌদ্ধ ও হিন্দু, দুই ধর্ম কর্তৃক। দেবব্রত নস্কর বলেন, ‘বাংলার বিশিষ্ট লোকদেবতা ধর্মঠাকুর।’ (নস্কর ২১)

চড়কপূজা

কুমীরের পূজা, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর ছোলা কাঁটা ও ছুরির উপরে ঝাঁপ, বাণফোঁড়া, শিবের বিবাহ ও অগ্নিনৃত্য, চড়কগাছ হতে দোলা ইত্যাদি এ পূজার অঙ্গ। ‘সামাজিক জনতত্ত্বের দৃষ্টিতে ধর্ম ও চড়ক-পূজা দুইই আদিম কোম সমাজের ভূতবাদ ও পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।’ (রায় ৪৮৭)

হোলী বা হোলাক উৎসব

বাংলাদেশে ফাল্গুনী শ্রুতা চতুর্দশী বা পূর্ণিমা তিথিতে হোলী উৎসব হয়। এ যুগে এসে রাধা-কৃষ্ণ কাহিনি প্রযুক্ত হয়েছে। ‘এ-তথ্য এখন অনেকটা পরিষ্কার যে, আদিতে হোলী ছিল কৃষিসমাজের পূজা; সুশস্য উৎপাদন-কামনায় নরবলি ও যৌনলীলাময় নৃত্যগীত উৎসব ছিল তাহার প্রধান অঙ্গ।’ (রায় ৪৮৭)

মনসাপূজা

বাংলায় অসংখ্য নদীনালা বিল ঝিল থাকায় এখানে সাপের প্রাদুর্ভাব বেশি। সাপের ভয় থেকেই মনসা পূজার উদ্ভব হতে পারে। অথবা ‘সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং মূলত কোম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা-পূজার উদ্ভব, এ-তথ্য নিঃসন্দেহ।’ (রায় ৪৮৯) সাপ যে গোত্রের টোটম ছিল সে গোত্রে এর পূজা প্রচলিত হতে পারে। কারণ প্রথম দিকে বন্য সমাজে জাদুবিশ্বাস ও টোটমকে ধর্মের মতই মানা হতো। পরে এ সকল গোত্রে দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হয়। সাপের পূজা নৃগোষ্ঠী সমাজে সাপের ভয় থেকে উদ্ভব হয় বলে মনে করেন দেবব্রত নস্কর। বর্বর যুগে এতে মানবীয় গুণ আরোপ করার জন্য মনসা দেবীর সংযোগ হয়। তিনি বলেন, ‘সর্পপূজা এমনই এক বিশ্বাসজাত পূজাচার যা আদি নৃ-গোষ্ঠীর ভয়ভীতি জাত বলেই বিবেচিত হয়, এবং অদ্যাপি সজীব সংস্কৃতিরূপে মান্যতা পায়।’ (নস্কর ১১০)

ঘটলক্ষ্মীর পূজা

লক্ষ্মী বাংলার শস্যের দেবী। লক্ষ্মীপূজা কেবল হিন্দু সমাজ আত্মীকরণ করলেও মুসলমান হিন্দু উভয় সমাজের মানুষ কথায় কথায় লক্ষ্মীর নাম নেয়। লক্ষ্মীছেলে, লক্ষ্মীমেয়ে, লক্ষ্মী জামাই, লক্ষ্মী বউ, অলক্ষ্মী কোথাকার, লক্ষ্মীছাড়া প্রভৃতি শব্দের বহুল ব্যবহার প্রমাণ করে এক কালে বাঙালি সমাজে এর প্রভাব কেমন ছিল। ‘এই লক্ষ্মী কৃষিসমাজের মানস-কল্পনার সৃষ্টি; শস্য-প্রাচুর্যের এবং সমৃদ্ধির তিনি দেবী।’ (রায় ৪৯১) ব্রাহ্মণ্যবাদ জনপ্রিয় অনার্য দেবদেবীগুলোকে নিয়ে বেশি রকম বাড়াবাড়ি করেছে যেন তাদের অনার্য পরিচয় মুছে যায়। লক্ষ্মীর ব্যাপারেও অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু লক্ষ্মীর মৌলিক পরিচয় উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন নীহাররঞ্জন রায়। দেবব্রত নস্করও বলেন, ‘দেবী লক্ষ্মীর পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনি পর্যালোচনা ও মূর্তিতত্ত্ব বিশ্লেষণে জানা যায় লক্ষ্মীপূজা আদি নৃ-গোষ্ঠীর প্রকৃতি পূজার অঙ্গ।’ (নস্কর ১১৭)

ষষ্ঠীপূজা

সন্তান কামনায় ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই পূজা বর্তমানে হিন্দু সমাজে পালিত হয়ে থাকে। তবে ‘ষষ্ঠীদেবীর কোনও প্রতিমা পূজার প্রচলন ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নাই।’ (রায় ৪৯১) সুতরাং এ পূজা প্রাক আর্য ধর্ম বিশ্বাস থেকে এসেছে। অনার্য ধর্ম ছিল জীবন ঘনিষ্ঠ। এর কোন লিখিত অনুশাসন ছিল না। চর্চার মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত ও প্রবহমান ছিল। মানবিক দিক তাই সে ধর্মে ছিল প্রবল। এতকাল বাঙালির দেবদেবীসমূহ হিন্দু ধর্মের দেবদেবী হিসেবে পরিচিত

ছিল। নানা গবেষকের গবেষণায় এর মূল পরিচয় বেরিয়ে এসেছে। ধর্মীয় জীবনে বাঙালি যে অনেক সমৃদ্ধ ছিল এসব দেবদেবী তার প্রমাণ। এ কথা সুস্পষ্ট যে প্রাক-আর্য যুগে বাঙালির একটি অলিখিত, আচার প্রধান, সমৃদ্ধ ধর্ম ছিল। হিন্দুদের দ্বারা গ্রস্ত হবার পর বাঙালির ধর্মীয় ঐতিহ্য মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে সুযোগ পেলেই নিজের অস্তিত্বের খবর জানিয়ে দিতে ভোলেনি।

যোগ-সাংখ্য-তন্ত্র দর্শন

বাঙালির ধর্মীয় চিন্তার গভীরতার প্রমাণ তাদের দর্শনসমূহ। যোগ, সাংখ্য, তন্ত্র বাংলার মৌলিক দর্শন। এ দর্শনসমূহ অত্যন্ত মানবতাবাদী। এ সকল দর্শন ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আত্মশুদ্ধি অর্জন ছিল এগুলোর মূল লক্ষ্য। কোন প্রকার পোশাকি রূপ বা রাজনৈতিক রূপ ছিল না এদের। আধুনিক যুগে ধর্মকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমিত রাখার যে প্রচেষ্টা চলছে তা ওই ধর্মগুলোতে ছিল স্বাভাবিক।

যোগ ও সাংখ্য-এ দুটো অতি পুরানো অনার্য দর্শন। পুরুষ (চৈতন্যস্বরূপ) ও প্রকৃতি (উপাদান) তত্ত্বই সাংখ্য দর্শনের ভিত্তি। আর দেহচর্যার দ্বারা আত্মোপলব্ধির পদ্ধতির নাম যোগ শাস্ত্র। 'তন্ত্র' বলে অপর একটি অনার্য-শাস্ত্রও যোগ এবং সাংখ্যতত্ত্বের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে একটি জটিলতর মিশ্র তত্ত্বের উদ্ভব ঘটায়।' (হাই ও শরীফ ভূমিকা ড)

পরবর্তীকালে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবে বাঙালি বাহ্যিকভাবে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম হয়েছে বটে, তাদের অন্তরে রয়ে গেছে সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র মন্ত্র।

বর্তমানে বহুল চর্চিত ধর্মগুলোর আগমন ও প্রচার

যে বড় ধর্মগুলো বর্তমানে বাঙালির চিন্তাজগৎ ও অন্তরজগৎ শাসন করছে তার সবকটি বাংলার বাইরে থেকে এসেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদ উত্তর ভারত, ইসলাম ধর্ম আরব ও খ্রিষ্টান ধর্ম ইউরোপ থেকে বাংলায় এসেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের আগমন ৩০০-৩৫০ খ্রি:। নীহাররঞ্জন বলেন, 'বিশেষ ভাবে গুপ্ত আমলে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্রমশ বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছে।.... বাংলায় গুপ্তাধিপত্য-আ: ৩০০-৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ।' (রায় ৩৫৯) বাংলায় ইসলাম ধর্মের আগমন ১২০৪ খ্রি: এবং খ্রিষ্টান ধর্মের আগমন ১৭৫৭ খ্রি: (রাজনৈতিকভাবে)।

রাজশক্তির কারণেই হোক, অন্য কোন কারণেই হোক বাঙালি অনার্যদের ধর্ম চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু বাঙালি জীবন চর্চায় এর প্রভাব অত্যাধিক। ভিন্ন সংস্কৃতিতে উৎপন্ন উপর্যুক্ত ধর্মগুলো বাংলার পরিবেশের সাথে যথাযথ মিলেনি। তাই বাঙালি বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলাম ধর্ম মেনে নিলেও তাকে নিজের মত করে গড়ে নিয়েছে। এগুলোর একটা বাঙালি রূপ অতি স্পষ্ট। আহমদ শরীফ বলেন,

বাঙালীর জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইসলাম গ্রহণের এবং গ্রহণ করেও আন্তরিকভাবে বরণ না করার রহস্য এবং জৈব-জীবনের তাগিদে তাকে প্রয়োজন মতো রূপ দেবার তত্ত্ব এখানেই নিহিত। (শরীফ-১, ০৫)

পরবর্তীতে যে সমস্ত বাঙালি মহাপুরুষ নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেন তারা তাদের ধর্মকে ওগুলোর মত ব্যাপকতা দিতে পারেননি। তাই তাদের প্রচেষ্টা ছিল উপর্যুক্ত ধর্মগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন। তারা বাঙালি সমাজ, সংস্কৃতি ও মননের সাথে মিলে, এমন একটি রূপ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেন। চৈতন্য থেকে লালন পর্যন্ত সবাই সামঞ্জস্য ও সমন্বয় খুঁজেছেন।

বৈষ্ণব ধর্ম

ইসলাম আসার পর ব্রাহ্মণ্যবাদের একচ্ছত্র আধিপত্য কমে যায়। বাঙালি চিন্তাবিদেদেরা নতুন একটি মতের সাথে সাক্ষাৎ পরিচিতি পেল। শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) হিন্দু ও ইসলাম এ দুটি ধর্মের একটি সমন্বয় তত্ত্ব নিয়ে আবির্ভূত হন। ‘হিন্দুর মায়াবাদ ও মুসলমানের সূফীতত্ত্বের সমন্বয়ে নবদর্শন আবিষ্কৃত হল, অর্থাৎ নতুন ধর্ম সৃষ্টি হল।’ (শরীফ-২, ১০) তত্ত্বগত বিচারে দুটি মতই কাছাকাছি। সুতরাং বাংলায় হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সর্ব প্রথম আপোষমুখী চিন্তাবিদ শ্রী চৈতন্যদেব।

আদিকালে বাঙালি জাতি অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোটচীণীয়, মঙ্গোলীয় জাতির রক্তগত সংমিশ্রণকে যেমন উদারভাবে মেনে নিয়েছিল তেমনি মেনে নিয়েছিল পরস্পরের বিশ্বাস অবিশ্বাসকেও। তাই সমন্বয় বাঙালির জাতিগত ধর্ম। হিন্দু ও ইসলাম এ দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির মাঝেও সমন্বয় খুঁজে পেলেন চৈতন্যদেব। বাঙালি পরমত সহিষ্ণু বলে সহজে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করল আবার একাংশ ছেড়েও দিল সহজে। চৈতন্যদেব যখন সমন্বয় বাণী শোনালেন, হিন্দু মন্দির ছাড়ল, মুসলমান আর তেমনভাবে মসজিদে গেল না। একটি মধ্যপন্থার সৃষ্টি হল। ‘ইসলাম সত্য সত্যই বড় বাধা পেল। এর গতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল। ইসলাম আর বিশেষ প্রচার বা প্রসার লাভ করল না।’ (শরীফ-২, ১০)

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করেই বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব। হিন্দু ধর্মে শ্রেণি বিভাজন, শাস্ত্রে অনধিকার, পূজাঅর্চনায় ব্যয় বহুলতা, ব্রাহ্মণদের নিপীড়ন, ভাষাগত দূর্বোধ্যতা, ধর্মগত বিধি নিষেধের অযথা কড়াকড়ি সাধারণ মানুষের কাছে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে চৈতন্যের আস্থান ছিল সহজিয়া। কোন গ্রন্থ নেই, আচার নেই, ইবাদত বন্দেগির কোন বিধিমালা নেই, ঠাকুর নেই, মোল্লা নেই, মসজিদ মন্দিরে যাবার প্রয়োজনীয়তা নেই, শোষণ নির্যাতন নেই, বড় ছোট নেই, শুধু নাম জপলেই মুক্তি। এমন একটি সহজ ধর্মের প্রতি বাঙালি সহজেই ঝুঁকে পড়ে। বাঙালি এতে তার মূলের সন্ধান পায়। কৌম মানুষ নিজেদের কল্যাণের জন্যই একদিন দেবদেবীর সৃষ্টি করেছিল। অনার্য ধর্মের মূলকথা ও অনুভূতি ছিল মানব মুক্তি, বৈষ্ণবেও তাই। বৈষ্ণব মত অনুসারে মানুষও ভগবানের সম্পর্কটা সংক্ষেপে এই,

আদিতে পরমপুরুষ স্বরূপ বিধাতা এক ছিলেন। তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করলেন, তাই নিজ অংশ থেকে নারী স্বরূপাকে সৃষ্টি করে ‘যুগল’ হলেন। এখানেই পুরুষ-প্রকৃতি মায়াব্রহ্ম ও বিষ্ণুশ্রী তত্ত্বের উদ্ভব। নারীই শক্তি স্বরূপা, নারীসম্পর্কেই পুরুষ হয় শক্তিমান। মৈথুন তত্ত্বেরও উদ্ভব হয় এভাবেই। পুরুষ-প্রকৃতির তথা নারীপুরুষের মিলনেই সৃষ্টির উদ্ভব। তাঁদের সম্পর্কও প্রেমের। কাজেই সৃষ্টি প্রেমজ। তিনি চাইলেন-একোহম বহুস্যাম। কেননা আমি নিজেকে বিচিত্রভাবে উপভোগ করতে চাই। আর তাই সৃষ্টি স্রষ্টার আনন্দসহচর। যেখানে স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের আনন্দের তথা প্রণয়ের সম্পর্ক সেখানে নিয়মরীতির ব্যবধান থাকতে পারে না। কাজেই আনুষ্ঠানিক ধর্মের সেখানে ঠাঁই নেই। অনুরাগে প্রেমের উন্মোচ, বিরহবোধে এর উপলব্ধি এবং মিলনে এর সার্থকতা। বৈষ্ণবের কথায় এ মিলন মানে যুগলরূপ ও অভেদরূপ। (শরীফ-২, ২১)

সৃষ্টি যেমন স্রষ্টাকে পেতে সাধনা করে তেমনি স্রষ্টাও সৃষ্টিকে পেতে চায়। সুতরাং এখানে স্বর্গ, নরক, বেহেস্ত, দোযখের কোন বালাই নেই। স্রষ্টার কীর্তন বা নাম জপই হল এর মূল এবাদত বা পূজা। চণ্ডীদাস বলেন,

না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ।। (হাই ও শরীফ, ৩৬)

বৈষ্ণব ধর্ম অসাম্প্রদায়িক হলেও ইসলাম কিংবা হিন্দু ধর্মের মতো ব্যাপক প্রসার লাভ করতে পারেনি। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর তা হিন্দু ধর্ম কর্তৃক গ্রস্ত হয়ে পড়ে।

অনার্য ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন চেষ্টা

চৈতন্যদেবের পরবর্তী সময়ে প্রাচীন বাংলার অনার্য ধর্মের উত্থানের একটি প্রচেষ্টা চলে। চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি অনার্য দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক কাব্য রচনা করে তাদের পূজা প্রতিষ্ঠার প্রবণতা দেখা দেয়। অনার্য নিষাদ জাতির প্রতিনিধি কালকেতু, ফুল্লুরা, পূর্ববঙ্গের নদীবহুল এলাকার প্রতিনিধি বেহুলা, লক্ষ্মীন্দর, বণিক সমাজের প্রতিনিধি ভাঁড়ুদত্ত, ধনপতি, খুল্লনা, লহনা, শ্রীমন্ত প্রভৃতি। বিদেশি শাসকদের শোষণ, নির্যাতন, অত্যাচার, অবিচারে অতিষ্ঠ মানুষ নিরুপায় হয়ে প্রাচীন অনার্য দেবদেবীর শরণাপন্ন হয়। মাহমুদ শরীফ নামে ডিহিদারের উৎপীড়নের ফলে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে বাস্তবত্যাগ করতে হয়। কবি উড়িয়ায় আশ্রয় নেন। ১৫৪৪ খ্রি. চণ্ডীমঙ্গল রচিত হয় বলে ধারণা করা হয়। ভারতচন্দ্রের (১৭০৭-১৭৬০) সৃষ্টির মূলেও প্রেরণা যুগিয়েছে একই চিত্র। আহমদ শরীফ বলেন,

ভারতচন্দ্রের কালে যে তা-ই ঘটেছিল- বিশেষ করে মানুষ যে অর্থাভাবে তথা অন্নাভাবে কষ্ট পাচ্ছিল, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ কবি স্বয়ং ছিলেন দারিদ্র্যক্লিষ্ট- অন্নাভাবগ্রস্থ। তা-ই তাঁর ইষ্টদেবতা কালী গৌরী তারা দুর্গা চণ্ডী নন- অন্নদায়িনী অন্নদা অন্নপূর্ণা।’ (শরীফ-২, ৪১৫)

মনসামঙ্গল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙালির বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয়। তুর্কিদের সাথে সম্মুখ দ্বন্দ্ব দাঁড়ানোর মত ক্ষমতা তখন বাঙালির ছিল না। কিন্তু অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে কিছু একটা করা দরকার। বাঙালি কবির তখন পুরাণের আশ্রয় নিলেন। পুরাণকে তারা প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আহমদ শরীফের অভিমত:

একেশ্বরবাদী আত্মপ্রত্যয়ী পরাক্রান্ত তুর্কীদের সঙ্গে পরিচয় মুহূর্তের প্রথম অভিঘাতে শাসক-শাসিতের মানসদ্বন্দ্বের ও মিলনের সন্ধিক্ষণে ক্ষণপ্রভার মতো দেশী লোকের মানসে আত্মশক্তির ও আত্মমর্যাদার যে-চেতনা জাগে, চাঁদ-বেহুলার বিদ্রোহে ও দৃঢ়সংকল্পে তা-ই বিস্ময়কর ঋজুতায়, দৃঢ়তায় ও উজ্জ্বলতায় অভিব্যক্ত।’ (শরীফ-২, ৪০১)

কিন্তু এ অভ্যুত্থান চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। মঙ্গলধর্ম আলাদা কোন কাঠামো গঠন করতে পারেনি কারণ ততদিনে এ দেবদেবীগুলো হিন্দুদের নিজেস্ব সম্পত্তি বলে ধারণা জন্মে যায় জনমনে। মুসলমানেরা তা থেকে রস আন্বাদন করেছে বটে বিশ্বাস করেনি।

সত্য ধর্ম

হিন্দু-মুসলিম সম্মিলনের পরবর্তী প্রচেষ্টা ‘পীর-নারায়ণ সত্যধর্ম’এর উদ্ভব। এতে হিন্দু মুসলিম দেবতা ও প্রচারকের সমন্বিত মূর্তি কল্পনা করে দুটো ধর্মকে এক করে ফেলার চেষ্টা চলে। বাংলার অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে আরও এক ধাপ সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এ ধর্ম। তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতিতে হিন্দু মুসলিম দুই ধর্মের উপরই মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলে। আহমদ শরীফ বলেন,

১৫৩৮ সনে শেরশাহর বঙ্গবিজয়, সম্রাট ইসলাম সুরের মৃত্যুতে বাংলায় প্রশাসনিক কোন্দল ও বিশৃঙ্খলা, ১৫৫৪ থেকে ১৫৭৫ সন অবধি ঘন ঘন শাসকবদল ও যুদ্ধবিগ্রহ, মুঘলবিজয়ের পরে বিয়াল্লিশ বছর ধরে সামন্ত-সম্রাটের দ্বন্দ্বিক অবস্থান ও তজ্জাত নৈরাজ্য আর যুরোপীয় বেনেদের নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতির প্রভাব, মঘ-হার্মাদের

নদীপথে লুটতরাজ এবং মুঘলদের সাম্রাজ্যিক শোষণ প্রভৃতি জনজীবন দুর্বল করে তুলেছিল।....জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত মানুষ পুরোনো শাস্ত্রে ও নীতিআদর্শে আস্থা হারিয়ে বিশ্বাসের নতুন বন্দরে নোঙর ফেলে আশ্বস্ত হতে চায়, এ মনোভাব থেকেই ষোল শতকের শেষ পাদের ও সতেরো শতকের শোষিত পীড়িত উদ্বিগ্ন মানুষ উদ্ভাবন করে নির্জিত দুঃস্থ মানুষের এক মিলনমন্ত্র- সে মন্ত্র হচ্ছে ‘সত্য’। (শরীফ-২, ৪৩৯)

দুর্বিষহ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে মানুষ সত্যের সন্ধান শুরু করে। দুর্বল ও অসহায়ের কেউ নেই, কেবল সত্যই পারে তাদের পরিত্রাণ দিতে। ধর্মীয় বিভেদ ভুলে তারা আপোসের পথ খুঁজেছিল যার উদ্দেশ্য ছিল বৈষয়িক সমৃদ্ধি। আহমদ শরীফের অভিমত,

একদিন স্বস্তিতে ভাতে কাপড়ে বাঁচবার অগ্রহে জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত নির্জিত বিপন্ন দীন দুঃখী হিন্দু-মুসলিম বাঙালী ‘সত্য’ নামের ভেলায় চড়ে বসেছিল, সেদিন ভিন্ন অবয়বের শাস্ত্রের ও মানবসত্যের অভিন্নতা অবলীলায় স্বীকৃত হয়েছিল-সেদিন নবী-কৃষ্ণও অভিন্ন কোন আত্মা নন কেবল, অভিন্ন কায়ও ছিলেন।’ (শরীফ-২, ৪৩৯)

ইসলাম ও সনাতন ধর্মের মধ্যে তারা যে মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন তা কেবল মৈথিক নয়, তাত্ত্বিক। ধর্মীয় বিভেদকে তারা মানবসত্তার উর্ধ্বে একটি আদর্শ সত্তায় উন্নীত করেছিলেন। ধর্ম প্রচারকদের ভিন্নতার জন্যই ধর্মে ধর্মে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। সকল ধর্মের মূল কথা একই; সত্যকে মান্য করা। তাই বিভেদ সৃষ্টিকারী প্রচারকদের মধ্যে তারা অঘয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। এতে নবী মুহাম্মদ (সা:) ও শ্রীকৃষ্ণ এক দেহধারী। কবি কৃষ্ণরাম দাস রায়মঙ্গল কাব্যে বলেন,

অর্ধেক মাথা কালা একভাগে চুড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি তাতে।
ধবল অর্ধেক কায় অর্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরান পুরাণ দুই হাতে।।

(শরীফ-২, ৪৩৯)

সে সময় সত্য নারায়ণের পাঁচালি বেশ জনপ্রিয় ছিল। সত্যনারায়ণ পাঁচালীতেও স্বীকার করা হয়েছে যে, ‘বিষ্ণু আর বিসমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়।’ (শরীফ-২, ৪৩৯) কোরানও সত্য, পুরাণও সত্য। সুতরাং সত্য বলার ব্যাপারে দুটি এক হলে, বিভেদের দরকার কি, এক সত্যকে মানাই ভাল। সত্য মুসলমানদের কাছে পীর, হিন্দুদের কাছে নারায়ণ। সত্য ধর্মের প্রথম পাঁচালীকার শেখ ফয়জুল্লাহ। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সত্যপীর বিজয় পাঁচালী রচনা করেন।

সত্য ধর্মের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। সফল হলে মধ্যযুগে বাঙালি এক বিশ্বাস্যকর ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে পারতো। ব্যর্থ হলেও এর প্রভাব বাঙালি মানসে সুদূর প্রসারী ছিল।

ব্রাহ্ম ধর্ম

১৭৫৭ সালে রাজনৈতিকভাবে ইংরেজের আগমন ঘটে বাংলায়। ইংরেজরা অপার্থিবতার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিল পার্থিব জীবনকে। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের অসারতা প্রমাণের জন্য তারা যুক্তিবাদের প্রচলন করল। বাংলায় ইয়াংবেঙ্গল নামে নতুন একটি জেনারেশন যুক্তিবাদ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। এ সময় হিন্দু, ইসলাম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও যুক্তিবাদের সমন্বয়ে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তন করেন। ঋষি দাস বলেন,

বাঙালির ধর্মীয় সংস্কৃতি ও সমন্বয়বাদী ধারা

রাজা রামমোহন রায়ের মতে, সকল ধর্মের মূলকথা একেশ্বরবাদ, সকল ধর্মের মূলকথা এক, ধর্মে ধর্মে পার্থক্য ও বিভেদ কতিপয় স্বার্থায়েষীর সৃষ্টি, অন্ধবিশ্বাস ধর্ম নয়, তিনি সকল ধর্মমতকে যুক্তি দ্বারা বিচার করে দেখার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। (দাস ২৪)

রামমোহন নব্য শিক্ষিত ও নব্য ধনী শ্রেণীকে বেশ প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। ‘আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁকে বলেছিলেন, Prophet of humanity; মানবতার প্রবক্তা।’ (দাস ১) কিন্তু সাধারণ মানুষের কানে তাঁর বাণী পৌঁছায়নি। সত্য ধর্মের সমন্বয় ছিল হিন্দু ও ইসলাম, দুটি ধর্মের মধ্যে। ব্রাহ্ম ধর্মে খ্রিস্টান ও যুক্তিবাদ অতিরিক্ত যোগ হয়। এতে সমন্বয়বাদী ধারা আরও গতি লাভ করল।

রামমোহনের একেশ্বরবাদ রসভাষ্যে প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রাহ্ম ধর্ম বাংলায় সার্বজনীন রূপ পায়নি। কারণ রামমোহনকে অন্যান্য সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মের সংস্কারক বলে একপাশে ঠেলে দিল। ‘রাজা রামমোহন রায়ের নামমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মগণ নিজেদের ব্রাহ্মণ্যধর্মের শাখানুসারী বলে মনে করে। ফলত, এরা জাতিতে হিন্দুই রয়ে গেল।’ (শরীফ-২, ১০)

বাউল দর্শন

রামমোহনের পর নিজের পরিচয় লুপ্ত করে দিয়ে বাঙালির মৌলিক ধর্মকে জাগাতে চাইলেন ফকির লালন শাহ (১৭৭২-১৮৯৪)। উল্লেখ্য যে, রামমোহন রায় ও লালন শাহের জন্ম একই বৎসরে হলেও রামমোহনের ধর্ম ও দর্শন প্রকাশ পায় আগে এবং রামমোহন ১৮৩৩ সালে মারা যান। লালন দীর্ঘজীবী হন এবং রামমোহনের মৃত্যুর পর আরো ৬০ বছর তিনি তার দর্শন প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেন। তাই লালনকে রামমোহনের পরবর্তী ধরা যায়। লালন তার জন্ম পরিচয় কাউকে জানতে দেননি নিজেই প্রচলিত ধর্মমতের উর্ধ্বে রাখার জন্য। লালন চৈতন্যদেবের মত অদ্বৈতবাদী ছিলেন। স্রষ্টার আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। তিনি মানুষের মাঝে যুগে যুগে বিরাজমান। তার দর্শনে, প্রকারান্তরে মানুষই ঈশ্বর।

জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। জীবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মার স্থিতি। কাজেই আপনার আত্মার পরিশুদ্ধি ও পরিচয়ই খোদা প্রাপ্তির উপায়, তাই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির সাধনাই বাউলদের ব্রত।.... বাউলের রূপক অভিব্যক্তিতে সে-পরমাত্মা হচ্ছেন-মনের মানুষ, অটল মানুষ, অধর মানুষ, মানুষ রতন, মনমনুরা, অচিন পাখী ও অলখসাঁই (অলক্ষ্য স্বামী)। (হাই ও শরীফ ভূমিকা ৮)

বাউলেরা দেহের মধ্যে ঈশ্বরকে সাধনা করেন। দেহই তাদের মসজিদ, মন্দির বা খোদা ও ঈশ্বরের ঘর। দেহের বাইরে কিছু নেই। তাদের কাছে দেহ একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। আত্মা দেহ থেকে বের হয়ে পরমাত্মার সাথে মিলিত হয় আবার দেহ ধারণ করে মানুষ হয়। তাই ঈশ্বর ও মানুষ ভিন্ন নয়। যেমন, এক কলসি জল ও এক সাগর জল; দুটোই জল। লালন বলেন,

নদী কিংবা বিল, বাঁওড়, খাল-
সর্বতরে একই সে জল।
একা মোর সাঁই
আছে সর্ব ঠাঁই,
মানুষে মিশে সে হয় রূপান্তর। (ভট্টাচার্য ৫৯০)

মানুষকে ভজনা করলেই ঈশ্বরকে ভজনা করা হয়। লালন বলেন, ‘মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি / মানুষ ছেড়ে ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি।’ (ভট্টাচার্য ৬৬৮)

মানুষের মধ্যে যদি সাঁই (সৃষ্টিকর্তা) বসবাস করেন তবে হিন্দু-মুসলিম, ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু ভেদাভেদ শিথিল হয়ে পড়ে। সব মানুষ সমান হয়ে যায়। লালনের এ তত্ত্ব বাঙালির মূল ধর্ম চেতনা যা প্রাচীন অনার্য বাঙালি চেতনাকে প্রতিফলিত করে।

ধর্মের ক্ষেত্রে বাঙালির আচরণ সময়সূচক। মধ্যযুগে বাঙালি নতুন কোন ধর্মের উদ্ভাবন ঘটায়নি, সময় চায়েছে। বহিরাগত ধর্ম; বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মকে বাঙালি নিজের মত করে গড়ে নিয়েছে, যেখানে পারেনি সেখানে বিদ্রোহ করেছে। বৈষ্ণব, মঙ্গল, সত্য, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্মের উদ্ভব এভাবেই। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন অনার্য ধর্ম চাপা পড়লেও লুপ্ত হয়নি। বাঙালি সংস্কৃতির মূল এই সময়, সম্প্রীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। বিদ্রোহী ধর্মগুলো টিকেনি বটে, কিন্তু এগুলোর সম্মিলনে যে ভিন্ন একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনা তৈরি হয়েছে তা বাঙালি সংস্কৃতির কাণ্ড স্বরূপ। অতএব বাঙালি পর জাতির চিন্তা বা ধর্ম দ্বারা পরিচালিত নয়, পরমতকে সে নিজের মতের সাথে মিশিয়ে নিজের মত গড়ে নিয়েছে। এতে ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে অনার্য প্রাকৃতিক ধর্ম ও সাংখ্য, তন্ত্র ও যোগ প্রভৃতি ধর্ম ও দর্শন। বাংলার নিজস্ব অনার্য দেবদেবীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাঙালি নিজস্ব ধর্ম ও দর্শন দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে। সিন্ধুর হিন্দু, আরবের ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের মত বাঙালি অনার্যদেরও একটি ধর্ম ছিল, যা আজ প্রচলিত রূপে টিকে আছে এবং অলক্ষ্যে বাংলায় চর্চিত সকল ধর্মকে প্রভাবিত করেছে। এ ধর্ম বাঙালির ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয়। ইহা বাঙালির আত্মবিশ্বাসে সমৃদ্ধি ঘটাবে।

তথ্যসূত্র

- আবদুল হাই, মুহাম্মদ ও আহমদ শরীফ, ডক্টর। *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪।
ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ। *বাংলার বাউল ও বাউল*। কলিকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৭৮।
দাস, ঋষি। *রামমোহন*। কলিকাতা: অশোক প্রকাশন, ১৯৭২।
নস্কর, দেবব্রত। *বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি*। কলকাতা: আনন্দ, ২০১৮।
ফজলে হাসান চৌধুরী, আহমেদ। *নৃবৈজ্ঞানিক প্যারাডাইম রূপান্তরের ধারা*। ঢাকা: ইন্সটিটিউট অফ অ্যাপ্লাইড এ্যানথ্রোপলজী, ২০০৩।
ভূষণ কানুনগো, সুনীতি। *বাংলার ইতিহাস প্রাচীন যুগ*। চট্টগ্রাম: ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪।
রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪২০।
শরীফ, আহমদ। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ১*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৪।
শরীফ, আহমদ। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ২*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০১৪।
H. Morgan, Lewis. *Ancient Society*. Chicago: CHARLES H. KERR & COMPANY, 1877.

মোগল সম্রাটদের কবরে ফারসি শিলালিপি : একটি সমীক্ষা

আলতাফ হোসেন *

প্রতিপাদ্যসার: প্রাচীন রাজা-বাদশাগণ তাঁদের কবরে, মসজিদে, মন্দিরে স্মৃতিসৌধমূলক স্থাপনায় পাথর খোদাই করে বিভিন্ন ধরনের কবিতা বা বাক্য লিখে রাখার জন্য ব্যবস্থা করতেন। এটাকে শিলালিপি বলা হয় অর্থাৎ পাথরে খোদিত লেখনকে শিলালিপি বলে। মোগল সাম্রাজ্য ধরা হয় খ্রিস্টীয় ১৬ শতক থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত। এই সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের শাসকগণ শিলালিপিতে উৎকীর্ণ করার একটি প্রচলন শুরু করেন। আরবি এবং ফারসি ভাষায় এই শিলালিপিগুলো লেখা হতো। কোনো সম্রাট মারা গেলে তাঁর উত্তরপ্রজন্ম সম্রাটের সমাধি তৈরি করে সেখানে ফারসি ভাষায় শিলালিপি লাগিয়ে দিত। যে শিলালিপিতে উৎকীর্ণ হতো তাঁদের শৌর্যবীর্যের ইতিহাস এবং তাঁদের মৃত্যুর পরের কিছু কথা। অত্র প্রবন্ধে শাসকশ্রেণীর সমাধিসমূহ থেকে প্রাপ্ত শিলালিপির উপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে।

শিলালিপি

প্রাচীন রাজাগণ তাঁদের শাসনকাল সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় তামা, লোহা, রূপা, ব্রোঞ্জ, পাথর বা মাটির ফলকে লিখে রাখতেন, এগুলো ‘শিলালিপি’ নামে পরিচিত। একটি শিলালিপি এমন একটি লেখাকে বোঝায় যা একটি পাথরের উপর, ভবনের মাথার প্রান্তে লেখা হয় অথবা এটি বিশেষ কাপড়ের কোণে যেমন পর্দা, টেবিলক্লথ, পতাকা বা বইয়ের পাতায় লেখা থাকে (দেহখোদা ২৫১)। এগুলো থেকে রাজার নাম, বংশপরিচয়, সময়কাল, সাম্রাজ্য বিস্তার, ধর্মবিশ্বাস, প্রশাসন, ব্যক্তিগত গুণাবলি ও অন্যান্য বিষয়াবলি সম্পর্কে জানা যায়। আবার তৎকালীন সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কেও শিলালিপি থেকে তথ্য জানা যায় (তাবিরিযি ৩৪২)।

ফারসি শিলালিপি

ভারতে প্রাপ্ত ফারসি ভাষায় প্রাচীনতম শিলালিপির ইতিহাস হিজরির ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীর। ভারতবর্ষে প্রাচীনতম শিলালিপির মধ্যে প্রথম, দিল্লির কাবা-ই-ইসলাম মসজিদের গায়ে খোদিত শিলালিপি (হেকমাত ২৩)। দ্বিতীয়, ‘বাদাউন’-এ শেখ আহমদ খানদানের কবরের দেওয়ালের গায়ে খোদিত শিলালিপি (রেজাউদ্দিন ৬৩)। হিজরি সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে যেসব পাথরের শিলালিপি পাওয়া যায় সেগুলো সবই ফারসি এবং আরবি শিলালিপি।

নকশে পারসি বার আহজারে হিন্দ গ্রন্থ অনুসারে, ভারতে ফারসি কিউনিফর্মে মাত্র ৬টি শিলালিপি অবশিষ্ট রয়েছে। যেগুলো ভারতের বড় শহর মাদ্রাজের গির্জার অন্তর্গত। যা নেস্টোরিয়ানদের জন্য নির্ধারিত এবং গির্জার পাথরের ত্রুসগুলোর চারপাশে ফারসিতে পাহলাভি ভাষায় লেখা রয়েছে। বিভিন্ন গির্জায় এই শিলালিপিগুলোর পাশে লেখা বাক্যাংশগুলোর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই এবং প্রতিটিতে বারোটি শব্দ রয়েছে। অনেক ফারসি পাথরের শিলালিপি রয়েছে, যার মধ্যে ৮০ টি বিভিন্ন প্রভামূলক বাক্য দ্বারা লিখিত। সেগুলো এখনও প্রায় অক্ষত রয়েছে। তবে নরম পাললিক শিলাগুলোর উপর যে লেখাগুলো ছিলো তা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গেছে (হেকমাত ২৩)। ভারতের প্রাচীনতম ফারসি শিলালিপি দিল্লির কুবা-উল-ইসলাম মসজিদে অবস্থিত। এই শিলালিপিটি ৫৮৭ হিজরি মোতাবেক ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল এবং একই বছর কুতুবুদ্দিন আইবেক দিল্লি জয় করেছিলেন (হেকমাত ২৩)।

* সহকারী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মোগল সাম্রাজ্য

মোগল সাম্রাজ্য ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের একটি সাম্রাজ্য। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে সাম্রাজ্য পশ্চিমে সিন্ধু অববাহিকার বাইরের প্রান্ত, উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান এবং উত্তরে কাশ্মীর, পূর্বে বর্তমান আসাম ও বাংলাদেশের উচ্চভূমি এবং দক্ষিণ ভারতের দাক্ষিণ মালভূমির উপভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মুঘল সাম্রাজ্য মূলত পারস্য ও মধ্য এশিয়ার ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদির বিরুদ্ধে বাবরের জয়ের মাধ্যমে মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। মোগল সম্রাটরা ছিলেন মধ্য এশিয়ার তুর্কো-মঙ্গোল বংশোদ্ভূত। তাঁরা চাঘতাই খান ও তৈমুরের মাধ্যমে চেঙ্গিস খানের বংশধর। ১৫৫৬ সালে আকবরের ক্ষমতারোহণের মাধ্যমে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্রুপদী যুগ শুরু হয়। আকবর ও তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। আকবর অনেক হিন্দু রাজপুত রাজ্যের সাথে মিত্রতা করেন। কিছু রাজপুত রাজ্য উত্তর পশ্চিম ভারতে মোগলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে। কিন্তু আকবর তাদের বশীভূত করতে সক্ষম হন। মোগল সম্রাটরা মুসলিম ছিলেন। তবে জীবনের শেষের দিকে শুধুমাত্র সম্রাট আকবর ও তাঁর পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর নতুন ধর্ম দীন-ই-ইলাহির অনুসরণ করতেন (ইবনে হুমাম ৩০৪)। মোগল সাম্রাজ্যের কাঠামো, বাবরের নাতি আকবরের শাসনের তারিখ ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ ধরা হয়। এই সাম্রাজ্যিক কাঠামো ১৭২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মোগল রাজত্বকালে সর্বোচ্চ ভৌগোলিক ব্যাপ্তি অর্জন করে। পরবর্তীতে তা হ্রাস পায় (সিনহা ৩২১)।

মোগল রাজা বাদশা বলতে সম্রাট বাবর থেকে সম্রাট ২য় বাহাদুর শাহ পর্যন্ত মোট উনিশজন সম্রাট। তাঁদের শাসনকাল ১৫৫৬-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩০১ বছর (আহমাদ ২৭)। এ সময়ের মধ্যে তাঁরা ভারত উপমহাদেশ শাসন করে। তাঁদের অনেকে নামে মাত্র শাসক ছিলেন। তাঁদের কোন শৌর্যবীর্য ছিল না। তাঁরা তাঁদের শাসনকালে বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করেছিলেন। যেখানে ফারসি শিলালিপি ব্যবহার হয়েছে। তবে আলোচ্য প্রবন্ধে কেবল তাঁদের কবরে ব্যবহৃত শিলালিপি সম্পর্কে পরিব্যস্ত থাকবে। মৃত্যুর পর তাঁদের উত্তরসূরীগণ তাঁদের কবরে যে ফারসি শিলালিপি ব্যবহার করেছেন, সে সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস থাকবে।

মোগল সম্রাট জাহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের সমাধি

জাহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ছিলেন মধ্য এশিয়ার একজন বিখ্যাত মুসলিম সম্রাট এবং মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা (বাদাউনি ৩৪৩)। তিনি সাধারণত বাবর নামেই অধিক পরিচিত। ১৪৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি বর্তমান উজবেকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩০ সালের ২৬ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তৈমুর লং এর ৬ষ্ঠ বংশধর ছিলেন। তৈমুরীয় আমির মিরন শাহের মাধ্যমে বাবরের বংশধারা প্রবাহিত হয়েছে এবং মাতার দিক থেকে চেঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন (নাইনি ৬৮)। তিনি মির্জা ওমর সাঈদ বেগের (ওমর শেখ মির্জা) পুত্র ও তৈমুরী শাসক সুলতান মোহাম্মদের প্রপৌত্র ছিলেন। তিনি পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীর লোদি রাজবংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লি দখল করে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। পানিপথের যুদ্ধে তিনিই প্রথম কামানের ব্যবহার করেন এবং তাঁর প্রখর রণকৌশলের কাছে হার মানেন ইব্রাহিম লোদি (আকবরি ২৮)।

১৫৩০ মতান্তরে ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি বাবরের মৃত্যু হলে সিংহাসনে বসেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন। বাবরের প্রথম কবর দেয়া হয়েছিল ভারতেই। তবে পরবর্তীকালে বাবরের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী আফগানিস্তানের আরামবাগ নামক স্থানের চারবাগে (চারবাগ অর্থ চারটা বাগ বা বাগান। বাবর এক খণ্ড ভূমি চার ভাগে ভাগ করে এই বাগ তৈরি করেছিলেন বলে একে চারবাগ বলে।) স্থানান্তরিত করা হয়। বাবরের তৈরি প্রচুর বাগান থাকার কারণে জায়গাটাকে কাবুল বলা হতো। ৯ বছর পর বাবরের ছেলে হুমায়ুন শের শাহ সুরির কাছে পরাজয়ের পর

বাবরের স্ত্রী বাবরের দেহাবশেষ আফগানিস্তানের কাবুলে তাঁর আরেক সৃষ্টি 'বাগ-ই-বাবুরে'-এ স্থানান্তর করেন। তিনি ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে আগ্রায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল কাবুলের যে ৯ বা ১০ টি অনিন্দ্য সুন্দর বাগান করেছিলেন সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হোক। তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণেই তাঁর স্ত্রী ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে আগ্রা থেকে সমাধি সড়িয়ে কাবুলে নিয়ে আসেন (ফেরেস্টে ৩৭২)। তিনি কাবুলের রুম্ম, শুষ্ক ভূমিতে বাগান করেছিলেন। নানাবিধ গাছ ও ফুল ফোটানোর পরিবেশ তৈরি করেছিলেন।



এখানেই শায়িত মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর।

ফারসি ভাষায় সম্রাট বাবরের সমাধির উপর নিচের বাক্যটি লিখা আছে-

باشد این تختگاه فرخنده
تکيه گاه خدايگان کریم

এ হাস্যোজ্জল সিংহাসনে হয়েছে

আল্লাহর নেক বান্দার আরাম করার স্থান।

সম্রাট হুমায়ূনের সমাধি

নাসিরুদ্দিন হুমায়ূন (১৫০৮-১৫৫৬) ছিলেন ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সম্রাট (Gulbadan Begum 260)। সম্রাট জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসির উদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ূন ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর মাত্র ২৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আফগান নেতা শেরশাহের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ূন শেরশাহের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর হুমায়ূন পারস্যের শাসক শাহ তাহমাসাপের রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ১৫ বছর পর ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ূন পারস্যের শাসকের সহায়তায় মোগল সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন (বেগম ৩০৬)। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি গ্রহাগারের সিঁড়ি থেকে

পরে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন (আল্লামি ৪)। নিঃসন্দেহে হুমায়ুন ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক।

তাকে দাফন করা হয় নিজামুদ্দিন এলাকায় এবং দিল্লি শহরের কেন্দ্রস্থলে। হুমায়ুনের সমাধি ভারতীয় উপমহাদেশে নির্মিত প্রথম ইরানি বাগান। কথিত আছে যে, তিনি নামাজের আযান শুনে দ্রুততার সাথে নামতে গিয়ে লাইব্রেরির সিঁড়ি থেকে পড়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন (হাকিম জেজাই ৩৪)। তিনি শিল্প ও বিজ্ঞান পছন্দ করতেন। তাঁর লাইব্রেরিতে তিনি বিপুল সংখ্যক ইরানি এবং ভারতীয় চিত্রশিল্পী, ক্যালিগ্রাফার এবং লেখকদের একত্রিত করেছিলেন যারা বৈজ্ঞানিক কাজ এবং চমৎকার শৈল্পিক অনুলিপি তৈরি ও পুনরুদ্ধারে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতে ফিরে তিনি একদল ইরানি শিল্পীকে সঙ্গে নেন। হুমায়ুনের সমাধি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় নিবন্ধিত।



এখানেই চির নিদ্রায় শায়িত ২য় মুঘল সম্রাট হুমায়ুন।

তাঁর সমাধিতে ফারসি ভাষায় যে শিলালিপি পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপ -

همیشه تا که بنای فلک بود بادا
بنای دولت عمر توا زخل خالی

যতদিন এ আকাশছোঁয়া অট্টালিকা অবশিষ্ট থাকবে
তোমার জীবনের ভিত্তি সমস্যামুক্ত থাকবে।

সম্রাট আকবরের সমাধি

সম্রাট আকবর ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা (Eraly 215)। যুদ্ধক্ষেত্র, সমরনীতি, কূটনীতি ও প্রশাসন সকল ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মোগলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। ইতিহাসে তাই তিনি *Akbar the Great* নামে পরিচিত। সম্রাট হুমায়ুন শেরশাহ এর নিকট পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হয়ে স্ত্রী হামিদা বানুকে নিয়ে পারস্য অভিমুখে যাত্রাকালে রাজস্থানের অমরকোটে ১৫৪২ সালে ২৩ নভেম্বর আকবর জন্মলাভ করেন। জন্মের পর হুমায়ুন শিশুপুত্রের নামকরণ করেন জালালউদ্দিন। প্রথমে কয়েকবছর আকবর তাঁর চাচা হিন্দাল, শামছুদ্দিন খান ও মাহমের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। হুমায়ুন তাঁর পুত্রের প্রথাগত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। আকবর খুব অল্প বয়সেই মল্লযুদ্ধ, অশ্বচালনা, তীরন্দাজ ইত্যাদি যুদ্ধকৌশল সহজেই রপ্ত করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর প্রাক্কালে আকবর

পাঞ্জাবে বৈরামখানের তত্ত্বাবধানে অবস্থান করছিলেন। বৈরাম খান এখানেই আকবরকে পরবর্তী মোগল সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তাঁর রাজ্য অভিষেকের ব্যবস্থা করেন। ১৫৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর উপাধি নিয়ে মাত্র ১৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন (Lal 67)। বিশ্বস্ত বৈরাম খান আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত হন এবং ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট আকবর বৈরাম খানের তত্ত্বাবধানে রাজ্যশাসন করেন। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে বৈরাম খাঁকে সরিয়ে আকবর নিজে সকল ক্ষমতা দখল করেন (Sengupta 186-187)। আকবর ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার চালিয়ে যান। ১৬০৫ সাল তথা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত তাঁর সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে। আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন ও সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন।



সম্রাট আকবরের সমাধি

তাঁর স্ত্রী নাম হামিদাবানু। যিনি ইরানি স্থাপত্যের সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইরানি সমাধি এবং চাহারবাগ বা প্যাঁরাডাইস গার্ডেনের পরিবেশ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে হুমায়ূনের মৃত্যুর এক বছর পরে ১৫৬২ সালে হুমায়ূনের সমাধির কাজ শুরু করেন এবং প্রায় আট বছর পর তা নির্মাণ সমাপ্ত হয় (হেকমাত ৩৪)। এ সমাধিতে লেখা বাক্যগুলো নিম্নরূপ -

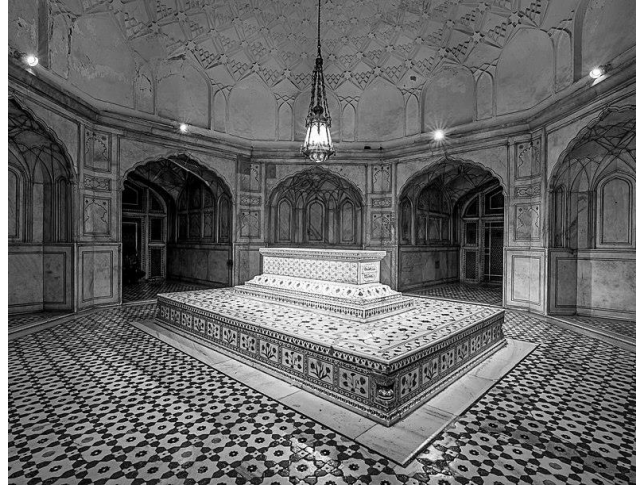
مرحبا خرم فضایی بهتر از باغ بهشت
مرحبا عالی بنایی برتر از عرش برین
کلک معمار قضا بنوشته بر درگاه او
هذه جنات عدن فادخلوها خالدين (88 هـ)

মারহাবা আনন্দময়, বেহেশতের বাগানের চেয়েও উত্তম স্থান।
এই উচ্চ সিংহাসনের মহান ভবনে স্বাগতম।

ভাগ্যের মহান কারিগর তার দরজায় লিখেছেন
এগুলো স্থায়ী স্বর্গ, এতে যারা প্রবেশ করবে তারা চিরন্তন।

জাহাঙ্গীরের সমাধি

নুরুদ্দীন মুহাম্মদ সেলিম বা জাহাঙ্গীর (১৫৬৯ -১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের চতুর্থ সম্রাট (*Sarkar 156-57*)। রাজকুমার সেলিম ৩৬ বছর বয়সে তাঁর বাবার মৃত্যুর ৮ দিন পর ৩০ নভেম্বর ১৬০৫ সালে ক্ষমতায় এসে নিজেকে নুরুদ্দীন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী উপাধিতে ভূষিত করেন। এখান থেকেই তাঁর ২২ বছরের রাজত্বের শুরু হয়। ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন কিন্তু মহব্বত খান ও পারভেজের নিকট পরাজিত হন (*Ahmed 144*)। মূলত সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ব্যবহার ও স্বৈচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে মহব্বত খান বিদ্রোহ করেন এবং সম্রাটকে কাবুল যাওয়ার পথে বন্দি করেন। নুরজাহানের বুদ্ধিমত্তায় সম্রাট মুক্তি লাভ করেন এবং মহব্বত খান দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন (*Rogers 254-55*)। ১৬৩৭ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে রাভী নদীর তীরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি তৈরি করা হয়।



সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি।

تا قیامت شکر گویم کردگار خویش را

آه گر من باز بینم روی یار خویش را

অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত আমি আমার স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দেব।
হায়, যদি আমি আমার বন্ধুর মুখ আবার দেখতে পেতাম।

নুরজাহানের সমাধি

নুরজাহানের প্রকৃত নাম মেহের-উন-নিসা। তিনি ছিলেন ইরানের ইম্পাহান হতে আগত ভাগ্য অন্বেষণকারী মীর্জা গিয়াস বেগের কন্যা। নুরজাহান ছিলেন অপূর্ব রূপসী ও বহুবিদ গুণের অধিকারী। যুবরাজ সেলিম নুরজাহান দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু সম্রাট আকবরের নির্দেশে পারসিক যুবক আলীকুলি খানের সাথে নুরজাহানের বিবাহ সম্পন্ন হয়। আলীকুলী খানকে বাংলার বর্ধমানে জায়গীর প্রদান করা হয়। কিন্তু ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক সামরিক অভিযানে মৃত্যুবরণ করেন (আমিরদাদ ১৪)। অতঃপর, ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর মেহের-উন-নিসাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর উপাধি দেন ‘নুর মহল’ (প্রাসাদের আলো) ও পরে নুরজাহান (পৃথিবীর আলো)। সম্রাটের রাজকার্যে নুরজাহানের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাঁর ভ্রাতা আসফ খান ও পিতা মীর্জা গিয়াস বেগ রাজদরবারে উচ্চ পদে আসীন হন। ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে নুরজাহান মৃত্যুবরণ করেন। নুরজাহান ছিলেন মোগল যুগের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের রমণী। তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, বুদ্ধিমত্তা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নানাবিধ গুণের উপস্থিতি তাঁকে সম্রাটের নিকট অত্যন্ত প্রিয়ভাজন করে তুলেছিল। তাই সম্রাটের রাজনৈতিক জীবনে সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের প্রভাব ছিল অপরিসীম। সম্রাট নিজেই কাব্য করে বলতেন, “I have sold my kingdom to my beloved queen for a cup of wine and a dish of soup”.



নুরজাহানের সমাধি

নুরজাহানের সমাধিতে নিম্নের ফারসি চরণ দু’টি লিপিবদ্ধ আছে :

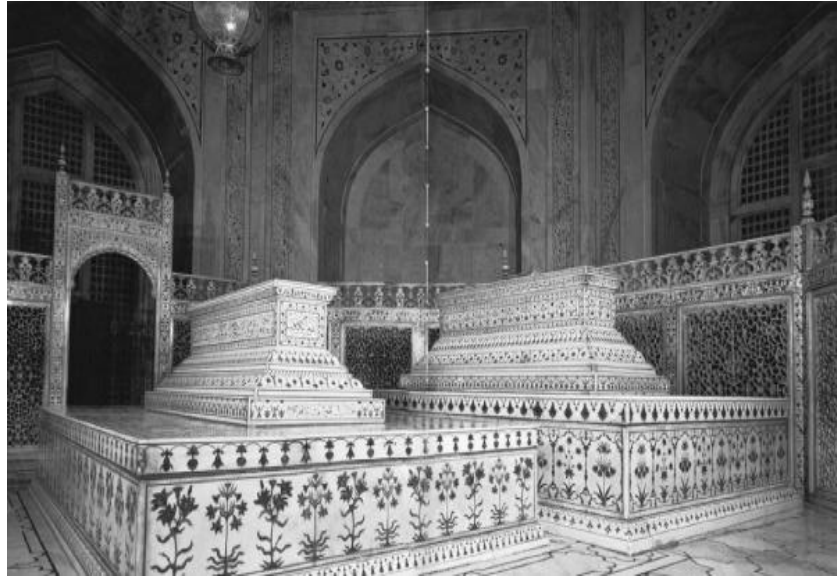
چین خوش منظری عالی مقامی
بدین عالم ندیده چشم ایام
پی تاریخ اتمامش خرد را
چو پرسیدم بگفتا یافت اتمام

মহান এ সৌন্দর্যময় দৃশ্য এমনই যে, এমনতর দৃশ্য পৃথিবীতে দেখেনি কোনো কালে চোখ,
আমি তাকে এর সমাপ্তির তারিখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, এবং তিনি বললেন যে এটি শেষ হয়েছে।

শাহজাহানের সমাধি

শাহবুদ্দিন মুহাম্মদ খুররাম শাহ জাহান (১৫৯২- ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ) মোগল সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। তিনি ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ শাসন করেছেন। শাহজাহান নামটি এসেছে ফারসি ভাষা থেকে যার অর্থ ‘পৃথিবীর রাজা’। তিনি ছিলেন বাবর, হুমায়ুন, আকবর, এবং জাহাঙ্গীরের পরে পঞ্চম মোগল সম্রাট। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং তাঁর হিন্দু রাজপুত স্ত্রী তাজ বিবি বিলকিস মাকানির সন্তান। সিংহাসন আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত শাহজাদা খুররাম নামে পরিচিত ছিলেন। ১৬২৭ সালে পিতা জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন (Sharma 45)। তাঁর শাসনামলে মুঘলরা স্থাপত্য এবং সাংস্কৃতিক গৌরবের শিখরে পৌঁছেছিল। দাদা আকবরের মতো তিনিও তাঁর সাম্রাজ্য প্রসারিত করতে আগ্রহী ছিলেন। ১৬৫৮ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে পুত্র আওরঙ্গজেব তাঁকে বন্দী করেন এবং বন্দী অবস্থায় ১৬৬৬ সালে আগ্রা দূর্গে তাঁর মৃত্যু হয় (হাবিবুল্লাহ ২)।

তাজমহল ভারতের উত্তর প্রদেশে আগ্রায় অবস্থিত একটি রাজকীয় সমাধি। মোগল সম্রাট শাহজাহান তাঁর স্ত্রী আরজুমন্দ বানু বেগম যিনি মমতাজ মহল নামে পরিচিত, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই অপূর্ব সৌধটি নির্মাণ করেন। সৌধটির নির্মাণ শুরু হয়েছিল ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে। যা সম্পূর্ণ হয়েছিল প্রায় ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে। তাজমহলের নির্মাণ কাজ শেষ হতে না হতেই শাহজাহান তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেব দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত ও আগ্রার কেল্লায় গৃহবন্দী হন। কথিত আছে, জীবনের বাকি সময়টুকু শাহজাহান আগ্রার কেল্লার জানালা দিয়ে তাজমহলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েই কাটিয়েছিলেন। শাহজাহানের মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব তাঁকে তাজমহলে তাঁর স্ত্রীর পাশে সমাহিত করেন।



শাহজাহানের সমাধি

তাজমহলের সমাধির ভিতরে (ইউনেস্কোর নতুন সাতটি আশ্চর্য) মার্বেল এবং কোরআনের আয়াত দ্বারা সজ্জিত দুটি সমাধি পাথর রয়েছে এবং প্রথমটিতে ফারসি লিপিতে লেখা রয়েছে :

مرقد منور ارجمندبانو بیگم مخاطب بـممتاز محل متوفی سنه...

আরজামান্দবানু বেগমের কবর, যাকে মমতাজ মহল বলে ডাকা হয়, তাঁর মৃত্যুর তারিখ.. ।
তাজমহলের মূল ভবনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অংশ ছাড়াও আশেপাশের ভবনে, প্রবেশপথের খিলান ও উল্লেখিত মসজিদের গায়ে কোরআনের বহু আয়াত ও ফারসি লেখা উৎকীর্ণ রয়েছে। যা প্রতিটি দর্শকের চোখকে মুগ্ধ করে।
উদাহরণস্বরূপ, মূল ভবনের চার পাশে কোরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ রয়েছে। এছাড়াও শাহজাহান ও তাঁর স্ত্রী মমতাজের সমাধির পাথরে এই কবিতাটি খোদাই করা আছে :

پادشاهی که تیغ او سازد
چون دو پیکر سر عدو بدونیم (۵۶) (হেকমাত

যে রাজা এটি তৈরি করেছে
যখন আমরা জানি শত্রুর মাথায় দুটি লাশ আকৃতি ।

অন্যত্র লেখা আছে-

بغیر سبزه نپوشد کسی مزار مرا
که قبرپوش غریبان همین گیاه بس است

সবুজ কিছু ছাড়া কেউ যেন আমার কবর ঢেকে না দেয়
কেননা সবুজ আবরণ নিঃস্ব ব্যক্তির কবর ঢেকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ।

আওরঙ্গজেবের সমাধিসৌধ

আওরঙ্গজেব ছয়জন মহান মোগল সম্রাটের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন (*Encyclopædia Britannica* 341)। শেখ জইনুদ্দিনের দরগাহ একটি অনির্ধারিত স্থানে আওরঙ্গজেবকে সমাহিত করা হয়।
আওরঙ্গজেব (১৬১৮-১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন ষষ্ঠ মোগল সম্রাট (*Chandra* 50)। ১৭০৭ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতক বছর ধরে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ স্থান জুড়ে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি ১৭০৭ সালে আহমেদ নগরে মৃত্যুবরণ করেন (হেকমাত ৬৭)। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ‘আধ্যাত্মিক গুরু’ শেখ জইনুদ্দিনের দরগাহের নিকট তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর প্রপিতামহ সম্রাট আকবর ৫০ বছর দিল্লী শাসন করেছিলেন। তাঁর পুত্র আজম শাহ্ এবং কন্যা জিনাত-উন-নিসার আগমনের পরে তাঁর মরাদেহ খুলাদাবাদে নিয়ে আসা হয়। সেখানে লাল পাথরে তৈরি সমাধির উপরে তিন গজ দীর্ঘের একটি উঁচু সমতল স্থান এবং মাঝ বরাবর কয়েকটি আঙ্গুল আকৃতির একটি গর্ত রয়েছে। সমাধিটির মাটিতে তৃণলতা বেড়ে উঠেছে। সমাধিস্থ করার পরে তাঁকে খুলদ-মাকান (অনন্তকালের আবাস) উপাধি দেয়া হয় (হেকমাত ৬৭)। বলা হয়ে থাকে যে, আওরঙ্গজেব তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে টুপি সেলাই করে অর্থ উপার্জন করেন এবং সেই অর্থ থেকে নিজের সমাধির জন্য

মূল্য পরিশোধ করেন। এতে খরচ হয় মাত্র ১৪ রুপী ১২ আনা। আওরঙ্গজেব তাঁর সমাধিস্থলকে জাঁকজমক পূর্ণ করার বিরোধী ছিলেন এবং তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সমাধিস্থলকে খুবই সাধারণভাবে তৈরি করা হয়।



সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমাধি।

উত্তরের বেদির শিলালিপিতে নিম্নরূপ লেখা আছে:

«بمصاحفه آسمانیان مائل، یالالی متلائی است بانعام زمینیان نازل و حوض که همه از آب زندگانی پر بصفار شک نور و چشمه خور...» (৪০ হেকমাত)

"আকাশের সহিফা অনুসারে, পৃথিবীর মানুষ ঝুঁকছে পৃথিবীর দিকে যার সবই জীবনের জলে ভরা, যা আলকিত বিষয়ে সন্দেহ তৈরি করে এবং দৃষ্টিহরণ করে ... "

আগ্রা লাল কেল্লা

তাজমহল গম্বুজ থেকে এটি এক কিলোমিটারেরও বেশি দূরে অবস্থিত। এটি ১৫ হেক্টরের বেশি এলাকা জুড়ে রয়েছে। যা দীর্ঘদিন ধরে সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের শাসন এলাকা হিসাবে পরিচিত। এখানে অনেক ফারসি শিলালিপি দেখা যায়। রাজদরবার বা বিশেষ আদালতের যে কোনো একটি দেয়ালে একটি দীর্ঘ কবিতা খোদাই করা আছে। যাতে ভবনের ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে।

از این دلگشا قصر عالی بنا
سر اکبر آباد شد عرش سا
بود گنگرش از جبین سپهر

نمایان چو دندان سین سپهر
بر احوال مردم چنان سر حساب
که داندچه بیند شبها بخواب
در ایوان شاهی بصد احتشام
چو خورشید بر چرخ بادا مدام (85) (হেকমাত)

এ হৃদয়গ্রাহী সুউচ্চ প্রাসাদ
আকবরের শির আরশসম উচ্চতায়।
মানুষের অবস্থার ব্যাপারে মাথায় হিসাব
সে তার রাতের স্বপ্নসমক অবগত।
শাহী দারমন্ডপের শতধাপে
সূর্য যেন অবিরত প্রদক্ষিণ করে চলে।

দিল্লির লাল কেল্লা

দিল্লির লাল কেল্লার আয়তন প্রায় বিশ হেক্টর। এর দুটি উত্তর ও দক্ষিণ বেদি রয়েছে। এই দুটি বেদিতে সাদা মার্বেলের উপর নাস্তালিক লিপিতে এবং সোনার জল দিয়ে সুন্দরভাবে লেখা আছে:

«سبحان الله اين چه منزلهاست - رنگين و نشيمنهاست - دلنشين قطعه بهشت برين چون گويم که
قدسيان همت بلند به تماشايش آرزومند...» (32) (হেকমাত)

"আল্লাহ পুতপবিত্র মহিমা হোক, কতই নাহ সুন্দর ঘরগুলো -রঙিন ও আরামদায়ক - স্বর্গের একটি মনোরম অংশে
যান কারণ আমি বলি যে পবিত্র লোকেরা এটি দেখতে চায় ..."

এই দুটি শ্লোক দিল্লির লাল কেল্লার কপালে লেখা রয়েছে :

طاقى که از رواق نهم چرخ برتر است / روشن ز سایه اش رخ تابنده اختر است
این طاق، زیب نه فلک و هفت کشور است / از روضه ی منوره ی شاه اکبر است

তার খিলানটি নভোমন্ডলের আবর্তের চেয়ে উচ্চতর / তার ছায়া থেকে উজ্জ্বলতা হল তারার উজ্জ্বলতা, এ যেন
নয়টি মহাদেশের মণি সম্রাট আকবরের কবরের জ্যোতি।

ফতেহপুর সিক্রি

সম্রাট আকবর রাজত্বের প্রথম আঠারো বছরে এই ভবনটি নির্মিত হয়েছিল। আগ্রা থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার
দূরে অবস্থিত এবং প্রাথমিকভাবে এটিকে তার রাজধানী হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। রাজপ্রাসাদের কক্ষগুলোর
ওপরে সোনালি জলে চারটি পদ লেখা আছে, যার একটি নিম্নরূপ।

چون ملک هر که کند سجده خاک در تو
شود از خاصیت خاک درت زهره جبین
فرش ایوان ترا آینه سازد رضوان
خاک درگاه ترا سر مه کند حورالعین (88) (হেকমাত)

কারণ যে তোমাকে সেজদা করবে পৃথিবী
পৃথিবীর সম্পদ আয়নায় পরিণত হবে
তোমার বারান্দার কার্পেট আয়নায় পরিণত হবে
তোমার দরজার মাটি লাল হয়ে যাবে।

বাহাদুর শাহ দ্বিতীয়

তিনি 'বাহাদুর শাহ ফিরৌজ' এবং "আবুল মুজাফ্ফর সিরাজুদ্দিন মুহাম্মদ বাহাদুর শাহ জাফর" নামে পরিচিত ছিলেন। ভারতের গুরকান রাজবংশের শেষ মোগল সম্রাট। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় আকবর শাহের পুত্র। তিনি ভারতের শেষ মুসলিম রাজা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত।



দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ সমাধি।

বাহাদুর শাহ সাহিত্য ও ক্যালিগ্রাফিতে খুব আগ্রহী ছিলেন এবং গজল আকারে উর্দু ও ফারসি ভাষায় কবিতা লিখেছেন। ব্রিটেন সরকার তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের বাকি সদস্যদের গ্রেপ্তার করে বিচারের মুখোমুখি করে। অবশেষে তাঁকে দিল্লি থেকে নির্বাসিত করে বার্মার ইয়াঙ্গুনে নির্বাসিত করে। তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করলে তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়। তাঁর কবরে নিম্নোক্ত উর্দু কবিতাটি লেখা আছে-

لگتا نہیں ہے دل مرا اجڑے دیار میں
کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں
ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں
اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں
کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں
یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں
بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلہ

قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں
کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے
دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں (86 ہکमत)

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় এই মোগল সম্রাটদের কবরে খোদাই করা এ সকল শিলালিপি প্রমাণ করে এদেশে ফারসি ভাষা কতটা গভীরে প্রবেশ করেছিল। ঐ সকল শিলালিপি ইতিহাসের অংশ হয়ে গিয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে একদিকে যেমন মোগল সম্রাটদের শৌর্যবীর্যের ইতিহাস জানা যায়, অন্যদিকে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান লাভ হয়।

তথ্যসূত্র

দেহখোদা, আলি আকবার। *লোগাতনামা দেহখোদা*। ১১ খন্ড, তেহরান: মাজলিসে শুরায়ে ইলমি, ১৩৫৯।

তাবরিযি, মুহাম্মদ তাকি জা'ফরি। *ফারহাঙ্গে জামে নাবিন*। ১ম খন্ড, তেহরান: এন্তেশারাতে ইসলাম, ১৩৭১।

মুহাম্মদ রেজাউদ্দিন। *কানযুত তাওয়ারিখ*। তেহরান: কিতাবখানায়ে ইবনে সিনা, তা.বি।

হেকমাত, আলি আসগার। *নাকশে ফারসি বার আহজারে হিন্দ*। তেহরান: কিতাবখানায়ে ইবনে সিনা, ১৩৩৭।

সিনহা, গোপাল চন্দ্র। *ভারতবর্ষের ইতিহাস*। কলকাতা: প্রেন্সিড পাবলিশাস, ১৯৯৭।

নিয়ামুদ্দিন আহমাদ। *তাবাকাতে আকবরি*। ২য় খন্ড, কলকাতা: ১৯৩১।

বাদাউনি, আব্দুল কাদের বিন মালিকশাহ। *মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ*। প্রথম খন্ড, কলকাতা: ১৮৬৮।

জালাল নাইনি। *হিন্দ দার এক নিগাহ*। তেহরান: এন্তেশারাতে শিরাজ, ১৩৭৫।

Chandra, Satish. *Parties and politics at the Mughal Court*. Oxford University Press. 2002.

Sunita Sharma. *Veil, Sceptre and Quill*. Profiles of Eminent Women, 16th–18th Centuries, 2004.

Jadunath Sarkar: *Mughal Administration*. M. C. Sarkar, 1952.

Nizamuddin Ahmed: *Tabaqat-i-Akbar*, 1990.

Subhadra Sengupta. *Akbar's magnificent city on a hill*. New Delhi: Israni, Prakash. Fatehpur Sikri, Niyogi Books, 2013.

Lal, Kishori Saran. *Theory and Practice of Muslim State in India*. Prakashan: Aditya Prakashan, 1999.

Abraham Eraly: *The Mughal Throne: The Saga of India's Great Emperors*, Phoenix, 2004.

Encyclopædia Britannica. Akbar (Mughal emperor), Retrieved 18 January, 2013

Alexander Rogers, (translated into English) *Tuzuk-i-Jahangiri*, Vol. I, New Delhi: first published 1909-1914, New Delhi Reprint, 1978.

Gulbadan Begum: *The History of Humāyūn (Humāyūn-nāmah)* Royal Asiatic Society, 1902.

گل بدن بیگم. همایون نامه، متن همراه با ترجمه بوریج، لندن، 1902،

علمی، ابوالفضل بن مبارک. اکبرنامه، کلکته ۱۸۷۷

حکیم زجاجی. همایون نامه تاریخ منظوم، تهران: مجلد یکم تهران، قطع وزیری

قاسم بن غلامعلی فرشته. تاریخ فرشته، ج ۱.

هفته نامه / مرداد. شنبه ۱۴ بهمن، سال سیزدهم، شماره ۲۹۰، ۱۳۹۱

حبیب الله فضایی. / طلس خط. اصفهان: انتشارات مشعل اصفهان، چاپ دوم، ۱۳۶۲

সাইমন জাকারিয়ার নাটক সীতার অগ্নিপরীক্ষা: পৌরাণিক চরিত্র সীতার বিনির্মাণ

ফারজানা আফরীন রূপা *

প্রতিপাদ্যসার: নাট্য আঙ্গিক নিয়ে নব নব নিরীক্ষার প্রয়াসে সমসাময়িক নাট্যকারদের মাঝে সাইমন জাকারিয়া স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তাঁর নাট্যসম্ভারের বিশালাংশ জুড়ে আছে পুরাণের চরিত্র ও ঘটনাবলির বিনির্মাণ-পুনর্নির্মাণ। বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের রামায়ণের ঘটনাবলি অপরিবর্তিত রেখে, নতুন চিন্তা ও ব্যাখ্যায় সীতার অগ্নিপরীক্ষা নাটকে সীতা চরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার সাইমন জাকারিয়া। এই সীতা পুরাণের ন্যায় পতিব্রতা, সহনশীল একই সাথে সুখাশ্রমী ও আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন। স্বামী গর্বের সমান্তরালে নিজ প্রেমের প্রতি আস্থাশীল কিন্তু প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির গড়মিলে বিদ্রোহী। সাহিত্যে বিনির্মাণ তত্ত্বের উদ্দেশ্য একটি সাহিত্য কর্মকে বার বার পঠন ও বিশ্লেষণপূর্বক শিল্পের প্রকৃত রসের অনুসন্ধান ও নতুন ব্যাখ্যা তথা দৃষ্টিভঙ্গিতে তার উপস্থাপন। নাট্যকার সাইমন জাকারিয়ার এই নাটকে কীরূপে পুরাণ অবলম্বন করেও সীতা চরিত্রকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে বিনির্মাণ করেছেন, তা এই গবেষণা প্রবন্ধের মূল প্রশ্ন। মহাকাব্য রামায়ণের ঘটনাবলি অবলম্বনে নাট্যকারের তুলে ধরা সীতা কেন্দ্রিক এগিয়ে চলা নাট্য ঘটনা, প্রাসঙ্গিক তথ্য, যুক্তি ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে গুণগত পদ্ধতিতে (Qualitative method) এই গবেষণা প্রবন্ধটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ভূমিকা

বাংলাদেশের নাটকে যে ক'জন নাট্যসাধক পশ্চিমা নাট্যরীতির অনুকরণ পরিহার করে বাঙালির সহস্রাবর্ষী নিজস্ব নাট্যরূপ আঁকড়ে সাধনায় রত তাঁদের অন্যতম সাইমন জাকারিয়া। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যাভিনয়ের বর্ণনা-গীত-নৃত্য-সংলাপের আশ্রয়ে চর্যাপদ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতাগতির সামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয়, আধুনিক মানবের অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মনঃস্তব্ধ, বিশ্বসাহিত্য এমনকি পুরাণের বিচিত্র ঘটনাবলিও তিনি বিষয়রূপে অবলম্বন করেছেন তাঁর নাটকে চিন্তা ও ব্যাখ্যার ভিন্নতায়। বিশ্বসাহিত্য ও সাহিত্যে বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার ইতিহাস যেমন সমবয়সী, তেমনি বাংলা সাহিত্যেও বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার ইতিহাস অর্বাচীন নয়। আধুনিক কালের বাংলা নাটকে নব ভাবনায় পুরাণের চর্চা বিশেষত রামায়ণ-মহাভারতের বিচিত্র ঘটনাবলি ও চরিত্রের বিনির্মাণ পাঠক, দর্শক এবং গবেষকগণকে নিত্য নতুন যুক্তি-ভাবনায় তাড়িত করছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সীতা, যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর সীতা, মনোজ মিত্রের ভেলায় ভাসে সীতা, বুদ্ধদেব বসুর রাবণ, তপস্বী ও তরঙ্গিনী, প্রথম পার্থ, কালসন্ধ্যা, সংক্রান্তি, অনান্দী অঙ্গনা, শাঁওলী মিত্রের নাথবতী অনাথবৎ, কথা অমৃতসমান প্রভৃতি বিনির্মাণ তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। পুরাণের চরিত্রের নব ব্যাখ্যার প্রচেষ্টায় নাট্যকার সাইমন জাকারিয়া রামায়ণের অন্যতম প্রধান চরিত্র সীতার অগ্নিপরীক্ষাকে বিষয়রূপে অবলম্বন করেছেন সীতার অগ্নিপরীক্ষা নাটকে। রামায়ণের বিচিত্র ভাষ্য অনুপুঞ্জ পাঠপূর্বক মূল ঘটনাবলি অপরিবর্তিত রেখে পুরাণের সীতা চরিত্রকে আধুনিক কালের যুক্তি ও ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার তাঁর এই নাটকে।

* সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা সমস্যা বিবৃতকরণ

রামায়ণের প্রধান নারী চরিত্র সীতা সম্পর্কিত গবেষণায় গবেষকগণ রাম সঙ্গিনী সীতাকে দেবীরূপ বৈশিষ্ট্যে মহিমাম্বিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন প্রায় সর্বত্র। বঙ্কনা তথা নারীর যাতনাকে মানবতার মানদণ্ডে নিরীক্ষণের প্রচেষ্টা গবেষণাকর্ম সমূহে কম লক্ষ্যনীয়। তাই গবেষণা সমন্বিত প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাবলিতে সীতা চরিত্রকে দেবীর অনুপম গুণে গুণাবিতা হিসেবে উপস্থাপন ও প্রাসঙ্গিক যুক্তি প্রদান গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গীকে বার বার আচ্ছন্ন করেছে। সীতা চরিত্রকে পুরাণের বাধ্যবাধকতার উর্দে স্থাপন করে দমন-পীড়ন নীতির বিপরীতে নারীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গীই গবেষককে আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহ জুগিয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য বিনির্মাণ তত্ত্বের আলোকে নাট্যকার নতুন ভাবনায় যে সব বৈশিষ্ট্য দ্বারা সীতা চরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন তার অনুসন্ধান। গবেষণা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য পৌরাণিক চরিত্র সীতাকে নাট্যকার একই সাথে কীরূপে পতি প্রেমে বিভোর, কষ্টসহিষ্ণু অথচ আধুনিক কালের নারীর বৈশিষ্ট্য সুখের জন্য তৃষ্ণার্ত এবং আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় বিদ্রোহী এমন পরস্পর সম্পর্কিত অথচ বিপ্রতীপ বৈশিষ্ট্যে গড়েছেন তার যুক্তি আশ্রয়ী বিশ্লেষণ।

গবেষণা কাঠামো/ প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক জাক দারিদাকে বিনির্মাণ তত্ত্বের প্রবক্তা বলে অভিহিত করা হয়। বিনির্মাণ মূলত একটি পাঠ- প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় শেষ বা চূড়ান্ত বলে কোন কিছুকে স্বীকার করা হয় না। মূল্য দেয়া হয় বিবর্তনকে। এক পাঠ থেকে পরবর্তী পাঠে ক্রমাগত বিবর্তিত হয় পাঠের ব্যাখ্যা। প্রতিটি পূর্ব পাঠকেই অস্বীকার করে নব পাঠ-প্রক্রিয়া। “পাঠ থেকে পাঠান্তরের পার্থক্য-প্রতীতিকে অনুধাবন করার প্রক্রিয়াই হলো বিনির্মাণ” (ভট্টাচার্য ৩২)। বিশিষ্ট গবেষক তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর *জাক দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ* গ্রন্থে বলেছেন:

পাঠকৃতির তাৎপর্য গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া যেহেতু মূলত অনন্য, যথাপ্রাপ্ত সংস্কারের বলয় এড়িয়ে ও বহুস্তর-বিন্যস্ত বিশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করে ওই অনন্যতার প্রতিষ্ঠা হতে পারে। একদিকে চিন্তন ও লিখন প্রক্রিয়ায় পরিমিতির প্রতি সংলগ্নতা অন্যদিকে অপরিমেয়ের জন্য ব্যর্থতা-এই দুইয়ের আততিতে গড়ে ওঠে পাঠকৃতি ও তার তাৎপর্য। দেরিদা বিনির্মাণকে এই সূক্ষ্ম টানাপোড়েন ও হয়ে ওঠার দ্বিবাচনিকতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রাখতে চেয়েছেন।

এই সূত্রেই বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক যুক্তির অন্ধবিন্দু (aporia) সম্পর্কে দেরিদার বিখ্যাত বক্তব্য। এইসব অন্ধবিন্দু বা আত্মবিরোধিতার মুহূর্তগুলো বিভিন্ন পাঠকৃতির হয়ে-ওঠায়, তাদের যুক্তিবিন্যাসে এত অনিবার্য যে এদের সম্পর্কে বিনির্মাণকে অতন্দ্র গ্রহণের ভূমিকা নিতে হয়। [...] প্রকৃতপক্ষে অধ্যবসায়ী আবিষ্কারকের ভূমিকা নেয় বিনির্মাণ। পাঠকৃতি নিজেরই অজ্ঞাতসারে ও সচেতনভাবে বাচন ও যুক্তিক্রমের মধ্যে টানাপোড়েনকে ধারণ করে বলে এসব অন্ধবিন্দুর উদ্ভব হয়। কেননা পাঠকৃতি স্পষ্টত যে প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রতীত অর্থের ধারণা তৈরি করে এবং কার্যত ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইশারার মধ্য দিয়ে যে-ধরনের তাৎপর্যে পৌছায়-এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান থেকে যায় বলে বাচনের বিভিন্ন স্তরে আততি দেখা দেয়। কোনও রচনা যখন বিনির্মিত হয়, ব্যক্ত ও অব্যক্তের যথাপ্রাপ্ত সম্পর্কে তাতে প্রত্যাঙ্গান জানানো হয়। সোচ্চার ও নিরুচ্চার একে অপরের স্থান দখল করে নেয়। [...] লেখক শব্দ ও নৈঃশব্দের দ্বিবাচনিকতায় পাঠকৃতিকে গড়ে তোলার পরে কখনও কখনও নিজের ভূমিকা ভুলে যান। বিনির্মাণবাদী পাঠক তখন

লেখকের বিস্মৃতি সম্পর্কে সচেতন থেকে বয়নের ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরের মধ্যে 'strategic reversal' ঘটিয়ে দেন। পাঠকৃতিতে যা-কিছু অনতিব্যক্ত ও আপাত-গৌণ, তাদের প্রান্তিক অবস্থান থেকে ওরা চলে আসে মনোযোগের কেন্দ্রে। [...]

প্রতিবেদনে যাদের হয়তো লেখার টানে চলে-আসা আকস্মিক অনুষ্ণ বলে মনে হয় অর্থাৎ যেসব অনুপুঞ্জ সাধারণভাবে মনোযোগ এড়িয়ে যায়- সেইসব রূপক বা প্রতীক, পাদটীকা, যুক্তিবিন্যাসের হঠাৎ বাঁক-ফেরা, বয়ানের কোনও নতুন কৌনিকতা বিনির্মাণের ফলে অপ্রত্যাশিত ভাবে পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যেতে পারে। সাধারণ পাঠে ভাষ্যকারেরা এদের লক্ষ্যই করেন না। কিন্তু পাঠকৃতির এইসব প্রান্তিক পরিসর বিনির্মাণবাদীদের দ্বারা আশ্চর্যজনকভাবে আবিষ্কৃত ও পুনঃপাঠিত হয়ে থাকে। [...] তখন তাৎপর্যের যাবতীয় আয়তন আমূল বদলে যায়। বলা বাহুল্য, এটা কোনও সাধারণ পাঠ-প্রকরণ নয়, জীবন-জগৎ-দর্শন-নন্দন-বিষয়ে অভিনব এক প্রায়োগিক কৃৎকৌশল (ভট্টাচার্য ৪৫-৪৭)।

অর্থাৎ, একটি টেক্সটকে পুনঃপুনঃ পাঠ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠাভ্যন্তরের অন্তর্নিহিত বিষয় উন্মোচন পূর্বক নতুন ব্যাখ্যা শিল্প রসিক বা পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয় বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায়। প্রখ্যাত গবেষক কবীর চৌধুরী তাঁর সাহিত্যকোষ গ্রন্থে বিনির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন: “[...] এ প্রক্রিয়ায় একটি টেক্সটকে সম্বন্ধে পড়ে, বাইরের সব প্রভাব বর্জন করে, শুধু টেক্সটের ভেতর থেকেই তার যাবতীয় অর্থ হেঁকে তোলায় চেষ্টা করা হয়” (চৌধুরী ৪৯)।

তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ

সীতার অগ্নিপরীক্ষা নাটকের প্রারম্ভেই নাট্যকার সীতা চরিত্রে দেবী সুলভ বৈশিষ্ট্য আরোপ না করে বরং অশোক কাননে বন্দী এক সাধারণ নারী সীতাকে উপস্থাপন করেছেন। সীতা চরিত্রের অতিমানবীয় দৃঢ়তা প্রকাশক ঘটনাসমূহ যেমন অপহরণে তৎপর রাবণের উদ্দেশ্যে তেজেদীপ্ত সীতার কটুবাক্য প্রয়োগ ও রাবণের সামনে সামান্য তৃণ রেখে তা অনতিক্রম্য বলে ঘোষণার ঘটনাটি নাট্যকার পরিহার করেছেন সজ্ঞানে। শ্রীমতি আশালতা সেনকৃত বাল্মীকী-রামায়ণের সারাংশের পদ্যানুবাদে রাবণ আর সীতার কথোপকথন নিম্নরূপ:

কহিলেন নির্ভয়েতে, করি এক তৃণ সংস্থাপন
নিজের ও রাবণের মাঝে সেথা, বিশাল নয়ন,
দীর্ঘ বাহু, ধর্মশীল রাম মম পতি দেবোপম (বাল্মীকি ৩৪২)।

রামায়ণের সীতা অসামান্য নারী। আত্মতেজে বলিয়ান এই সীতা অনায়াসে নিজ আর শত্রুর দূরত্ব রক্ষায় সামান্য তৃণকে প্রতীক অস্ত্ররূপে স্থাপন করে তীব্র কটাক্ষে রাক্ষসরাজকে নিরস্ত্র করতে সক্ষম হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে সীতা ভীত কিন্তু নিজ সতীত্ব রক্ষায় অকুতোভয়। তৃণকে সামনে রেখে সুরক্ষা রেখা সৃষ্টির ঘটনা এই রামায়ণে উল্লেখ না থাকলেও রামপত্নী রাক্ষসরাজের কুপ্রস্তাবে প্রাণের ভয় না করেই হয়ে বলেন:

মক্ষিকা না পারে কভু বজ্র ধরিবারে।
রাবণ না পারে কভু লইতে সীতারে।। (কৃত্তিবাস ২৫৩)।

মধ্যযুগের নারী কবি চন্দ্রাবতী রচিত *রামায়ণে* রাবণের হাতে অপহৃত হবার পরমুহূর্তে সীতাদেবী তার দিকে অলঙ্কার ছুঁড়ে মুক্ত হবার প্রয়াস চালান। এই *রামায়ণে* কবি অশোককাননে বন্দী সীতার সাথে রাক্ষসরাজের মুখোমুখি হবার ঘটনাকে সম্বন্ধে এড়িয়েছেন। অশোককাননে বন্দী সীতা রাম বিচ্ছেদে শোকগ্রস্তা, অনাহারে মৃতপ্রায় কিন্তু স্বামীর সাথে পুনর্মিলনের আশায় মৃত্যুকে দূরে ঠেলে জীবনকে আঁকড়ে ধরা আশাবিত্তা এক নারী। চন্দ্রাবতীর সীতা বলেন:

বস্ত্র অলঙ্কার ত্যজি গো নিদ্রা ও আহার।

রাক্ষসের গৃহে থাকি গো করি অনাহার।।

... ..

মরণে বাসনা নাই গো চরণের আশে।

সীতার চক্ষের জলে গো অশোক-বন ভাসে।। (চন্দ্রাবতী ৩৮)।

অপরদিকে সাইমন জাকারিয়া তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন অশোককাননে বন্দী সাধারণ এমন এক সীতাকে- যে বিপদে পতিত, ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে যার তুল্য অসহায় লক্ষ্য আর কেউ নেই। ভীত ও বন্দী এই সীতা রাবণের প্রণয় ভরা আত্মানের বিপরীতে অপ্রকাশযোগ্য ঘৃণা যেমন পোষণ করে, তেমনি ক্রমাগত মিথ্যা সংবাদে পতি রামের অকল্যাণের আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ওঠে। প্রতিনিয়ত দশানন রাবণের অশোককাননে আগমনে ভীত সীতা মনের অবস্থা ব্যক্ত করেন এরূপে: “তাঁর বিকট হাস্যধ্বনি আর উন্মত্ত বাক্যবাণে আমি ভয়ে অশোক কাননের বৃক্ষদের সঙ্গে মিশে যাই” (জাকারিয়া ২৯২)।

রাবণের ভয়ে ভীত সীতার জীবনে রাক্ষসরাজের উৎপীড়ন থেকেও ভয়ঙ্কর বলে প্রতিপন্ন হয় রাবণ পত্নী মন্দোদরীর অভিশাপ। মন্দোদরী তাঁর সুখী দাম্পত্যে বিঘ্ন সৃষ্টির দায়ে সীতার উদ্দেশ্যে অসুখী হবার অভিসম্পাত বর্ষণ করেন: “যে আগুনে লক্ষা পুড়েছে, আমার সংসার পুড়েছে সে আগুনই তোর একমাত্র নিয়তি” (জাকারিয়া ২৯২)। ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বেঁচে থাকা সুখান্বেষী সীতার বর্তমানকে এই অভিশাপ এমন বিষিয়ে তোলে যে, রামচন্দ্রের লক্ষা আক্রমণের মত আসন্ন মুক্তির সুসংবাদেও সীতা আশাবিত্ত হতে পারেননা: “আমার জীবনে সুখের দেখা মিলবে না। মিলবে না?” (জাকারিয়া ২৯২) গবেষকের ভাষায়: “এই অভিসম্পাত যেন বাঙালির কাঙ্ক্ষিত নিটোল পরিবারের নাড়ি ছেঁড়া ধন” (জাকারিয়া ৩৪)। এক নারীর জন্য স্বামী-সন্তান-রাজ্য হারিয়ে নিঃস্ব হওয়ার আশঙ্কায় মন্দোদরী ক্রোধে-ক্ষোভে সীতার উদ্দেশ্যে এই অভিসম্পাত বর্ষণ করেন। নাটকে মন্দোদরীর অভিশাপ সীতার ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নের মাঝে আশঙ্কার বিষ বীজ বপন করে। কিন্তু এই অকারণ অভিশাপ ফিরিয়ে নেয়ার অনুরোধ বা উদ্যোগে সীতাদেবী সচেষ্ট হন না। এর সম্ভাব্য কারণ- গর্বিতা স্ত্রী ও মাতা পরিচয়ের মন্দোদরীর হতাশা আর আশঙ্কাকে নারী হয়ে সীতা অনুধাবন করেন। কিন্তু ভবিষ্যতের অমঙ্গল আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ওঠেন সীতা। নাট্যকার সংসার জীবনে সুখী হতে চাওয়া সাধারণ এক নারী সীতাকে পাঠকের সামনে আনতে চেয়েছেন- মন্দোদরীর কর্তৃক অভিসম্পাতের প্রসঙ্গের জোরালো উত্থাপন ও সীতার অমঙ্গল ভাবনায় তাঁর সেই প্রচেষ্টারই প্রতিফলন মেলে। কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* মন্দোদরীর অভিশাপ উচ্চারিত হয় রাবণ নিহত হওয়ার পর যখন সীতা রামচন্দ্রের সাথে সাক্ষাতের জন্য বিভীষণের সাথে যাত্রা করেছেন তখন। পথিমধ্যে আলুলিত চুলে সীতাকে মন্দোদরী বলেন:

এ আনন্দ নিরানন্দ হবে অকস্মাত।

বিষদৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ।। (কৃত্তিবাস ২৫৩)।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে মন্দোদরী অভিশাপকে সীতাদেবী শোকসন্তপ্তা স্ত্রীর বিলাপ বলে এড়িয়ে যান। উল্লেখ্য, বাল্মীকি ও চন্দ্রাবতী রামায়ণে মন্দোদরীর অভিশাপ ও সীতার আশঙ্কা প্রসঙ্গ জোরালো ভাবে উত্থাপিত হয়নি।

যুদ্ধে রাবণ নিহত হবার সংবাদ শোনার মুহূর্ত থেকে বিভীষণের অশোককাননে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত সীতা চরিত্রের প্রেম- গর্ব মিশ্রিত যে অপূর্ব ভালোবাসার অনুভূতির প্রকাশ আমরা নাটকে পাই, তা নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত। স্ত্রী পরিচয়ের উর্দে, প্রেমাস্পদের দর্শন লাভের তীব্র বাসনায় অস্থির সীতার এই প্রেমিকারূপের সূক্ষ্ম পরিচয় রামায়ণের বিচিত্র ভাষ্যের কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। নাটকে প্রেমিক স্বামীর দর্শন লাভে অপেক্ষমান সীতা পথের দিকে তাকিয়ে বিজয় মালা গাঁথে অস্থির চিত্তে:

তুলি ফুল নানা জাতি
এ যে তার জয়মালা

নিরিবিলি মালা গাঁথি
সে আসে না যায় বেলা (জাকারিয়া ২৯৬-২৯৭)

পাশাপাশি সীতাদেবীর অন্তরে সূর্যালোকের মত স্পষ্ট বলে প্রতিপন্ন হয়- নিজের প্রেয়সী স্ত্রীকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই স্বামী রামচন্দ্রের এই যুদ্ধায়োজন। তার সাথে যুক্ত হয় স্বামী প্রেমে বিভোর নারী সীতার সতীত্বের গর্ব। এই গর্ব বলে সীতা বিশ্বাস করে, সতী নারীর দিকে লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপের ফলস্বরূপ পাপীষ্ঠ রাবণের ভাগ্যে এমন নৃশংস পরিণতি জুটেছে। রাবণের কামুকতার বিপরীতে নিজের সতীত্বের শক্তিয়ুদ্ধে জয়ী গরবিনী বলেন:

[...] হায় রাবণ! তুমি জানতে না- কোন সতী নারীকে তুমি হরণ করেছিলে! [...] এমন দৃষ্টান্ত কী আর পৃথিবীতে আছে- আর কোন পুরুষ তার অপহৃতা স্ত্রীকে উদ্ধারের জন্য উদ্ধান্তের মতো ছুটে চলেছেন দিকবিদিক [...]
(জাকারিয়া ২৯৫)

বাল্মীকির রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক স্নান, অলঙ্কার এবং উত্তম বেশভূষা সম্পন্ন করে স্ত্রীর তার কাছে যাত্রা করার যে নির্দেশ ছিল তাকে অমান্য করতে চান সীতাদেবী নম্রভাবে। সীতার অগ্নিপরীক্ষা নাটকে সীতাদেবীর প্রেমগর্বের ঘোর প্রথমবার ভাঙে, যখন স্বামীর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান স্ত্রীর সামনে লঙ্কার নতুন রাজা বিভীষণ রামচন্দ্রের বার্তা নিয়ে আসেন। প্রেমাস্পদের কঠোর আচরণে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে স্বামী দর্শন লাভে উনুখ স্ত্রী রামচন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন: “[...] আমার পক্ষে স্নান-আভরণে সময় ক্ষেপন করা সম্ভব নয় বিভীষণ। তাই আমি যেভাবে আছি সেভাবেই তাঁর সান্নিধ্যে যেতে বাধ্য করি।” (জাকারিয়া ২৯৭) নাটকে সীতাদেবীর ঘোর দ্বিতীয় বার ভাঙে, যখন শোনে প্রিয়জনের পাশে বিরহজনিত ক্লান্ত শ্রান্ত নারী মূর্তি অশোভনীয় তাই রামচন্দ্রের নির্দেশমত স্নানশুদ্ধা হয়ে দিব্যাভরণে ভূষিত হয়ে তাঁকে যেতে হবে। যখন যুদ্ধক্লান্ত রামচন্দ্রের সাথে মুহূর্তকালের বিচ্ছেদ অনন্তকাল বলে বোধ হচ্ছিল স্ত্রীর কাছে, তখন স্বয়ং স্বামী কর্তৃক রাণীবেশে সজ্জিত হওয়ার নির্দেশে দ্বিধাবিহীন সীতাদেবী। পতিভক্ত সীতাদেবী স্বামীর আদেশ পালন করেন হৃদয়ের রক্তক্ষরণ গোপন করে মলিন মুখে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে স্নানশুদ্ধা হয়ে বেশভূষা ধারণ করে রামচন্দ্রের সমীপে যাত্রার কোনো নির্দেশ ভাবী রাজার কাছ থেকে আসেনি। বরং এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করেন সদ্য সিংহাসনে বসা লঙ্কারাজ বিভীষণ। নাটকে যাত্রাপথে শ্রুতি গোচরে আসা সাধারণ জনগণের সতী নারী সীতার দর্শনাকাজক্ষা আর সীতা-রামচন্দ্রের প্রেমের উচ্ছ্বসিত বিবরণ পূর্ব বিষাদের রেশ কাটিয়ে দেয় সীতাদেবীর। রামচন্দ্রের ভালোবাসার উপর সন্দেহ পোষণ অমূলক- একথা নিজেই নিজেকে স্মরণ করিয়ে সান্তনা পেতে চান সীতা। আশ্রয়শিবিরের দ্বারে পৌঁছানোর পর বিভীষণ বেদ্রাঘাতে ভীড় সরিয়ে পথসৃষ্টিতে তৎপর হলে রামচন্দ্রের সংলাপ ও সীতাদেবীর অপমানবোধে প্রজানুরঞ্জক রামচন্দ্র আর সীতার প্রকৃত অবস্থান ক্রমেই স্পষ্ট হয়:

[...] এদেরকে বেদ্রাঘাত করলে তার আঘাত আমার মন-শরীরে এসে লাগে বিভীষণ, কেননা এরা আমারই স্বজন। এরা আমারই স্বজন! আমার থেকেও বেশি আপন! আমাকে কাছে পেয়েও আমার প্রতি কোনো অগ্রহ না প্রকাশ করে রামচন্দ্র এমন কথা বলতে পারলেন (জাকারিয়া ৩০০)।

বাল্মীকী রামায়ণে আশ্রয়শিবিরে সীতা উপস্থিত হলে প্রিয়া দর্শনের আনন্দ আর সম্মুখস্থ বিপদ একই সাথে অনুভব করেও দ্রুত সীতা দর্শন লাভের ইচ্ছা বিভীষণের কাছে পোষণ করেন রামচন্দ্র। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও তাই দৃষ্ট হয়। কিন্তু নাটকের রামচন্দ্রের মাঝে সীতা দর্শনকাজক্ষা নেই, আছে রাজপুরুষ সুলভ কঠোরতা। রামচন্দ্রের কঠিন আচরণে স্তব্ধ সীতাদেবীর মানসপটে পরমুহূর্তেই রামচন্দ্রের সমুদ্রবন্দন, তাঁর জন্য করা যুদ্ধের দৃশ্য ভেসে ওঠে, আবারও প্রেম-কৃতজ্ঞতায় নত হন স্বামীর প্রতি তিনি। সীতা পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়া রামচন্দ্রের পরের কথা সীতাকে উপলক্ষ্য করেই বলা: “[...] গৃহ, বস্ত্র, প্রাচীর, সৎকার্য এবং অন্য সকল রাজকৃত সম্মান স্ত্রীলোকদের আবরণ নয়, কেবল সৎস্বভাবই স্ত্রীলোকের আবরণ।” (জাকারিয়া ৩০০-৩০১) এবার সম্পূর্ণ ঘোর কাটে সদ্য বন্দী দশা থেকে মুক্ত রাজনারীর। রামচন্দ্রের সাক্ষাতে জীবনের সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটবে এই আশা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরতে থাকা সীতাদেবী ক্রমে অগ্রসর হতে থাকেন রামচন্দ্রের দিকে। মুখদর্শনে রামচন্দ্রের হৃদয়ের ভাব বোঝা হয়ে যায় সীতাদেবীর। স্বয়ম্বর সভা কিংবা বনবাস পর্বে যাঁর সাথী সীতা সকল ঐশ্বর্য্যকে সজ্ঞানে ত্যাগ করে খুশী মনে হয়েছিলেন এই রামচন্দ্র সেই রামচন্দ্র নন। এই রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জক ভাবী রাজা। বাল্মীকি রামায়ণে সীতাদেবীকে দেখে রামচন্দ্র মুহূর্তকালের জন্য জনগনের কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন, অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিলো চোখ। কিন্তু নাটকের রামচন্দ্র সীতাকে দেখে রাজসুলভ ক্রোধে বলে উঠেন:

- সীতা, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর হাত হতে তোমায় উদ্ধার করেছি, পৌরুষ বলে একজন পুরুষের যা করতে হয় তা-ই করেছি। [...] আমি অপমান ও শত্রু দুই-ই যুগপৎ সমূলে উৎপাটন করেছি। [...] তুমি জেনে রাখো, আমি ক্রোধবশত বন্ধুগণের সাথে এই যে সমর-পরিশ্রম করেছি তা তোমার জন্য নয় (জাকারিয়া ৩০৩)।

বাল্মীকি কিংবা কৃত্তিবাসের রামায়ণের ঘটনার অনুসরণেই রামচন্দ্রের মুখে সীতা শুনে যান তিনি ভিন্ন এ যুদ্ধের অনেক কারণের কথা। সীতা হরণে এই যুদ্ধ সংঘটিত হলেও সীতা সম্পত্তি সুলভ, তা অন্যের দ্বারা অধিকৃত হলে পৌরুষের মান থাকে না। অন্যের হাত থেকে অধিকৃত সম্পত্তি উদ্ধারে সম্মান পুনরুদ্ধার হয় কিন্তু সম্পত্তি পুনঃগ্রহণে গ্রহিতার মান ভুলুপ্তিও হতে পারে, বিশেষত অপরাধী যখন কামুক রাবণ এবং সম্পত্তি অসামান্য সীতা। গবেষক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন:

[...] সবচেয়ে বড়ো দুঃখের মুহূর্তটি তখনই এসে উপস্থিত হলো যখন জয় হয়েছে রামের, নির্বংশ হয়েছে শত্রু রাক্ষস-রাজ রাবণ। রাম বললেন, সীতাকে তিনি গ্রহণ করবেন না। দশ মাস ধরে সীতার একটানা নরকবাস চলছিল লঙ্কার স্বর্ণপুরীতে, যে স্বর্গের আশায় তিনি ছিলেন, সেটি যখন হাতের কাছে সমাগত, তখন দেখেন দ্বার যাচ্ছে বন্ধ হয়ে, চোখের সামনে (চৌধুরী ৩১)।

বাল্মীকি-কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসরণেই উন্মুক্ত জনপ্রান্তরে রামচন্দ্র সীতাদেবীকে মুক্ত করে দেন। এমনকি ভরত-শত্রুঘ্ন-বিভীষণের মাঝে যে কাউকে সীতা সঙ্গী নির্বাচন করে নিতে পারেন এমন অপমানসূচক বাক্যও উচ্চারিত হয় তাঁর মুখে। স্বামীর ত্যাগের সিদ্ধান্তে ভেঙে পড়লেও অন্য পুরুষ গ্রহণের মত ঘৃণ্য পথ তাঁর জন্য উন্মুক্ত করায় ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেন সীতা রামচন্দ্রের প্রতি: “তুমি কি সত্যি সত্যি আমাকে নটীর মতো অন্যের নিকট দান করতে

ইচ্ছা করছে?” (জাকারিয়া ৩০৬) সীতার এই ক্রোধান্বিত বাক্য প্রয়োগ কৃত্তিবাসী রামায়ণেও প্রায় অনুরূপ ভাবেই উল্লেখিত :

বেশ্যা নটী নহি আমি, পরে কর দান।
সভা-বিদ্যমানে কর এত অপমান।। (কৃত্তিবাস ৪৭৪)।

বাল্মীকি রামায়ণে উল্লেখ আছে:

উচ্চকুলজাতা আর উচ্চকুলে পরিণীতা মোরে
হে রাজেন্দ্র, নটী সম দিতে তুমি চাহিছ অপরে।। (বাল্মীকি ৬৯৭)।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা নাটকে পরবর্তীকালে সীতা বনবাসকালে রামপ্রেম বশেই রাজসুখ ছেড়ে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন বলে ভাবী রাজা রামচন্দ্রের মন ফেরানোর বৃথা চেষ্টা করেন। অতঃপর বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতই নাট্যকার সীতার মুখ দিয়ে রামের মনোবাঞ্ছার প্রকাশ ঘটান- সীতাদেবী চিতা প্রস্তুতের নির্দেশ দেন। জ্বলন্ত চিতা সম্মুখে লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে সীতার যে দীর্ঘকথন তার দ্বারাই নাটকের মূলবার্তা তথা সীতা চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করেন নাট্যকার। প্রসঙ্গত নাটকের সীতা এই জন্মে অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁর বিগত জন্মসমূহের অগ্নিদহনের কথা উল্লেখ করেন। এই জন্মের অগ্নিপরীক্ষাসমূহ সাইমন জাকারিয়া রচিত সীতার অগ্নিপরীক্ষা নাটকের চরিত্র সীতার ব্যাখ্যায় নিম্নরূপ:

সীতা বিবাহ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে চিন্তিত জনক রাজ ঘোষণা করেন- সীতাকে জয় করতে হবে বীরত্ব প্রকাশক পণ দ্বারা। অসংখ্য রাজপুরুষের পদধ্বনিতে মুখর মিথিলায় স্বয়ম্বর সভার চাকচিক্য- সাফল্য- বিফলতার বিপরীতে নাট্যকার তুলে ধরেছেন সীতা নান্দী এক সাধারণ নারীর মনের গহীনে জন্ম নেয়া শঙ্কা : “[...] না জানি কে আমায় জয় করে নেন, সে জন উত্তম হতে পারেন আবার অধমও হতে পারেন।” (জাকারিয়া ৩০৯) স্বয়ম্বর নামে নারীর স্বামী নির্বাচনের মত স্বাধীনতার বিষয়টিও প্রকৃত অর্থে পুরুষ শাসিত সমাজ সৃষ্ট এক অগ্নিপরীক্ষা নারীর জন্য। কারণ এক্ষেত্রে পরমা সুন্দরী ও কুলশ্রেষ্ঠা নারীকে পুরুষ জয় করে বীরত্বের শ্রেষ্ঠত্বে বিজয়ী হয়ে। সেই নির্বাচন প্রক্রিয়া আবার নির্ধারিত হয় নারীর অভিভাবক শ্রেণির কোনো পুরুষ দ্বারা। সমাজের নির্দেশ মত নারী বাধ্য বিজয়ী বীর যেই হোক তাকে স্বামীত্বে বরণ করতে। নারী পুরুষ হৃদয় যাচাই করে স্বামী নির্বাচনের অধিকার পায় না। নাটকে সীতা শুধু বীর স্বামী অভিলাসী ছিলেন না বরং মানবিক গুণসম্পন্ন এক মানব স্বামী হিসেবে অধিক কাম্য ছিল তাঁর কাছে- তাই স্বয়ম্বরও অগ্নিপরীক্ষা তুল্যই ছিল তাঁর কাছে। অবশ্য নাটকে শ্রীরামচন্দ্র হরধনুতে জ্যা স্থাপন করে সীতালাভের শর্ত পূরণের সাথে জয় করেছিলেন সীতাহৃদয়ও। বাল্মীকির রামায়ণে স্বয়ম্বর সভায় সীতা- হৃদয়ের বর্ণনা নেই, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের সীতার হৃদয় সমর্পণের বর্ণনার সাথে ভাবগত ভাবে মিলে যায় এই নাটকের সীতাভাষ্য। কিন্তু নাটকের সীতার মনে সেই অজানা বীরের মানবিকতা নিয়ে জেগে ওঠা প্রশ্ন - সীতা চরিত্র বিনির্মাণে নাট্যকারের নিজস্ব ভাবনাজাত। বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্র-সীতার বিবাহ দেবতাদের আশীর্বাদপ্রাপ্তিসহ নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয় কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে এ পথ এতটা মসৃণ নয়। স্বয়ম্বর সভার পর সীতা গ্রহণে অমত রামচন্দ্র বলেন:

এ চারি ভ্রাতাকে যেই কন্যা দিবে চারি।
চারি ভাই বিবাহ করিব ঘরে তারি।। (কৃত্তিবাস ১০০)।

অপরদিকে সীতার অগ্নিপরীক্ষা নাটকে বিবাহপূর্ব মুহূর্তে রামচন্দ্র বলেন- যদিও সীতাকে স্ত্রী হিসেবে লাভের অধিকার তাঁর আছে, তারপরও পিতা দশরথের সম্মতি ও উপস্থিতি বিনা সীতা গ্রহণে তিনি অসমর্থ। যে রামচন্দ্রের সৌম্যমূর্তি ও বীরত্ব দেখে হরধনুতে জ্যা স্থাপন মুহূর্তেই হৃদয় সমর্পণ করেছিলেন সীতা, সেই রামচন্দ্রের কাছে সীতা প্রতিপন্ন হয় বীরত্বের বিনিময়ে অর্জিত সম্পত্তি মাত্র, যা বর্জনযোগ্যও। নাট্যকার এখানে খুব সংক্ষেপে সীতার মনোবেদনা ব্যক্ত করেছেন: “...আমি নিজেকে খুবই অসহায় বোধ করলাম।” (জাকারিয়া ৩১০) এ অসহায়ত্বে প্রার্থিতের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হবার ভয় বর্তমান। তেমনি সীতাকে গ্রাস করে স্বয়ম্বর সভায় বর নির্ধারিত হয়ে যাবার পরও পত্নীত্বে গ্রহণের অনিশ্চয়তা তথা লোকলজ্জা। নাটকে এই পর্যায়ে রামচন্দ্রের সীতা গ্রহণে পিতার মত বাধা হয়ে দাঁড়ায়। লক্ষা বিজয়ের পর রামচন্দ্রের সীতা গ্রহণে লোকভয় বাধা হয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই নির্দোষ সীতাই একমাত্র পরিণামভোগ্য।

নবপরিণীতা সীতা সংসার জীবনের নতুন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন- এ পরীক্ষায় পিতা- মাতা- ভ্রাতা- ভগিনীর সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয় নতুন এক পুরুষকে কেন্দ্র করে। বাল্মীকি কিংবা কৃত্তিবাসী রামায়ণে সীতার দেবীসুলভ গুণ দ্বারা শ্বশুরকূল এবং রামচন্দ্রের মন জয়ের বর্ণনা আছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে আদর্শ বিবাহিত নারীর অবশ্য কর্তব্যের একটি শ্বশুরকূলের মন জয়। কিন্তু নাটকের সীতা জানান দেয়- সমাজ যা সহজ জেনে চাপিয়ে দিয়েছে নারীর উপর, তা প্রকৃতপক্ষে অগ্নিপরীক্ষা সম। বাল্মীকি কিংবা কৃত্তিবাসী রামায়ণে একনিষ্ঠ রামপ্রেমের কারণেই নিকট ভবিষ্যতে অভিষিক্ত হতে যাওয়া রামানুজ ভরতের বশবর্তী হওয়ার আপাত সুখকে সীতা জ্ঞান করেছেন অপমান হিসেবে। উর্মিলা কিংবা অন্যবধূদের ন্যায় রাজসুখ ভোগকে অবজ্ঞা করেছেন হেলায়। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর রামায়ণী কথা গ্রন্থে বলেছেন: “পরন্তু তিনি স্বীয় যৌবনকল্পনার মাধুরী দিয়া বনবাসকে এক সুরম্যচিত্রে আঁকিয়া ফেলিলেন, রাজত্বের সুখ অতি তুচ্ছ মনে করিলেন।” (সেন ১২১) বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত আলোচ্য নাটকেও অশোককাননে অবরুদ্ধ সীতাকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে দিতে হয়েছে অগ্নিপরীক্ষা। প্রায় প্রতিদিন রাবণের পদধর্ষনিত মুখর হয়ে উঠত অশোক কানন, আর সীতা ভয়ে সংকুচিত হয়ে বৃক্ষের সাথে মিশে যেন অদৃশ্য হয়ে যেতে চাইতেন। কখনো লক্ষার পাটরাণী হবার লোভ-মায়ায় ভোলানোর চেষ্টা আবার কখনো ক্রোধান্বিত হয়ে লুটে নিতে চাইতেন সীতাকে রাবণ। শেষ চেষ্টায় রামের মায়া ছিন্ন মস্তক দেখিয়েও সীতাকে বশ করার প্রচেষ্টা চালায় রাবণ। নাটকে পুরাণের মত অবজ্ঞাভরে বা দৃঢ় চিন্তে নয় বরং সর্বদা ভীত হয়ে অগ্নিপরীক্ষাসম সেই পরীক্ষায় রাবণের দেখানো লোভ-ভয়-ক্রোধকে অতিক্রম করে পবিত্র রেখেছেন নিজেকে সীতা। সমাজের দেয়া সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসে সুখ অতি নিকটবর্তী জেনে সীতা যখন প্রিয়জন সম্মুখে দাঁড়ান, তখন রামচন্দ্র প্রশ্ন তোলেন সতীত্ব নিয়ে। লোকভয় থেকে জন্ম নেয়া রামচন্দ্রের অবিশ্বাসের প্রশ্নে এই সীতা কৃত্তিবাস বা বাল্মীকির সীতার মত বেদনায় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেন না। এমনকি আবেগে বাষ্পরুদ্ধও হয় না সীতাদেবীর কণ্ঠ বরং ভেতর থেকে জন্ম নেয়া এক মানবীয় ক্রোধে রুখে দাঁড়ায় এক নারী। নাটকে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে পুরাণের সর্বসহ সাধ্বী শান্ত নারী সীতা। নিজ জীবনের একের পর অগ্নিপরীক্ষার কারণে যে সমাজ- সংসার আর প্রিয়জন তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে সীতা বলে:

আমি তো জানতাম হে প্রভু রামচন্দ্র সংসারের এমনই অগ্নিপরীক্ষায় সিদ্ধ হতে পারলেই নারী জীবনের প্রকৃত সাফল্য আসে, সিদ্ধি আসে। [...] কিন্তু আজ আমাকে আপনি এ কী পুরস্কার দিচ্ছেন ওই ভয়াল অগ্নি জ্বেলে! [...] যদি তাই হয় তবে তো জীবনভর আমি বহু রঙের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হয়ে এমনই সহনশীল এবং অক্ষয়- অদহিত শক্তি অর্জন করেছি যে, ওই অগ্নি আর আমার কী দহন করবে! (জাকারিয়া ৩১১)।

গবেষণা ফল

রামায়ণের সীতা চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সীতা আত্মপ্রেমী নন, দেবীসুলভ গুণের অধিকারী। কিন্তু পুরাণের সীতাকে নাটকে সাইমন জাকারিয়া এমন এক সাধারণ মানবীর আদলে তুলে ধরেছেন যিনি পতিব্রতা কিন্তু সুখাণ্বেষী, জীবনের কঠিন দুঃখের সমুদ্র পাড়ি দিতে সামনের সুখের আশাকেই আশ্বাস তরণী রূপে বেছে নেন। কিন্তু জীবনের দেয়া আঘাত বিনা প্রশ্নে সয়ে এসে, প্রিয়জনের করা চূড়ান্ত অসম্মানেরমুখে পাহাড়সম ধৈর্যের বাধ তাঁর ভেঙে যায়। নাটকের সীতার ধারণা হয়ে যায় সমাজের কাজ নারীর জন্য কারণে অকারণে অগ্নিপরীক্ষার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাদের পুরুষ তথা সমাজের অধীন করে রাখা। তাই সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী রামচন্দ্রের ইচ্ছাকৃত অবিশ্বাসের মুখে সীতা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, এমনকি নিজেকে অগ্নি কিংবা যে কোনো পরীক্ষায় অপরাজিতা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। অবশ্য তাকে অদহিতা হিসেবে গড়ার কারিগরও সমাজ তথা পুরুষ বলতে ভুলেন না সীতা। পুরুষ প্রয়োজনে প্রেমের বাহুডোরে নারীকে বেঁধেছে আবার অপ্রয়োজনে বা অধিক প্রয়োজনে তাকে অস্ত্র করে বা পরিত্যাগের মাধ্যমে মহান সাজতে চেয়েছে। এককথায় নারীর প্রকৃতিকেই তাঁর সর্বনাশের কারণ হিসেবে বিবেচনা করে সমাজের নামে পুরুষ মহান হিসেবে নিজেকে তকমা দিয়েছে। সাইমন জাকারিয়া বিনির্মিত সীতা চরিত্রকে স্বামী, স্বজন তথা সমাজের প্রতি বিশ্বস্ততায় নিজেকে সঁপে দিতে সদা প্রস্তুত নারী হিসেবে নাটকের প্রথমার্ধে তুলে ধরেন। দ্বিতীয়ার্ধে সেই একই সীতা তাঁর দিকে অবিশ্বস্ততার তর্জনী প্রদর্শন করা সমাজকে দেখিয়ে দেন, অপরাধী হিসেবে সমাজ নিজের দিকেই অন্য সব অঙ্গুলী তাক করে আছে। সব বুঝেও এই সীতা সমাজের নির্দেশ না মেনে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন না সত্য কিন্তু নারীর জন্য তৈরী সকল অগ্নিপরীক্ষাই যে পূর্বপরিকল্পিত তথা সমাজ কর্তৃক নারীকে শৃঙ্খলিত করার অস্ত্র মাত্র তা স্পষ্ট জানান দিয়ে যান।

উপসংহার

প্রখ্যাত গবেষক শ্রীমতি গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক্ বিনির্মাণ (গবেষকের ভাষায় অবিনির্মাণ) প্রসঙ্গে বলেছেন: “[...] ব্যবর্তনকে বেসামাল করা; [...] ইতিবাচক অবিনির্মাণ, গ্রন্থের আপন গ্রন্থি দিয়ে সূত্রাবলিকে আবার বুনে কার্যকরী করা, বিবেচক ঘনিষ্ঠতায়।” (হোসেন ও আলম ২৬) নাট্যকারের অভীষ্টও তাই, একারণেই বিশ্বস্তভাবে বাল্মীকি, কৃত্তিবাস ও চন্দ্রাবতীর রামায়ণের ঘটনানুসরণে তিনি নাটকের সীতা চরিত্রকে পুরাণের ন্যায় পতিব্রতা, সতী এক নারী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। আবার একই সাথে এই সীতার মাঝে পাওয়া যায় সুখসন্ধানী অতি সাধারণ এক মানবীর লক্ষণ। সুখাণ্বেষী এই মানবী প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির অসামঞ্জস্যতায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বিনির্মিত এই সীতা চরিত্র শেষ পর্যন্ত পুরাণের আবহের মধ্যে অবস্থান করে কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সামনে নত হয় না। বরং সমাজের সৃষ্ট নারী দমন-পীড়নের কৃত্রিম অস্ত্র ও নারী ওপর তার উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রয়োগের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তীব্র কটাক্ষে সমাজের ভিত নাড়িয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র

কৃত্তিবাস। রামায়ণ। দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০।

চন্দ্রাবতী। রামায়ণ। মাওলা ব্রাদার্স, ২০১২।

চৌধুরী, কবীর। সাহিত্যকোষ। মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম। ধ্রুপদী নায়িকাদের কয়েকজন। বিদ্যাপ্রকাশ, ২০১২।

জাকারিয়া, সাইমন। নাটকসংগ্রহ। অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১০।

জাকারিয়া, সাইমন। *মহাকবির সমস্যা*। অন্যধারা, ২০২০।

বাল্লীকি। *রামায়ণ*। নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৯।

ভট্টাচার্য, তপোধীর। *জাক দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ*। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩।

সেন, আশালতা। *বাল্লীকি-রামায়ণ*। ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৭।

সেন, দীনেশচন্দ্র। *রামায়ণী কথা*। পলাশ প্রকাশনী, ২০০৬।

পারভেজ হোসেন ও ফয়েজ আলম (সম্পা.)। *জাক দেরিদা পাঠ ও বিবেচনা*। সংবেদ, ২০২০।

পরিবেশ নীতিবিদ্যার উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও গুরুত্ব : একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

নাসরিন আক্তার *

প্রতিপাদ্যসার: দর্শনের একটি অন্যতম শাখা হিসেবে নীতিবিদ্যা কেবল মানুষের আচরণসম্পর্কীয় আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে এর নানা শাখা-প্রশাখা বিকাশ লাভ করেছে। এরই একটি নতুন সংযোজন হল পরিবেশ নীতিবিদ্যা। যে পরিবেশের উপর নির্ভর করে মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে সে পরিবেশ আজ মানুষের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের ফলে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। এ থেকে পরিদ্রাণের জন্য বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি দার্শনিকগণও সচেতন হচ্ছেন। এ সচেতনতায় যে দার্শনিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি তা থেকেই মূলত পরিবেশ দর্শন বা পরিবেশ নীতিবিদ্যার জন্ম। পরিবেশ সংকট মোকাবেলা করে নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ নীতিবিদ্যার গুরুত্ব রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে বর্তমান নিবন্ধে আমরা পরিবেশ নীতিবিদ্যার উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনায় নীতিবিদ্যার গুরুত্ব আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

পরিবেশ ও মানবজীবন এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা প্রাচীনকাল থেকেই। ধারণা করা হয় মানুষ ও পরিবেশের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়া প্রথম পরিলক্ষিত হয় ৭০০০০০ বছর আগে যখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা আগুনের ব্যবহার শুরু করে। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীর সব প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন গ্রন্থ (সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ) বিজ্ঞান, দর্শন, চিত্রকলা ইত্যাদি চিন্তাভাবনায় পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়গুলো আলোচিত ছিল। প্রাচীন বেদ, উপনিষদ, কোরআন, বাইবেলের মত ধর্মগ্রন্থ, বিভিন্ন সাহিত্যিক যেমন- রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস, হোমার, কনফুসিয়াসের বাণীতে, এরিস্টটলের রস্ট্রচিন্তায়, লিওনার্দো-দ্য-ভিন্সি এর বিজ্ঞান চেতনায়, আল-বেরুণীর পর্যালোচনায় পরিবেশ ও মানুষের কথা, পরিবেশের প্রতি মানুষের দায়িত্বের কথা বারবার উঠে এসেছে। তবে পরিবেশ ও মানুষের বিস্তার ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে মানুষ পরিবেশ নিয়ে নতুন করে ভাবছে, যা আগে ভাবা হয়নি। বর্তমানে পরিবেশের সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে বিধায় তা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মানুষ বেঁচে আছে পরিবেশের কোলে নিজেকে সমর্পণ করে। পরিবেশ মানুষের মৌলিক উপাদান ও চাহিদা নির্ধারণসহ সব ধরনের চাহিদা পূরণ করে। আমাদের মূল জীবনরক্ষাকারী উপাদান আমরা পরিবেশ থেকে পেয়ে থাকি। যেমন: শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ু (অক্সিজেন), পান করার জন্য পানি, খাদ্য, ঔষধ, বস্ত্র, বাসস্থান, ভূমি ইত্যাদি। সৃষ্টির উন্মালগ্ন থেকে এ পরিবেশে মানুষসহ অন্যান্য জীবমণ্ডল নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে বেঁচে আছে। তবে কারো কারো মতে মানুষই হচ্ছে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব। তার বুদ্ধিবৃত্তি অন্যান্য প্রাণীদের থেকে উচ্চতর বলে মনে করা হয়। মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কর্মকাণ্ডের ফলস্বরূপ পৃথিবীর চেহারাও বদলাতে থাকে। প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক বাস্তববিদ্যার নিয়মে পরিচালিত হতো। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিভিত্তিক ক্ষমতার উৎকর্ষতার কারণে ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজের ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করে। যার কারণে মানুষ পরিবেশের অন্যান্য উপাদান থেকে আলাদা হয়ে যায়। মানুষ পরিবেশের একটি প্রভাবশালী প্রাকৃতিক উপাদান হয়ে উঠে। সে তার নিজের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক পরিবেশকে পরিবর্তন করে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

থাকে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে এটাই বলা যায় যে, মানবসভ্যতার ইতিহাস মূলত মানুষের দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারের ইতিহাস। তাই একথা বলাটা অতুক্তি হবে না যে, আদিকাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির সাথে সুবিবেচনাপ্রসূত আচরণ করেনি। প্রকৃতিকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেছে। যার ফলে প্রকৃতিতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা হলো পরিবেশগত সমস্যা। কয়েক দশক পূর্বেও পরিবেশকেন্দ্রিক ধারণাটি ছিল মূলত পরিবেশবিজ্ঞানীদের কৌতুহল এবং গবেষণার বিষয়। কিন্তু আজ আর বিষয়টি শুধু পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটা এখন সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। বিংশ শতকের ষাটের দশকের গোড়াতে যখন পরিবেশ সমস্যা তেমন একটা পরিচিত বিষয় হয়ে ওঠেনি সেই সময় প্রজাতির বিলুপ্তির রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে লেখা জীববিজ্ঞানী র‍্যাচেল কারসন এর ‘Silent Spring’ নামক যুগান্তকারী গ্রন্থটি আমেরিকা তথা গোটা বিশ্বে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কারসন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলার চেষ্টা করেছিলেন যে, বিভিন্ন কীটনাশক ও আগাছানাশকের বিশেষত DDT এর যথেষ্ট ব্যবহার পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে (Carson 54)। তিনি বিশেষ করে ঈগল পাখী বিলুপ্ত হওয়ার পেছনে DDT এর ব্যবহারকেই দায়ী করেছিলেন।

বর্তমান পৃথিবী পরিবেশগত সংকটে জর্জরিত। যে পরিবেশের উপর নির্ভর করে মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে সে পরিবেশ আজ বিপর্যস্ত। মানুষের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশের ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পরিবেশ ক্রমশ অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি, ওজোন স্তরের হ্রাস, জলবায়ুর পরিবর্তন, জীবমণ্ডলের পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তি, বনাঞ্চল হ্রাস, মাটি ক্ষয়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিবেশগত সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে এবং ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে ও এ পৃথিবী বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি দার্শনিকগণও সচেতন হচ্ছেন। এ সচেতনতায় যে দার্শনিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি তা থেকেই মূলত পরিবেশ দর্শন বা পরিবেশ নীতিবিদ্যার জন্ম।

১. পরিবেশ নীতিবিদ্যার স্বরূপ:

পরিবেশ নীতিবিদ্যার স্বরূপ জানার জন্য প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে পরিবেশ কি, নীতিবিদ্যা বলতে কি বোঝায়। অতঃপর পরিবেশ নীতিবিদ্যা কি তা ব্যাখ্যা করা হবে।

পরিবেশ বলতে মানুষ, অন্যান্য জীবন্ত প্রাণী, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ এবং অন্যান্য বিশেষ বিষয়ের সমষ্টিগত অবস্থাকে বুঝায়, যেখানে জীবন্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদের জীবন-চক্র পরিচালনার জন্য পানি, খাদ্য, সূর্যের আলো সবকিছুই বিদ্যমান। পরিবেশের মধ্যে জীবনধারণকারী এবং জীবন পরিচালনাকারী অন্যান্য সকল শর্তাবলি যেমন-বসবাসের স্থান, পরিবহন ব্যবস্থা, আলো, তাপমাত্রা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

অন্যভাবে বলা যায়, জীব ও জড় পদার্থ নিয়ে পরিবেশ গঠিত। এটি জীবন্ত প্রজাতির টিকে থাকার জন্য এবং তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

আরও বিভিন্নভাবে পরিবেশকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যেমন:-

১. মানুষ এবং তার চারপাশের সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক, জৈবিক, ভৌত এবং রাসায়নিক বিষয়াবলির সমষ্টিকে পরিবেশ বলে।

২. কোনো জীবের চারপাশের অবস্থানকারী জীবিত ও জড় উপাদানগুলো এবং এদের মিলিত সব রকমের প্রভাব ও ঘটনা প্রবাহের সামগ্রিক অবস্থাকে পরিবেশ বলে।
৩. পরিবেশ হচ্ছে শারীরিক, মানসিক ও জীব-জৈব উপাদানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ও গবেষণার ফলাফল অধ্যয়ন।

পরিবেশ নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করার পূর্বে নীতিবিদ্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক। নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। আচরণের ভাল-মন্দ, উচিত-অনৌচিত্য এগুলো নীতিবিদ্যার বিচার্য বিষয়। মানুষের ক্রিয়া সমষ্টিকে আচরণ বলে। তবে নীতিবিদ্যায় মানুষের আচরণ বলতে ঐচ্ছিক ক্রিয়া ও অভ্যাসজাত ক্রিয়াকে বুঝায়। সুতরাং দর্শনের যে শাখা মানুষের আচরণ বা ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় নৈতিক মূল্য বিচার করে যে বিজ্ঞান তাই নীতিবিদ্যা। নীতিবিদ্যাকে Moral Philosophy বা নীতি দর্শনও বলা হয়। ম্যাকেনজী নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, আচরণের ন্যায় বা ভালো নিয়ে যে আলোচনা, তাকে নীতিবিদ্যা বলা যায়। এ বিদ্যা আচরণ-সম্পর্কীয় সাধারণ মতবাদ এবং এ বিদ্যা ন্যায় বা অন্যায় ও ভাল বা মন্দ প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ক্রিয়াবলীর আলোচনা করে। নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উইলিয়াম লিলি বলেন, নীতিবিদ্যা হচ্ছে সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্পর্কিত আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞান মানুষের আচরণকে উচিত কি অনুচিত, ভালো কি মন্দ বা অনুরূপভাবে বিচার করে। সমকালীন দার্শনিকদের পদ্ধতিগত পদ প্রয়োগ করে নীতিবিদ্যার সংজ্ঞার নতুন সূত্রায়ন এভাবে করা হয়- নীতিবিদ্যা আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত দর্শনে নীতিবিদ্যা বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা প্রধানত মানুষকেন্দ্রিক। কেননা, সেখানে কেবল মানুষের প্রতি মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত তাই নীতিবিদ্যার আলোচ্যবিষয় ছিল। অর্থাৎ সেসময় নীতিবিদ্যার সাথে মানুষের স্বার্থ আবশ্যিকভাবে জড়িত ছিল। তবে এ নীতিবিদ্যা অ-মানব প্রাণী ও প্রাকৃতিক সত্তার মূল্যকে একেবারেই অস্বীকার করে না। বরং তারা মনে করে যে এগুলোর মূল্য অবশ্যই আছে এবং তা কেবল মানুষের মূল্যের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ মানুষ তার প্রয়োজনে অ-মানব প্রাণী ও প্রাকৃতিক সত্তাকে ব্যবহার করবে। যদিও ধারণা করা হয় যে সনাতনী নীতিবিদ্যায় মানুষকে নির্বিশেষে প্রকৃতি ধ্বংস করতে উৎসাহ দিয়ে মানুষ-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে একদল মানবকেন্দ্রিক পরিবেশ দার্শনিকদের মধ্যে এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের দার্শনিকরা মনে করেন যে, মানুষের প্রয়োজনেই পরিবেশকে ধ্বংস করলে, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ করলে বাস্তবাত্মক ভারসাম্য নষ্ট হবে যা প্রকারান্তরে মানুষেরই ক্ষতি হবে। তাই এই ধরনের নীতিবিদ্যার সমর্থকগণ প্রকৃতি ধ্বংস নয় বরং মানুষের কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণের কথা বলছেন।

এটা সত্য যে মানুষের আচরণ শুধু সমাজে বসবাসকারী অন্যান্য মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সে যে পরিবেশে বসবাস করে সে পরিবেশের নানা উপকরণের সাথেও তাকে নানা রকম আচরণ করতে হয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষের কল্যাণে নৈতিক নীতিমালা তৈরিই হল নীতিবিদ্যার লক্ষ্য। বস্তুত মানুষের জীবনে পরিবেশের এসকল উপকরণের মূল্য অপরিসীম। এ মূল্য নিরূপণের জন্যেই সাম্প্রতিককালে সৃষ্টি হয়েছে পরিবেশ নীতিবিদ্যা। পরিবেশের প্রতি মানুষের আচরণের মূল্যায়নই এ নীতিবিদ্যার বৈশিষ্ট্য।

২. পরিবেশ নীতিবিদ্যা কী?

পরিবেশ নীতিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ‘Environmental Ethics’। এটি মূলত প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার একটি নতুন সংযোজন। মানুষ যেখানে বসবাস করে তার চারপাশে বিরাজমান মানব, প্রাণীজগত, গাছপালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, বায়ুমণ্ডল, বাস্তুতন্ত্র এগুলো নিয়েই পরিবেশ গঠিত। পরিবেশ নীতিবিদ্যায় প্রকৃতিতে বিদ্যমান মানুষ,

পরিবেশ ও অমানব বিষয়গুলোর মধ্যে নৈতিক সম্পর্ক, মূল্য ও নৈতিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করে। এ শাস্ত্র নীতিবিদ্যার গতানুগতিক মানবভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি অ-মানব সত্তা নিয়েও অধ্যয়ন করে। পরিবেশ নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা মূলত মানুষ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যকার যে একটি নৈতিক সম্পর্ক রয়েছে তার উপরই নির্ভর করে। এটি মূলত পরিবেশ সুরক্ষার জন্য যে নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলো রয়েছে তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মানুষ পরিবেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর পরিবেশ নীতিবিদ্যা পরিবেশের প্রতি মানুষের যে নীতিবোধ এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলো রয়েছে তা চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। এটি এমন সত্যকে তুলে ধরে যে, পৃথিবীর সকল ধরনের জীবজগতের জীবনধারণের ও বংশবিস্তারের অধিকার রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতি ধ্বংসের মাধ্যমে আমরা এ সত্যকে অস্বীকার করি যা অনভিপ্রেত এবং অনৈতিক। খাদ্যশৃঙ্খল স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে, মানুষ, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ নীতিবিদ্যার সন্তোষজনক সংজ্ঞা দেয়া সহজসাধ্য নয়। কারণ বৈচিত্র্যময় এ পৃথিবীর নৈতিক প্রেক্ষাপট খুব সহজে ব্যাখ্যা করা দুরূহ কাজ। নীতিবিদ্যায় অসংখ্য নৈতিক মানদণ্ড রয়েছে। পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনায় এসকল মানদণ্ডকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা সহজ ব্যাপার নয়। মোটকথা পরিবেশ নীতিবিদ্যা হল পরিবেশ ও নৈতিকতার একটি সমন্বিত পর্যালোচনা।

বর্তমানে দর্শনের আওতায় পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করা যায়। যেমন-অধিবিদ্যক, মূল্যবিদ্যক, জ্ঞানবিদ্যক, নীতিবিদ্যক ইত্যাদি।

অধিবিদ্যক দিক থেকে পরিবেশ নীতিবিদ্যা মানব সংস্কৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যকার বাস্তব স্বাতন্ত্র্যকে ব্যাখ্যা করে। এখানে অধিবিদ্যক প্রশ্ন হলো: মানুষ কি প্রকৃতির অংশ?

মূল্যবিদ্যক দিক থেকে পরিবেশ নীতিবিদ্যায় আলোচনা করা হয় মানুষ স্বতঃমূল্যের অধিকারী নাকি অ-মানব প্রাণী ও প্রকৃতি স্বতঃমূল্যের অধিকারী।

পরিবেশ নীতিবিদ্যা জ্ঞানবিদ্যক বিষয় নিয়েও আলোচনা করে। যেমন:- একজন কিভাবে জানতে পারে যে মানুষ এবং প্রকৃতির সম্পর্ক কি এবং প্রকৃতির কি নিজের মূল্য আছে?

নীতিবিদ্যক দিক থেকে স্পষ্টতই পরিবেশ নীতিবিদ্যা নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলি বিবেচনা করে। যেমন:- অ-মানব প্রকৃতির প্রতি মানুষের নৈতিক বাধ্যবাধকতা কি রয়েছে?

বর্তমান নিবন্ধে আমাদের আলোচনার পরিসর মূল্যবিদ্যা ও নীতিবিদ্যাকেন্দ্রিক।

৩. পরিবেশ নীতিবিদ্যার ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা হলো পরিবেশগত সমস্যা। কয়েক দশক পূর্বেও পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনা কেবল পরিবেশবিজ্ঞানীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এটা এখন সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সমস্যাটি এখন যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হওয়ার পথে। তাই আজ সরকারি-বেসরকারি, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সবক্ষেত্রেই পরিবেশ সমস্যা, তার প্রভাব ও সমাধান নিয়ে চিন্তাভাবনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ একটা ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। একাডেমিক ক্ষেত্র হিসেবে পরিবেশ নীতিবিদ্যার উন্মেষ সাম্প্রতিক হলেও তার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন।

এখানে পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমেরিকান পরিবেশ দার্শনিক, প্রাণীবিদ ও উদ্ভিদবিদ জন ম্যুর (John Muir, ২১ এপ্রিল ১৮৩৮-২৪ ডিসেম্বর ১৯১৪) ছিলেন পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি উপবন সংরক্ষণ এবং জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠার

অন্যতম সমর্থক ছিলেন। তাছাড়া তিনি সিয়েরা ক্লাবও (Sierra Club) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রখ্যাত আমেরিকান পরিবেশবিদ ডেভিড ব্রাওয়ার (David Brower, ১৯১২-নভেম্বর ৫, ২০০০) ম্যুরের (Muir) পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকের পরিবেশবিদদের একজন এবং সিয়েরা ক্লাবের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৪৯ সালে আমেরিকান জীববিদ আলডো লিওপোল্ড (Aldo Leopold, ১৮৮৭-১৯৪৮) তাঁর “The Land Ethic” নামক প্রবন্ধে পরিবেশ বিষয়ক দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত করেন (Leopold 113)। উল্লেখ্য যে, এ প্রবন্ধ প্রকাশের ত্রিশ বছর পর বিষয়টি পরিবেশ নীতিবিদ্যা নামে পরিচিত হয়। বিংশ শতাব্দির ষাটের দশকের গোড়াতে যখন পরিবেশ সমস্যা তেমন একটি পরিচিত বিষয় হয়ে ওঠেনি সেই সময় জীববিজ্ঞানী র্যাচেল কারসন (Rachel Carson) এর ‘Silent Spring’ নামক গ্রন্থটি আমেরিকা তথা গোটা বিশ্বে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কারসন জোরালোভাবে বলেছেন যে, দ্রুতবর্ধনশীল জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা পূরণার্থে বিভিন্ন কীটনাশক ও আগাছানাশকের বিশেষত DDT, অ্যালডিরিন এবং ডিইডিভিন ব্যবহার করে ফসলের ফলন এবং মুনাফা বাড়ানোর লক্ষ্যে যে বাণিজ্যিক চাষের প্রচলন হচ্ছে তা মূলত পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ (Carson)। এ গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন যে, অতিমাত্রায় এসকল রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে জীবজগতের জীবনচক্র পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে উদ্ভিদ জগতেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। যার ফলে বসন্ত এসেছে কিন্তু ফুল ফোটেনি, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে না। মানুষের এরকম কর্মকাণ্ডের কারণে প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন ঘটছে। কারসনের বক্তব্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে এবং জৈব-চাষের উপর অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Paul R. Ehrlich ও Anne Ehrlich রচিত “Population Bomb” গ্রন্থটি পরিবেশবাদীদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে (Jardins 77)। উক্ত গ্রন্থে তিনি জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির কারণে পৃথিবীর ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়া এবং মানুষ ও অন্যান্য অমানব প্রজাতির মধ্যে অসম বন্টনের ফলে ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কার ইঙ্গিত দেন। তাছাড়া ষাটের দশকে বিশ্বে ব্যাপক উন্নতির ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান যখন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে তখন কয়েকজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি প্রধানত দুটি প্রশ্নকে সামনে রেখে ১৯৬৮ সালে ক্লাব অব রোম প্রতিষ্ঠা করেন (Suter 1-5)। প্রশ্ন দুটি হচ্ছে-

১. উন্নতির এ ধারা অব্যাহত রাখা যাবে কি না?
২. এরূপ উন্নতির জন্য বিশ্বের সম্পদের নির্বিচার ব্যবহারের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে যাওয়া সম্ভব হবে কি না?

১৯৭২ সালে এটি ‘ক্রমোন্নতির সীমারেখা’ নামে যে প্রথম রিপোর্টটি প্রকাশ করে তাতে পরিবেশ, জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যকার সমস্যার স্বরূপ তুলে ধরা হয়। এভাবে ক্লাব অব রোম পরিবেশগত সমস্যাটির দিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সত্তরের দশকে পরিবেশ দার্শনিকরা পরিবেশগত সমস্যাগুলির দার্শনিক দিক বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক লিন হোয়াইট এর “The Historical Roots of our Ecological Crisis”(White 155) এবং আমেরিকান বাস্তুবিদ গ্যারেট হার্ডিন এর “The Tragedy of the Commons” গ্রন্থে এ ধরনের আলোচনা স্থান পায় (Hardin 162)। তাছাড়া গ্যারেট হার্ডিন এর পরবর্তী আরেকটি প্রবন্ধ “Exploring New Ethics for Survival” এ পরিবেশের দার্শনিক ও নৈতিক দিকগুলো আলোকপাত করা হয় যা মূলত: সত্তরের দশকে পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সত্তরের দশকে পরিবেশ নীতিবিদ্যা আমেরিকার দার্শনিকদের আলোচনার অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৭০ সালের ২২ এপ্রিল আমেরিকায় প্রথম ‘ধরিত্রী দিবস’ পালিত হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা, এর স্বীকৃতি ও গুরুত্ব উপলব্ধিই ছিল এ দিবস পালনের উদ্দেশ্য (Hargrove 183)। এ দিবসটি বর্তমানে প্রতি বছর ২২ এপ্রিল ১৭৫টি দেশে পালিত হয়।

পরিবেশ নীতিবিদ্যাসংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক একাডেমিক জার্নাল প্রকাশিত হয় ১৯৭০ এর দশকের শেষদিকে এবং ১৯৮০ এর দশকের প্রথমদিকে উত্তর আমেরিকায়। ১৯৭১ সালে জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোন এবং জোয়েল ফেইনবার্গ নামক দুইজন নীতিবিদ তাঁদের পরিবেশ সংক্রান্ত মতামত প্রকাশ করেন। ১৯৭২ সালে জন বি. কোব রচিত *Is It Too Late? A Theology of Ecology* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (Cobb, 1972)। তিনি যুক্তি দেখান যে, প্রকৃতির অবমূল্যায়ন হল খ্রিষ্টধর্মকে অবমূল্যায়ন যা মূলত পরিবেশ সংকটকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে সুইডেনের স্টকহোমে ‘মানব-পরিবেশ সংকট’ শিরোনামে প্রথম পরিবেশ বিষয়ক দার্শনিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে একই বছর ক্রিস্টোফার স্টোন “Should Trees Have Standing?” নামক প্রবন্ধে অমানব প্রকৃতির প্রতি বিদ্যমান আইনী নীতিগুলোকে প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া ১৯৭৩ সালে নরওয়ের দার্শনিক ও *Inquiry* জার্নালের প্রতিষ্ঠাতা আর্নে নায়েস “The Shallow and Deep, Long-Range Ecology Movement” নামক প্রবন্ধে মানবকেন্দ্রিক মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন (দাস ১৫৪)। তাঁর নেতৃত্বে পরবর্তীতে গভীর বাস্তুবিদ্যা (Deep Ecology) আন্দোলন বিকাশিত হয় যা অ-মানবকেন্দ্রিক অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করে। আর্নে নায়েস আমাদের পুরো সভ্যতার পুনঃনির্মাণের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। একই সময়ে অষ্ট্রেলীয় দার্শনিক রিচার্ড রাখলি পঞ্চদশ World Congress of Philosophy -তে পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ “Is there a Need for a New, an Environmental, Ethic?” উপস্থাপন করেন যা পরিবেশ দর্শন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৭৩ সালে বুলগেরিয়ায় অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে দার্শনিক রিচার্ড সিলওয়ান একটি প্রস্তাব করেন। এতে তিনি প্রশ্ন করেন, পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার প্রাক্কালে শেষ মানুষটি যদি নিজের প্রাণ হারানোর আগে সমস্ত জিনিসকে ধ্বংস করে দেয় তাহলে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচনা করা যায় কি (Routley 205-210)? পরবর্তী বছর ১৯৭৪ সালে অষ্ট্রেলীয় দার্শনিক জন পাসমোর প্রথম পরিবেশ নীতিবিদ্যার উপর বই আকারে পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেন। বইটির নাম “Man’s Responsibility to Nature”। তিনি এ গ্রন্থে রাখলির মতের বিরোধিতা করেন। পাসমোর বলেছিলেন, পরিবেশগত সমস্যা যেহেতু মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা সৃষ্ট সেহেতু সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দ্বারাই এর সমাধান করা যাবে। তাই তিনি এটাকে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের আলোচ্য বিষয় মনে করেন, নীতিবিদ্যার নয়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে হোমস রলস্টন পাসমোরের বিরোধিতা করে পরিবেশ নীতিবিদ্যার একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি *Ethics* নামক জার্নালে Is There an Ecological Ethics? প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধের মাধ্যমে দর্শনের মূলধারায় পরিবেশ নীতিবিদ্যা স্থান পায়। তাছাড়া ১৯৭৭ সালে জন রডম্যান “Moral Extensionism” নামক ক্রিটিকে পরিবেশ নীতিবিদ্যার কথা বলেন। এছাড়া ১৯৭৭ সালে জর্জ সেশনস পশ্চিমা সমাজের “Impenetrable Ontological Divide” নিয়ে নিন্দা করেছিলেন। যা মূলত অধিবিদ্যাক দ্বৈতবাদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তিনি যুক্তি দেখান যে, প্রকৃতির সকল কিছু একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়ই বরং পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি স্পিনোজার একত্ববাদে (Monism) বাস্তুবিজ্ঞানের অন্তর্দৃষ্টি খুঁজে পান। এছাড়া তিনি কবি রবিনসন জেফার্সের (Robinson Jeffers) পরিবেশ নীতিবিদ্যা নিয়ে নতুন দিক আলোচনার প্রশংসা করেন।

একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে আমেরিকার নর্থ টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেয়ার্ড ক্যালিকট নামক আমেরিকান পরিবেশ নীতিবিদ “Elements of Environmental Ethics” প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, বাস্তবাত্মিক সম্প্রদায়ের জৈব ও অজৈব সদস্যের প্রতি মানুষের নৈতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ক্যালিকট পরিবেশ নীতিবিদ্যার সমষ্টিবাদ এবং অমানবকেন্দ্রিক মতবাদকে বিকশিত করেন। অতঃপর ১৯৭৯ সালে ডোনাল্ড ভ্যানডিভার প্রস্তাব করেছিলেন মৌলিক চাহিদা এবং পেরিফেরিয়াল চাহিদার মধ্যে পার্থক্য তৈরী করতে। মৌলিক চাহিদা নিয়ে যখন মানব এবং অমানব প্রাণীর মধ্যে মতদ্বৈততা দেখা দেয় তখন মানুষের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং এটা মূলত Hierarchical Biocentrism এর কারণে হয়ে থাকে।

১৯৭৯ সালে নর্থ টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ও পরিবেশ দার্শনিক ইউজেন সি হারথড “Journal of Environmental Ethics” নামে পরিবেশ নীতিবিদ্যার উপর প্রথম জার্নাল প্রকাশ করেন। এটি ইউনিভার্সিটি অব নিউ মেক্সিকো থেকে প্রকাশিত হয়। এসব প্রকাশনা পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচনাকে আরও যুগোপযোগী ও অপরিহার্য করে তোলে এবং পরিবেশ সম্পর্কিত দার্শনিক আলোচনা “পরিবেশ নীতিবিদ্যা” নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। বস্তুত পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিকাশের ক্ষেত্রটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সত্তরের দশকে মানুষের সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে দুই ধরনের চিন্তার বিকাশ ঘটেছে:

১. গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গঠিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যেখানে মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে পাসমোর এবং অ-মানবকেন্দ্রিকবাদকে সিংগার, স্টোন প্রমুখরা বিকশিত করেন।
২. অন্যটি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রত্যাখ্যান করে সমষ্টিবাদের পক্ষে জোর দেয়। বস্তুত সত্তর এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এ প্রগতিবাদীদের আধিপত্য ছিল। তবে সেক্ষেত্রে গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গিকেও অগ্রাহ্য করা হয়নি।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ১৯৮৩ সালের পূর্বে পাসমোরের বিরোধিতা করে কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। বৃটিশ দার্শনিক রবিন অ্যাটফিল্ড পাসমোরের বিরোধিতা করে প্রথম *The Ethics of Environmental Concern* নামক গ্রন্থটি এই বছর রচনা করেন। অ্যাটফিল্ড দেখানোর চেষ্টা করেন যে, পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে প্রকৃতির প্রতি মানুষের প্রভুত্বের নয়, বরং সেবকের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি দাবি করেন যে, পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে পরিবেশ নীতিবিদ্যার উপাদান রয়েছে। পরবর্তীতে পাসমোরের গ্রন্থের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ Donald Scherer এবং Thomas Attig সম্পাদিত *Ethics and the Environment* এবং Eugene C. Hargrove রচিত *Foundations of Environmental Ethics* নামক গ্রন্থদ্বয় রচিত হয়।

ইতোমধ্যে আমেরিকান পরিবেশ দার্শনিক হোমস রলস্টন ১১ ১৯৯০ সালে The International Society for Environmental Ethics প্রতিষ্ঠা করেছেন যার প্রেসিডেন্ট তিনি নিজেই। এটি বিশ্বজুড়ে বড় বড় দার্শনিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এর মধ্যে পরিবেশ নীতিবিদ্যা উন্নত বিশ্বের অনেক জায়গায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জায়গায় করে নিয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের পণ্ডিতরাও এর বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। প্রয়াত হেনরি ওডেরা ওরুকা কেনিয়ার নাইরোবিতে একটি ইকোফিলোসফি সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন এবং ১৯৯১ সালে নাইরোবিতে পরিবেশ, বিকাশ এবং দর্শনের মধ্যকার যোগসূত্র নিয়ে বিশ্বদর্শনের একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এর আরও একটি উদাহরণ হল ১৯৯৫ সালে মালয়েশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আজিজান বাহারউদ্দিন দ্বারা মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে আয়োজিত উন্নয়ন, নীতি ও পরিবেশ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

পরিবেশ নীতিবিদ্যাসংক্রান্ত এই আলোচনা পরবর্তীকালে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর রূপ লাভ করেছে। তৃতীয় বিশ্বের পরিবেশ দার্শনিকরা প্রায়শই দারিদ্র্য ও অন্যায্যতার সমস্যাগুলির প্রতিকারের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তার সাথে পরিবেশবাদকে সংমিশ্রণ করে ফেলে। মূলত এভাবেই পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিকাশ লাভ করে বর্তমানে অবস্থানে এসেছে। পরবর্তীতে পরিবেশ নীতিবিদ্যার মাধ্যমে প্রায়োগিক দর্শন বিকাশ লাভ করেছে।

৪. পরিবেশ নীতিবিদ্যার গুরুত্ব:

কোনো একটি জীব পরিবেশে এককভাবে বাঁচতে পারে না। জীবকে পরিবেশের অঙ্গ হিসেবে অন্য জীবের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয়। অর্থাৎ পরিবেশের আনুকূল্য এবং সেই সাথে অন্যান্য জীবের মিথস্ক্রিয়া ব্যতীত কোনো জীব বাঁচতে পারে না। এটাকে জীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বলা হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দ্বারা পরিবেশ সংরক্ষিত হয়। যেমন: একটি পুকুর বা দীঘির মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী নির্ভরশীলতায় পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং দীঘির কোনো একটি প্রাণীর উপর সজীব এবং জড় উপাদানের প্রভাব পর্যালোচনা করলেই নির্ভরশীলতার পরিবেশ সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের হাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়। মানুষ নিজের সুবিধার জন্য পরিকল্পনামাফিক প্রাকৃতিক পরিবেশের রূপান্তর ঘটাতে থাকে। ফলে সৃষ্টি হয় কৃত্রিম পরিবেশ। এ কৃত্রিম পরিবেশের মধ্য থেকেই মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভাল-মন্দ, কর্তব্য-অকর্তব্য, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি নৈতিকবোধগুলো নিয়ে টিকে থাকতে হয়। প্রত্যেক সমাজের মানুষই তাদের উপযোগী কিছু নৈতিক নিয়ম তৈরী করে তা না হলে মানুষের জীবন সঙ্কটজনক অবস্থায় পতিত হতো। সমাজে জীবনধারণের জন্য যেমন কিছু নিয়মনীতির প্রয়োজন তেমনি সমাজের অপরিহার্য অংশ পরিবেশের প্রতি মানুষের সচেতনতা প্রয়োজন। মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীর জীবনধারণক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশের অঙ্গহানি বা ক্ষয় (যথা: প্রজাতির বিলুপ্তি বা মৃত্তিকা ক্ষয়) মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে ঋণাত্মক পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্বের জন্য টেকসই পরিবেশগত উন্নয়ন বা পরিবেশের স্থায়িত্ব পরিচালনা অপরিহার্য। পরিবেশ পরিচালনের একটি অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য হলো পৃথিবীর সকল মানুষকে একটি সাধারণ পরিবেশ নীতির আওতায় আনা। দর্শনের একটি অন্যতম শাখা হিসেবে নীতিবিদ্যা কেবল মানুষের আচরণ সম্পর্কীয় আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে এর নানা শাখা-প্রশাখা বিকাশ লাভ করেছে। নীতিবিদ্যার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এর তিনটি ধারা লক্ষণীয়। এগুলো হলো-প্রচলিত নীতিবিদ্যা, পরানীতিবিদ্যা এবং প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা। পরিবেশ নীতিবিদ্যা প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার একটি নতুন সংযোজন।

পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করছে মানুষে মানুষে যেখানে এত দ্বন্দ্ব সেখানে পরিবেশ বিপর্যয় হওয়া অবধারিত। প্রতিনিয়ত বিশ্বে যেসকল অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তার নৈতিক সমাধান দেয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সেখানে পরিবেশকেন্দ্রিক সমস্যাগুলোর নৈতিক সমাধান অকল্পনীয়। তবে পরিবেশগত আলোচনাসমূহ অনেকটা তাত্ত্বিক হলেও এর ব্যবহারিক গুরুত্ব অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা জানি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, কীটনাশকের ব্যবহার, প্রযুক্তি এবং শিল্প যখন পরিবেশের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে শুরু করে তখনই পরিবেশ নীতিবিদ্যার উত্থান হয়েছে। সুতরাং, একে পরিবেশ রক্ষার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। পরিবেশ নীতিবিদ্যায় কেবল মানুষের স্বার্থরক্ষার কথাই বলা হয় না, বরং এখানে অন্যান্য অমানব প্রাকৃতিক সত্তার বিষয়েও আলোকপাত করা হয়। এটি মূলত মানুষ এবং প্রাকৃতিক বিশ্বের মধ্যকার নৈতিক সম্পর্কে বিবেচনা করে এবং পরিবেশ সম্পর্কে মানুষ কি ধরনের সিদ্ধান্ত নিবে তা আলোচনা করে। যেমন:

১. মানুষের ব্যবহারের স্বার্থে বন ধ্বংস করা উচিত কিনা?
২. আমরা কি জেনেশুনে অন্যান্য প্রজাতির বিলুপ্তির কারণ হবো?
৩. পরিবেশকে সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য মানুষকে কি সাধারণ জীবনযাপনে বাধ্য করা উচিত?

যেহেতু পরিবেশ নীতিবিদ্যার কোনো নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক পরিবেশগত কোড হৈন, তাই পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে, আমরা বিশ্বের সম্পদ এবং অন্যান্য প্রজাতির প্রতি কেমন আচরণ করবো তা সহজভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব না হলেও পরিবেশ নীতিবিদ্যা তার অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পদ লুপ্তনের গুদামঘর নয় বরং জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এটি একটি অত্যাবশ্যিক রিজার্ভ। প্রাকৃতিক সম্পদের যত্রতত্র ব্যবহার আমাদের জন্যই ক্ষতিকর। আমরা বাড়িঘর তৈরির জন্য গাছপালা কাটছি। প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আমাদের হস্তক্ষেপ চলছে। সম্পদের অযৌক্তিক, অনিয়ন্ত্রিত ও অবিবেচনাপ্রসূত ব্যবহার আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। এগুলো কি নৈতিক? যখন শিল্প প্রক্রিয়াগুলো সম্পদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তখন এ নিখোঁজ সম্পদের পুনরুদ্ধার করা শিল্পের দায়িত্ব নয় কি? কিংবা তারা কি পারবে পরিবেশকে আগের অবস্থানে নিয়ে যেতে? এগুলো পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিষয়। তাই বলা যায় পরিবেশ নীতিবিদ্যা কেবল বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন সাধনের কথাই বলে না, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবীর কথাও বিবেচনা করে।

মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি এ পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে বেঁচে থাকে। মানুষের জীবনের প্রায় সব মৌলিক চাহিদার সংস্থান হয় পরিবেশের মাধ্যমে। কিন্তু এই মানুষেরই স্বেচ্ছাচারী ও অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকান্ডের ফলে দিন দিন পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। এগুলো অনৈতিক নয় কি? তাছাড়া নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংস করার কারণে প্রাণীদের আবাসস্থলের ক্ষতি হচ্ছে বিধায় তারা মানববসতিতে প্রবেশ করেছে। এতে সেখানে বসবাসকারী জনগণের কাছে তা হুমকিস্বরূপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে রক্ষার জন্য এ ধরনের বন্যপ্রাণীকে হত্যা করে। আবার প্রাণীরা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যার জন্যও তাদেরকে হত্যা করা হয়। এছাড়া প্রাণীদের উপর গবেষণাও তাদের জন্য ক্ষতি বয়ে আনে। এভাবে দিন দিন বহু প্রাণীর বিলুপ্তি হচ্ছে। তাই বলা যায় আমরা কীভাবে তাদের বেঁচে থাকার অধিকারকে অস্বীকার করতে পারি? আমরা কীভাবে তাদেরকে বাসস্থান এবং খাদ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে পারি? কে আমাদের স্বার্থের জন্য তাদের ক্ষতি করার অধিকার দিয়েছে? পরিবেশের প্রতি উচিত্য- অনৈচিত্যের এ সব বিষয়গুলো পরিবেশ নীতিবিদ্যার অন্তর্গত যা আমাদের পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন।

যারা মনে করেন যে, প্রকৃতির কোন মূল্য নেই তাদের কাছে পরিবেশ নীতিবিদ্যারও কোন মূল্য নেই। আবার কেউ কেউ মনে করেন প্রকৃতির যেহেতু স্বতঃমূল্য নেই তাই পরিবেশ নীতিবিদ্যা বলেও কিছু নেই। আমেরিকান পরিবেশ নীতিদার্শনিক হোমস রলস্টন এ শর্তকে প্রত্যাখ্যান করে প্রকৃতি ও পরিবেশের যে মূল্য আছে তা উল্লেখ করেন। তিনি প্রকৃতি ও পরিবেশের চৌদ্দটি মূল্যের কথা বলেন। এগুলো হল: জীবনসহায়ক মূল্য, অর্থনৈতিক মূল্য, বিনোদনমূলক মূল্য, নান্দনিক মূল্য, বহুমাত্রিক প্রজনন সম্পর্কিত মূল্য, ঐতিহাসিক মূল্য, চরিত্র গঠনকারী মূল্য, বৈজ্ঞানিক মূল্য, সাংস্কৃতিক-প্রতীকী মূল্য, জীবনের মূল্য, ধর্মীয় মূল্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মূল্য, স্থায়িত্ব ও স্বতঃস্ফূর্ত মূল্য, দ্বন্দ্বিক মূল্য (খালেক ৩৩৮)। এই মূল্যগুলো প্রকৃতির সকল সম্পদের স্বতঃমূল্যের কথা বলে।

মূলত পরিবেশ নীতিবিদ্যাকে অস্বীকার করলে পুরো নীতিবিদ্যাকেই অস্বীকার করা হয়। কারণ পরিবেশ ও মানব জীবন এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। প্রকৃতিতে মানুষসহ অন্যান্য জীবজন্তু, প্রাণী, পশুপাখি, জলবায়ু, উদ্ভিদ,

মাটি, অণুজীব প্রভৃতি একে অন্যের সাথে সহাবস্থান করছে। যাকে আমরা বাস্তুসংস্থান বলি। জৈবিক ও বৌদ্ধিক স্বাতন্ত্র্যের কারণে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হওয়া সত্ত্বেও মানুষ পরিবেশেরই অবিচ্ছিন্ন সত্তা। মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের সন্তান এবং এ প্রাকৃতিক পরিবেশেই সে তার আপন অস্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়েছে। মানুষকে সমাজের অন্যান্য সবকিছুরই পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ এর সাথে বসবাস করতে হয়। ফলে একজন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব হিসেবে মানুষের উচিত তাদেরকে নৈতিকভাবে শ্রদ্ধা করা।

পরিবেশ নীতিবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য ও টেকসই পৃথিবী উপহার দেয়ার পক্ষে কথা বলা। এখানে বলা হয় যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু পরিবেশগত অবনতি ও সম্পদের হ্রাসের ফলে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছি যা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। তাদেরকে ভালো পরিবেশ উপহার দেয়া কি আমাদের দায়িত্ব নয়? লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অ-নবায়নযোগ্য সম্পদগুলি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে এবং দুর্ভাগ্যবশত তাদেরকে প্রতিস্থাপিত করাও সম্ভব নয়। আমাদের উচিত প্রয়োজন ও সম্পদের পরিমাণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে ব্যবহার করা যাতে পরবর্তী প্রজন্ম উপকৃত হয় এবং বাসযোগ্য পৃথিবী পায়। আমরা নৈতিকভাবে পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের প্রয়োজনকে বিবেচনা করতে বাধ্য। পরিবেশের উপাদানগুলো কেবল মানবসত্তার জন্য নয়, বরং এগুলো প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নৈতিকতার দাবি রাখে। পরিবেশ নীতিবিদ্যা প্রকৃতির অ-মানব সত্তার প্রতি মানুষের কোন নৈতিক দায়িত্ব আছে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে। উন্নয়ন ও সুবিধার জন্য আমরা জ্বালানি নিঃসরণের মাধ্যমে যে দূষণ করি তা কি ন্যায্য অধিকার? প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অব্যাহত রাখা ও যথেষ্ট ব্যবহার কি পরিবেশের জন্য নৈতিকভাবে সঠিক? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পরিবেশ নীতিবিদ্যা থেকে পেয়ে থাকি। জলবায়ু পরিবর্তন উদ্ভিদের বৈচিত্র্যতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটি সত্য যে, মাত্রাতিরিক্ত দূষণ কেবল মানুষের জন্য নয় বরং উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ। উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জন্য যা ক্ষতিকর তা আমাদের জন্যও ক্ষতিকর। কেননা আমাদের বেঁচে থাকা তাদের উপর নির্ভর করছে। এ থেকে এটাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পরিবেশকে রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। পরিবেশের প্রতি আমাদেরও কর্তব্য আছে এবং অন্যান্য জীবসত্তাগুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। এমনকি যদিও মানবসত্তাকে পরিবেশের প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়, প্রাণী ও উদ্ভিদের গুরুত্বও কম নয়। তাদেরও সম্পদের ন্যায্য ভাগ এবং একটি নিরাপদ জীবন পরিচালনার অধিকার আছে। এগুলো পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

নৈতিক দায়িত্ব বলতে সাধারণ জ্ঞান, সমতা, পছন্দ এবং মূল্যের গুরুত্বকে বুঝায়। তাই এ কথাটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যদি একজন ব্যক্তি নৈতিকভাবে কোনোকিছু করার জন্য দায়বদ্ধ হয় তাহলে তিনি-

১. প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানেন;
২. এটি সম্পাদন করতে সক্ষম;
৩. কোনো কিছু করবেন কি করবেন না তা ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে বেছে নিতে পারেন; এবং
৪. তার কার্যক্রম/কর্মদক্ষতা অন্যান্য সত্তার ক্ষেত্রে মঙ্গল বয়ে আনে। কারণ এ প্রয়োজনীয়তাগুলির প্রতিক্রিয়া একজন নৈতিক ব্যক্তি হিসাবে তার মূল্যের উপর প্রতিফলন ঘটায়।

তাই সমাজের ভারসাম্য অবস্থা বজায় রাখার জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে নৈতিকতা থাকা প্রয়োজন। ব্যক্তির কঠোর সংকল্প এবং পরিবেশগত নীতিবাক্য পৃথিবীর জীবনধারায় অনেক পরিবের্তন আনবে। তাই পরিবেশ নীতিবিদ্যা পাঠের

ফলে মানুষের মধ্যে নৈতিক ব্যক্তি হিসেবে কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়, মানুষ নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে আরো সচেতন হয়।

পরিবেশ নীতিবিদ্যার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরা যাক পাহাড়ঘেরা, ছায়া সুনিবিড় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয় যা এখানকার সবাইকে নানাভাবে আন্দোলিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে ঘন বনাঞ্চলবেষ্টিত পাহাড়, নানা প্রজাতির জীবজন্তু, পাখি রয়েছে। ছুটির দিনগুলোতে অনেকে চিত্তবিনোদনের জন্য এখানে আসেন এবং এখানে শিক্ষানুরাগীদের জন্য গবেষণার জন্য অসংখ্য উপকরণও রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিনের অনুসন্ধান জানা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত পাহাড়গুলোর তলদেশে নানা মূল্যবান ধাতব সামগ্রী রয়েছে। এসব ধাতব সামগ্রী উত্তোলনের জন্য পাহাড় খুঁড়তে হবে। এতে করে অসংখ্য গাছপালা ধ্বংস হবে, জীবজন্তু ও পশুপাখি তাদের আবাসস্থল হারাবে। অপরদিকে, মূল্যবান ধাতু উত্তোলন করলে দেশ আর্থিকভাবে লাভবান হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেবে যে, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের করণীয় কি হবে? আমরা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখবো, নাকি মূল্যবান ধাতব পদার্থ উত্তোলন করবো? একমাত্র নৈতিক নীতিমালাই পারে এ নৈতিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর করতে। এখানেই মূলত পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিহিত। আমাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং অভাবগুলোকে পূরণ করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশ নীতিবিদ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের উচিত টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ নীতিবিদ্যার দিকগুলোর অনুশীলন করা।

তথ্যসূত্র

- Attfield, Robin. *The Ethics of Environmental Concern*. London: The University of Georgia Press, 1983.
- Carson, Rachel. *The Silent Spring*. Houghton Mifflin Company, 1962.
- Cobb, John B.. *Is Too Late? A Theology of Ecology*. Bruce: Beverley Hills, 1972.
- Jardins, Joseph R. Des. *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy*. Wadsworth, 2013.
- Hardin, Garrett. The Tragedy of the Commons. *Science*, Vol. 162, Dec, 1968. Hargrove, Eugene C. Weak Anthropocentric Intrinsic Value. *The Monist*, 1992.
- Leopold, Aldo. *A Sand County Almanac*. London: Oxford University press, 1949.
- Lillie, William. *An Introduction to Ethics*. London: Methuen & Co. Ltd., 1964.
- Mackenzie, J.S. *A Manual of Ethics*. London: Univ. Tutorial Press Ltd., 1964.
- Passmore, John., *Mans Responsibility for Nature*. England: Duckworth, 1974, (2nd edition 1980).
- Routley, R. Is There a Need for a New, An Environmental Ethic? *Proceedings of the XVth World Congress of Philosophy*. Varna: Sofia Press, 1973,
- Scherer, Donald & Attig. Thomas *Ethics and the Environment*. New Jersey: Prentice Hall, 1983.
- Eugene C. Hargrove. *Foundations of Environmental Ethics*. New Jersey: Prentice Hall, 1989.

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

Suter, K. The Club of Rome: The Global Conscience. *Contemporary Review*, 1999.

White, Lynn .The Historical Roots of our Ecological Crisis.*Science*, Vol. 155, March, 1997.

খালেক, এ. এস. এম.আব্দুল। *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা*। ঢাকা: অনন্যা প্রকাশন, ২০০৯।

দাস, কালীপ্রসন্ন। “পরিবেশ নীতিবিদ্যা: উদ্ভব ও বিকাশ”, *কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন*। রাজশাহী: মফিজউদ্দিন আহমদ স্মৃতিসংসদ, ২০০৩।

ভরত মূনির নাট্যশাস্ত্রে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন

নীলকান্ত বিশ্বাস*

প্রতিপাদ্যসার: প্রাচীন ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্র। নাট্যশাস্ত্র শুধু নাটকের নয়- অভিনয়শিল্প, নৃত্য, সংগীত ও অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কেও প্রামাণিক গ্রন্থ। পরবর্তী বিভিন্ন অলঙ্কারশাস্ত্রের মূল উৎস। আধুনিক নাট্যশিল্পের ক্রমবিকাশের এই যুগে অসংখ্য নাট্যানুরাগী রয়েছেন যারা নাট্যশাস্ত্রের অনুরাগী। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্যরূপে নির্বাচিত। এছাড়া দেশের ফিল্ম ইনস্টিটিউটগুলিতেও পাঠ্যসূচির অন্তর্গত। নাট্যশাস্ত্র সর্ববিধ প্রয়োগ কলারও উৎসভূমি। প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার উৎপত্তি কখন হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ঋগ্বেদের সংবাদ বা আখ্যান সূত্রগুলিতে যে কথোপকথন আছে তা থেকেই নাটকের ধারণা জন্মেছিল। ভারতীয় নাট্যকলার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব উল্লেখযোগ্য। আদি নাট্যকার ভরতমুনি প্রণীত নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থের বিবরণে নাট্যকলার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, কাল, বিবর্তনধারা, নাট্য শ্রেণিভাগ, রস, বৃত্তি, লক্ষণ, অলঙ্কার, প্রকরণ, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ আলোচনা রয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের এসব উপকরণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির চিত্র ফুঁটে উঠেছে ও নাট্যশাস্ত্রের মূল্যও নিরূপিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা: সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রাচীনতম এবং অতীব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্র (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮)। মূলত নাট্যতত্ত্ব (অভিনয়, গীত, বাদ্য ও নৃত্য) সম্পর্কিত প্রাচীন পণ্ডিতদের বিবিধ তত্ত্ব ও আলোচনার সংকলন এই নাট্যশাস্ত্র। নাটক ও নাট্যতত্ত্ব এর প্রধান আলোচ্য হলেও ব্যাপকার্থে কাব্য বা সাহিত্যকে এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ৭-৮)। কাব্যের প্রধান দুই ভেদ: ১. দৃশ্য কাব্য ও ২. শ্রব্য কাব্য। শ্রব্য কাব্য অর্থাৎ নাট্যভিন্ন অন্যান্য গদ্য, পদ্য ও মিশ্র কাব্য। নাট্যে যেহেতু গদ্য ও পদ্য উভয়ই প্রযুক্ত এবং সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ আদর্শ নাট্যরচনায় নাট্যশাস্ত্রের আলোচ্য। এরূপ রচনার দোষ, গুণ অলঙ্কার এবং অন্যান্য গুণমান এর আলোচ্য (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০০)। তাই প্রসঙ্গক্রমে নাট্যশাস্ত্রে ১০টি গুণ ও ৪টি অলঙ্কার (উপমা, দীপক, রূপক ও সমক) আলোচিত। প্রথম তিনটি অলঙ্কার সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কারের প্রতিনিধি এবং শেষোক্ত যমক শব্দালঙ্কারের প্রতিনিধি (ভট্টাচার্য ১৯-২০)।

ভরতমুনি পরিচয়: ভরত মুনি ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় নাট্য ও সংগীত বিশারদ। ভরতমুনি প্রাচীন ভারতের নাটক, বিশেষ করে সংস্কৃত মঞ্চ নাটক রচনা করেছেন। একই সাথে অভিনয় বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্র রচনা করেছেন। নাট্যশাস্ত্র রচনার সঠিক কাল এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি। তবে, বিভিন্ন পণ্ডিতগণের অনুমানের ভিত্তিতে ধারণা করা যেতে পারে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে নাট্যশাস্ত্র রচনা করা হয়। প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য ও সংগীতের মূল পাওয়া যায় নাটকে (প্রজ্ঞানানন্দ ২০৯-২১০)। ভরতমুনি অভিনয়ের তিনটি রূপের উল্লেখ করে বলেন, তামিল নাটকের উল্লেখযোগ্য অংশ হলো দ্রুপদী ভারতীয় সংগীত ও নৃত্য। তিনি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের দশটি গুণের উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে নাটক হলো একটি। এছাড়াও ভরতমুনি কিছু রস ও অভিব্যক্তির বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যেগুলি ভারতীয় নৃত্য, সংগীত ও মঞ্চনাটকের নানা বিষয় বর্ণনা করেছেন। ভরতমুনি ভরতনাট্যম নৃত্যধারার সৃষ্টিকারক হিসেবে মনে করা হয়। পুরাণ সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নৃত্যকলার দেবতা নটরাজ এই নৃত্যধারা সৃষ্টি করেছেন (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০১-৩০২)।

* সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের বিষয়বস্তু: ভরতমুনি প্রণীত নাট্যশাস্ত্র সংস্কৃত সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। মহর্ষি ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের মোট ৩৬টি অধ্যায় (প্রজ্ঞানানন্দ ২১২)। অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু দেওয়া হলো:

প্রথম অধ্যায়: এই অধ্যায়ে নাট্যবেদের উৎপত্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নাট্যকাব্যের বিভিন্ন অঙ্গের অঙ্গগুলি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মঞ্চের নাটক কিভাবে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন সেই সকল বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদ হতে বাণী, সামবেদ হতে সংগীত, যজুর্বেদ হতে অভিনয় এবং অথর্ববেদ হতে রস গ্রহণ করে এই পঞ্চম বেদ রচনা করেন (বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০)।

দ্বিতীয় অধ্যায়: বিভিন্ন প্রকারের রঙ্গালয়ের বর্ণনা, মর্ত্যবাসীর জন্য রঙ্গালয়, রঙ্গালয়ের সুবিধা অসুবিধা বিষয়ে, সঠিক স্থান নির্বাচন, জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থ, নান্দী অনুষ্ঠান, রঙ্গালয়ে স্তম্ভ নির্মাণ, রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ, রঙ্গমঞ্চের কার্যকার্য ইত্যাদি বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে (প্রজ্ঞানানন্দ ২১৭-২১৮)।

তৃতীয় অধ্যায়: রঙ্গালয় সংস্কারের নানা বিধান, দেবপ্রতিষ্ঠা, রঙ্গদেবতা পূজা, ঘটভাঙ্গার নিয়ম, রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন রকমের আলোকসজ্জা, রঙ্গমঞ্চ সংস্কারের ফলে বিভিন্ন রকমের সুফল, আবার অনেক সময় রঙ্গমঞ্চ সংস্কার সঠিক সময়ে করা না হলে নানা রকমের কুফল দেখা দিতে পারে সে সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, রঙ্গমঞ্চের মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, গুহক, এই সকল দেবতাগণের পূজা করা হয় এবং নাট্যানুষ্ঠানের জন্য তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয় (বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২)।

চতুর্থ অধ্যায়: ব্রহ্মার দ্বারা প্রথম নাট্যগ্রন্থ আরম্ভ, একই সাথে অভিনয় বিষয়ে ধারণা, দুই প্রকারের পূর্বরঙ্গ বিষয়ে আলোচনা, সাত অথবা ততোধিক কারণের সমাহার রমণীদের লীলায়িত নৃত্যভঙ্গি অর্থাৎ লাস্য নৃত্য নিষিদ্ধ উপলক্ষ্য, বাদ্যযন্ত্র বাদন, বাদ্যযন্ত্র বাদনের নিষিদ্ধকাল সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এই অধ্যায়ে দুইটি নাটক অভিনয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ‘অমৃতমহুর্ন’ নাটকটি দেবগণের সম্মুখে এবং ‘ত্রিপুরদাহ’ নাটকটি মহাদেবের সম্মুখে অভিনীত হয় এই বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪)।

পঞ্চম অধ্যায়: পূর্বরঙ্গ, অবতরণ, গুরু, বক্তৃতা, সংঘোটনা, গীতবিধি, উত্থাপন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন, পূর্বরঙ্গ, রঙ্গদ্বার, মহাচারী, চারী, তিন প্রকার রঙ্গ বিষয়ে আলোচনা, বর্ণ, দেবতা প্রভৃতি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, পূর্বরঙ্গ, নান্দী ও প্রস্তাবনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪)।

ষষ্ঠ অধ্যায়: নিরুক্তের সংজ্ঞা, কারিকার সংজ্ঞা, অভিনয়ের প্রকারভেদের মধ্যে চার প্রকার অভিনয়ের বর্ণনা, আট প্রকার রস সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। যথা: হাস্যরস, করুণরস, রৌদ্ররস, ভয়ানকরস, বীররস, বীভৎস রস, অদ্ভুতরস, শৃঙ্গাররস। তিন প্রকার রঙ্গ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এই অধ্যায়ে রস বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩)। এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভরত বলেছেন ‘রসস্যতে আত্মাদ্যতে ইতি রসঃ।’ তারপর রসভাব, অভিনয়, ধর্মীয় বৃত্তি, প্রবৃত্তি সিদ্ধি, স্বর, গান ও রঙ্গ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আট প্রকার রসের কথা ভরত মুনি নিজেও স্বীকার করেছেন। রসের অভিব্যক্তি কি করে হয় তা বলতে গিয়ে ভরত মুনি বলেছেন ‘বিভানুভাবাভিচারি সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ প্রবর্ততে।’ তবে উল্লেখ্য যে ভরত মুনি আট প্রকার রসের কথা বললেও কোনো কোনো স্থানে নবম রস হিসেবে শান্ত রসের নাম পাওয়া যায়। কবিচিন্তের রসানুভূতি থেকে কাব্যের উদ্ভব, সামাজিক চিন্তের রসানুভূতি থেকে কাব্যের উদ্ভব, সামাজিক চিন্তের রসানুভূতিতে কাব্যের পর্যাবসান। যেমন ‘বীজ থেকে বৃক্ষ, বৃক্ষ থেকে পুষ্প, পুষ্প থেকে ফল’ হয়। অর্থাৎ বীজ থেকেই সব কিছুই হয়। তেমনি ভাবেই দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্যের বেলায়ও রসই মূল। তাই তো ভরতমুনি বলেছেন, যথা:

‘বীজাদ্ ভবেদ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা ।

তথা মূলং রসাঃ সৰ্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ’ (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৩-১৩৬) ।

সপ্তম অধ্যায়: ভাবের সংজ্ঞা, বিভাবের সংজ্ঞা, রতি, হাস, ক্রোধ, ভয়, বিস্ময়, গ্লানি, শংকা, চিন্তা, মোহ, ধৃতি, চপলতা, আবেগ, গর্ব, বিষাদ, মতি, বিতর্ক, সাত্ত্বিক, রোমাঞ্চ প্রভৃতি বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৮) । এক কথায় বলা যেতে পারে এই অধ্যায়ে ভাব, বিভাব, স্থায়ী ভাব, ব্যভিচারী ভাব ও সেই সঙ্গে আট প্রকার স্থায়ীভাব বর্ণনা করা হয়েছে ।

অষ্টম অধ্যায়: অভিনয় শব্দের সম্যক ধারণা দেয়া, চার প্রকার অভিনয় সম্পর্কে আলোচনা, ছত্রিশ প্রকার দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা, সঞ্চারিতভাবে দৃষ্টি, স্থায়ীভাবে দৃষ্টি, দৃষ্টিভেদ, নাসিকা, চিবুক, মুখক্ৰিয়া, অধর প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । সংক্ষেপে বলা যেতে পারে এই অধ্যায়ে চার প্রকার অভিনয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে ।

‘আঙ্গিকো বাচিকশৈব আহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা ।

চত্বারোহভিনয়া হ্যেতে বিজ্ঞেয়া নাট্যসংশয়াঃ ।’

নবম অধ্যায়: নবম অধ্যায়ে রসভাবাদি অনুসারে হস্ত পদ প্রভৃতির বহুপ্রকার বিক্ষেপ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩-৪৪) ।

দশম অধ্যায়: এই অধ্যায়ে অঙ্গসমূহের বিবিধ নিক্ষেপ ও তাদের নামকরণ বর্ণনা করা হয়েছে (প্রজ্ঞানানন্দ ২১৫) ।

একাদশ অধ্যায় থেকে ষোড়শ অধ্যায়: ১৬ প্রকার চারী বা বিভিন্ন পাদ সংক্রমণ লক্ষণ সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে । মণ্ডপের লক্ষণ ও সংখ্যা কত হবে সেই সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে । যারা অভিনয় করেন অর্থাৎ অভিনেতাগণের যথাযথ চালচলন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । নাট্যমণ্ডপের স্থান বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৭-১৪৮) । বাচিক অভিনয় সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । নাট্যে ব্যবহৃত বৃত্ত বা চন্দ্রসমূহ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯) ।

অলঙ্কারশাস্ত্রে নাট্যশাস্ত্রের অবদান: অলঙ্কারশাস্ত্রের আদি ভরতমুনি এখনও পর্যন্ত সকল পণ্ডিতবর্গের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছেন । কৃষ্ণাশ্ব, শিলালিন নটসূত্রের পাণিনির ব্যাকরণ স্বীকৃত হলেও তাঁদের গ্রন্থ অবলুপ্ত । নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতারূপে ভরতের পূর্ববর্তী কাশ্যপ কোথাও কোথাও উল্লিখিত হয়েছেন । ভরতমুনির নিজস্ব উদ্ধৃতি দিয়েছেন ‘অত্র আনুবাংশৌ শ্লোকে ভবতঃ ।’ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে তার পূর্বকাল থেকেই ভারতবর্ষে নাট্যশাস্ত্রের প্রচলন ছিল (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৫) । আলঙ্কারিক রাজশেখরের মতে ভরতমুনিই রূপক বা দৃশ্যকাব্যের আদি স্রষ্টা । “রূপক নিরূপনীয়ং ভরতঃ ।” ভরত ৬০০০ শ্লোকে তাঁর নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন । নাট্যশাস্ত্রের ৩৬ টি অধ্যায় বর্তমানে পাওয়া যায় । নাট্যশাস্ত্র কারিকা, গদ্যাংশ, সূত্রভাষ্য এবং আর্য্য ও অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত । তাঁর নাট্যশাস্ত্রকে ভারতীয় ললিতকলার ‘বিশ্বকোষ’ বলা হয় (বন্দ্যোপাধ্যায় ১০-১১) ।

ভারতীয় নাট্যকলায় ভারতীয় সংস্কৃতির উপাদান: এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য নাট্যকলা হলেও এতে নৃত্য, গীত ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে । প্রসঙ্গক্রমে এতে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বহু তথ্য পাওয়া যায় । এই সকল তথ্যের সন্নিবেশ নিতান্ত আকর্ষক নয় । নাট্যকলা সংক্রান্ত এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব রয়েছে ।

ভারতীয় নাট্যকার, কবি ও আলঙ্কারিকদের মধ্যে ভারতের নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব: ভারতীয় সমাজের কাব্যকারদের মধ্যে ভারতের নাট্যশাস্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল তা উদাহরণের মাধ্যমেই প্রমাণ করা যেতে পারে।

কালিদাস: কালিদাসের কাব্যে ভারতের নাট্যশাস্ত্রের নিয়মের অনুসরণ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। ‘কুমারসম্ভবে’ শিব পার্বতী তাঁদের বিবাহ উপলক্ষে নাট্যানুষ্ঠান দেখেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। এতে বিভিন্ন বৃত্তি ও সন্ধির সংযোগের কথা আছে। সংগীত রসানুসারী ছিল বলে উক্ত হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৬)।

বিশাখ দত্ত: বিশাখ দত্তের ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকে রাক্ষস রাজনৈতিক সংহিতাকে নাট্যকারের কাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং নাট্যগ্রন্থের বর্ণনা করেছেন। এ ধারণা নাট্যশাস্ত্র প্রভাবিত মনে হয় (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩২)।

ভবভূতি ও মুরারি: ভবভূতি ‘মালতীমাধব’ ও মুরারির ‘অনর্থরাঘব’ এই শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ ও বিধির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে সহজেই মনে করা হয় (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২৫)।

পণ্ডিতপ্রবর কীথ এর উক্তি: পণ্ডিতপ্রবর কীথ যথার্থই বলেছেন যে, পরবর্তীকালের যে নাট্যগ্রন্থের কোন নতুন আকার সৃষ্ট হয় নাই নাট্যশাস্ত্রের প্রভাবে। এই শাস্ত্রকে কয়েক প্রকারের নাট্যগ্রন্থ হিসেবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তার বাহিরে কেউ যায় নি বা যেতে সাহস পান নি। সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থ যে বিয়োগান্তক নয়, তা নাট্যশাস্ত্রের প্রভাবপ্রসূত বলে মনে হয়। ঐ গ্রন্থে এরূপ রচনা যে নিষিদ্ধ তা পূর্বে লক্ষ্য করা গিয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৬)।

শাঙ্গদেব: শাঙ্গদেবের ‘সঙ্গীতরত্নাকরে’ বিশেষত এর নর্তনাধ্যায় এ নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব স্পষ্ট। শাঙ্গদেব ভারতের নামোল্লেখও করেছেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নৃত্য, নাট্য, গীত প্রভৃতির আলোচনায় ও বিশ্লেষণে নানা ভাষা, বিবিধ আচার ব্যবহার, বেশভূষা, মানসিকতা প্রভৃতির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ স্বাভাবিক (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯-২০)।

ভাষা: ভারতের নাট্যশাস্ত্রের পঞ্চদশ অধ্যায় ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে যথাক্রমে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। এই বিবরণ থেকে সেকালে এই ভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা হয় (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪)। প্রবাসমূহে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষার নিদর্শন এই ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের পক্ষে মূল্যবান। ‘বর্বর, কিরাত, অঙ্গ, শবর ও চণ্ডাল’ প্রভৃতি জাতির ভাষা কিরূপ ছিল তা জানা যায় (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১-৩২)। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার প্রধান লক্ষণ গুলিও সূচিত হয়েছে যেমন: ‘গঙ্গা ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলের ভাষা এ- কারবল্ল, বিন্দ্যপর্বত ও সমুদ্রের অন্তর্বর্তী ভাষা ন- কারবল্ল ইত্যাদি’ (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩-৩৫)।

বেশভূষা: বেশভূষা প্রসঙ্গে তথ্য এর জন্য এই গ্রন্থ অপরিহার্য। কারণ এক প্রকার অভিনয়ের নামই আহার্য। অর্থাৎ যা সাজপোশাকের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন অঞ্চলের নারীগণের কেশবিন্যাস, যন্ত্রাদির রং সম্বন্ধে পছন্দ- অপছন্দ, নারী- পুরুষের ব্যবহৃত আভরণ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য ভারতমুনির নাট্যশাস্ত্রে আছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০)।

রঙ্গালয়: রঙ্গালয় ত্রিবিধ। বিকৃষ্ট, চতুরশ্র ও এশ্র। আয়তন অনুসারে রঙ্গালয় তিন প্রকার - জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও অবর। এদের দৈর্ঘ্য, হাত ও দণ্ড অনুসারে যথাক্রমে: ১০৮, ৬৪ ও ৩২ রঙ্গালয়, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি নির্মাণ পদ্ধতি থেকে ঐ যুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যা সম্পর্কে জানা যায়। এমনটি আজও কতক রঙ্গালয় তৈরি করা হয় ভারতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত পরিমাপ অনুযায়ী (চৌধুরী ২১)।

অভিনেতা: উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে অভিনেতা ছিলেন তিন প্রকারের। নাট্যশাস্ত্র কি রকম লোকের কি রকম ভূমিকা হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ করেন। অভিনেতার পোশাক নিয়েও নাট্যশাস্ত্র সতর্ক। প্রাসঙ্গিক রসের অনুকূল রং আবশ্যিক। ভারতীয় সংস্কৃতিতে অভিনেতার এই বিভেদ সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয় (বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫)।

কারুশিল্প: নাট্যশাস্ত্রে ‘পুস্ত’ শব্দে রঙ্গমঞ্চে ব্যবহার করা অভিনয়ের সহায়ক কিছু পদার্থকে বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার পুস্তের বর্ণনা থেকে সেই সময়ের কারুশিল্প সম্পর্কে ধারণা করা যায় (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪-৩৫)। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় রঙ্গমঞ্চে ব্যবহার্য অস্ত্র শস্ত্র কঠিন উপাদানে নির্মিত হবে না। ভারী অস্ত্র- শস্ত্র এর পরিবর্তে গুল্ম জাতীয় ঘাস, বাঁশ ব্যবহার করতে হবে (বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৯)।

মনস্তাত্ত্বিক বিষয়: ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভারতের নাট্যশাস্ত্রের নাট্যরচনায় ও অভিনয়ে মনোবিদ্যার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। উক্ত রস প্রসঙ্গে ভাবাদির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে। নায়িকাগণের শ্রেণি বিভাগ, তাঁদের মানসিক অবস্থার উল্লেখ প্রভৃতিতে নাট্যশাস্ত্র মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থাকারের যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় আছে। প্রেক্ষক, অভিনেতা, সমালোচক প্রভৃতির বিবরণে গ্রন্থাকার সূক্ষ্ম রুচি ও বিচার বিশ্লেষণে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। এই বিষয়ে নাট্যশাস্ত্র সংশ্লিষ্ট যুগের দর্পণ স্বরূপ (বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬-২৮)।

কামকলা ও ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব: নাট্যশাস্ত্রে বিশেষত পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে নানা তথ্য আছে। কামসূত্রে এই বিষয়ে যে তথ্য আছে নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা যেন তার পরিপূরক (নন্দী ২৮)।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য: নাট্যশাস্ত্রের প্রণেতা নাট্যের অবাধ অভিনয়ের জন্য নাট্যমণ্ডপ স্থাপনের জন্য বিভিন্ন কলা কৌশলের ব্যবহার ও প্রয়োগ করেছেন। সেখানে রঙ্গমঞ্চ, রঙ্গশীর্ষ, রঙ্গালয় প্রভৃতির জন্য নির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এ থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায় তখনকার সময়ের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এবং চিত্রকলাবিদ্যা সম্পর্কেও বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায় (বন্দ্যোপাধ্যায় ২১)।

রসসূত্র: ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে নাট্যশাস্ত্রের দান অসামান্য। পরবর্তীকালে রসের ব্রহ্মস্বাদসহোদরঞ্চ, চমৎকারিত্ব, লোকান্তরত্ব প্রভৃতি যে সকল নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা আছে তার মূল হলো ভারতের রসসূত্র।

বিভিন্ন জাতির পরিচয়: ভারতে যে নানা উপজাতির বাস ছিল সে সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্র থেকে জানা যায়। নাট্যশাস্ত্রে আমরা ‘কাম্বী, কোশল, বর্বর, অন্ধ্র, আভীর, শবর, শক ও পহলব’ বিভিন্ন উপজাতির নাম পাওয়া যায়। ‘চণ্ডাল ও যবনের’ উল্লেখ ও বিশদ বিবরণ আছে নাট্যশাস্ত্রে। নাট্যশাস্ত্রে প্রসঙ্গক্রমে সেনাপতি, মন্ত্রী, সচিব প্রভৃতির গুণাবলির উল্লেখ আছে। সেকালের রাজার পক্ষের লোককে বিনা ব্যয়ে নাট্যানুষ্ঠান দেখানো মহাবল জনক ছিল বলে মনে করা হয়। তাই আমরা নাট্যশাস্ত্র হতে বিভিন্ন জাতির পরিচয় এবং তাদের কর্মজীবন সম্পর্কেও ধারণা পাই (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২-৩৩)।

নাট্যগণের পরিচয়: উচ্চস্তরের লোকদের নিয়ে ঠাট্টা- তামাসা করতো বলে নাট্যগণ সমাজে হয়ে বলে পরিগণিত হতো। ‘নট’ শব্দের প্রতিশব্দ শৈলুষ, একে বলা হয়েছে জায়া জীব অর্থাৎ যে স্ত্রীকে অন্যের সঙ্গে রেখে জীবিকা অর্জন করে। গণিকারা নটীর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। এর থেকে খুব সহজেই অনুমান করা হয় গণিকাদের সামাজিক মর্যাদা নিম্ন মানের ছিল। কিন্তু নাট্যকলা ছিল আদৃত এবং কলাতিজ্জগৎ রাজা প্রভৃতির কাছ থেকে সমাদর লাভ করতো (চৌধুরী ১৯-২০)।

অলঙ্কারশাস্ত্রে নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব: অলঙ্কারশাস্ত্র নাট্যশাস্ত্রের বিশেষত এই শাস্ত্রোক্ত রসসূত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট ভারতের নাট্যশাস্ত্রেই প্রথম রসসূত্রটি লিপিবদ্ধ হয় বিভাব অনুভাব ব্যভিচারী ভাবের। সংযোগে রসনিষ্পত্তি ঘটে। ভরত আটটি রস এবং আটটি স্থায়ী ভাবের ব্যাখ্যা করেছেন। ভরতমুনির মতে, ‘শৃঙ্গার থেকে হাস্য, রৌদ্র থেকে করুণ, বীর থেকে অদ্ভুত এবং বীভৎস থেকে ভয়ানক রসের উদ্ভব ঘটে’ (বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩-২৪)।

রস কি পদার্থ তা বোঝাতে গিয়ে ভরত মুনি বলেছেন যেমন: ‘নানারকম ব্যঞ্জন ঔষধি এবং জিনিসের পরস্পর সংযোগে ভোজ্য রসের নিষ্পত্তি হয়। পুড় প্রভৃতি দ্রব্য, ব্যঞ্জন ও ঔষধির যোগে বাড়বাদি রস তৈরি হয়।’ ভরত

মুনির এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যাচ্ছে রস আনন্দ নয়, রস হলো আনন্দ। আরো সহজ ভাষায় বলা যেতে পারে রস অনুভূতি নয়, অনুভূতির বিষয়। নাট্যপ্রসঙ্গে ভরতমুনি যে রসের কথা বলেছেন তা কাব্যের ক্ষেত্রের গৃহীত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সহজেই অনুমান করা হয় শুধু গৃহীত নয়, রস কাব্যের আত্মা বলে স্বীকৃত হয়েছিল। ভারতের এই রসের অর্থের প্রাধান্য সকল আলঙ্কারিক গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়।

আলঙ্কারিক শ্রীরূপ তাঁর গ্রন্থ ‘নাটকচন্দ্রিকা’ প্রণয়নে যে ভারতের নাট্যশাস্ত্র ও শিঙ্গভূপালের রসার্ণবসুধাকর গ্রন্থের অনুসরণ করেছিলেন যেমন:

‘বীক্ষ ভরতমুনিশাস্ত্রং রসপূর্বসুধাকরঞ্চ রমণীয়ম্।

লক্ষণমতিসংক্ষেপাদি লিখ্যতে নাকৈস্যেদম্।’

বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন -

‘বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।’

রস যার আত্মা সেই বাক্য কাব্য। তাঁর মতে ‘রস ছাড়া কাব্যের অস্তিত্বই নেই’ (বন্দ্যোপাধ্যায় ৮-১০)।

উপসংহার: অবশেষে বলা যায় যে, নাট্যকলার চর্চা ও বিস্তারে সংস্কৃত নাট্যকারগণ তাঁদের নাট্যপ্রতিভার দ্বারা বিভিন্ন উৎস থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে কিংবা কাহিনির বীজটুকু নিয়েই বস্তু নির্মাণক্ষম রচনামূল্যের মাধ্যমে নাট্যকলাকে করে তুলেছেন মহীরুহ সমতুল্য। নাট্যশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় শুধুমাত্র নাট্যকলা অর্থাৎ অভিনয়, শিল্প, নৃত্য, সংগীত, অলঙ্কারশাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রসঙ্গক্রমে এই গ্রন্থে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বহু তথ্য পাওয়া যায়। ভারত মুনির নাট্যশাস্ত্রে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নৃত্য, নাট্য, গীত, ভাষা, বেশভূষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির চিত্র নাট্যশাস্ত্রে চিত্রায়িত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

চৌধুরী, দর্শন। *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস*। পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫।

নন্দী, ড. সুধীর কুমার। *নন্দনতত্ত্ব*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৯।

প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। *ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস*। স্বামী আদ্যানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুরেশচন্দ্র (সম্পাদনা)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র* (১ম খণ্ড)। বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ১৯৮২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৫।

ভট্টাচার্য, শ্রী বিষ্ণুপদ। *প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের ভূমিকা*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৬০।

কবিরাজ, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত)। *সাহিত্যদর্পণ*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র তর্কবাগীশকৃত (টীকাসহ), ২০১৩।

দাস, পুলিন। *মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ*। উদ্দালক পাবলিশিং হাউস, ১৩৯৮।

বামন (সম্পাদিত)। *কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি*। সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩।

বসু, প্রসূন (প্রধান সম্পাদক)। *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*। নবপত্র প্রকাশন, ১৯৫৯।

শিঙ্গভূপাল (সম্পাদিত)। *রসার্ণবসুধাকর*। চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ২০০৪।

শ্রীরূপগোস্বামী (সম্পাদিত)। *নাটকচন্দ্রিকা*। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অনু:), শ্রীরাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।

উপকথায় অন্তরিত জনজীবন : প্রসঙ্গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ‘কালকেতু উপাখ্যান’

কাকলী পাল *

প্রতিপাদ্যসার: মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যধারার চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কবিগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তববাদী চিত্রাঙ্কনে তিনি অনন্য। তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে জীবনবাস্তবতার প্রত্যক্ষ রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য দেবদেবীর মাহাত্ম্যপ্রচার হলেও তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার বিভিন্ন দিক এতে প্রতিফলিত হয়েছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের ‘কালকেতু উপাখ্যানে’ দেবমাহাত্ম্য প্রচারের আড়ালে ব্যাধ কালকেতুর জীবনের বিভিন্ন দিক এবং তৎকালীন সমাজবাস্তবতার নানা চিত্র ফুটে উঠেছে। মুকুন্দরাম ‘কালকেতু উপাখ্যানে’র পশুকাহিনি অংশে কালকেতুর নির্যাতনের শিকার পশুগণের করুণ জীবনচিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে তৎকালীন সামন্তশাসিত সমাজব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিভিন্ন চিত্রই যেন তুলে ধরেছেন। জীবজন্তু ও পশুপাখিকে নিয়ে রচিত উপকথার অন্তরালে মনুষ্যপ্রকৃতির স্বরূপ ও মানবজীবনের কাহিনিই রূপায়িত হয়। উপকথায় পশুপাখির চরিত্রগুলো মানবচরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এই প্রবন্ধে ‘কালকেতু উপাখ্যানে’ বর্ণিত পশুকাহিনির সাথে জনজীবনের নানা অনুষ্ণের সম্পৃক্ততা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা

প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আদিমকালে মানুষ যখন অরণ্যচর ও গুহাবাসী ছিল তখন থেকেই মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে বশীভূত করে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ ও ব্যবহার করে নিজের প্রয়োজন মিটিয়েছে। সাহিত্যের মধ্যেও প্রকৃতির নানা অনুষ্ণের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মানুষ, জীবজন্তু, পশুপাখি, অরণ্য, নদ-নদী প্রভৃতি সবকিছুই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মানবজীবনের পাশাপাশি প্রকৃতির নানা উপাদানের অস্তিত্বও বিরাজমান। কখনো প্রকৃতির নানাবিষয়ের বর্ণনার আড়ালে মানবজীবনই যেন মুখ্য হয়ে উঠেছে। আবার কখনো প্রকৃতির কোনো উপাদান মানবস্বরূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সৃষ্টিশীল সাহিত্যসম্ভারের বিভিন্ন শাখার মধ্যে উপকথা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যার মধ্য দিয়ে জীবজন্তু ও পশুপাখির রূপকে (Allegory) মানুষের অন্তরিত জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের ‘কালকেতু উপাখ্যানে’ বর্ণিত পশুকাহিনিতে তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন চিত্র, জনজীবনে চর্চিত নানা বিষয় ও মানবচরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।

উপকথা ও মঙ্গলকাব্য

সাহিত্যের ক্ষেত্রে মৌখিক ও লিখিত দুটি ধারা পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে মৌখিক ধারাটি প্রাচীন। মৌখিক ধারাটির সৃষ্টি লোকমুখে এবং মুখে মুখেই তা প্রচার লাভ করেছিল। লোকমুখে সৃষ্ট এবং লোকমুখে প্রচলিত এই সাহিত্যগুলোকেই লোকসাহিত্য বলা হয়। সাহিত্য সৃষ্টির প্রথমদিকে লোকসাহিত্যগুলোর কোনো লিখিত রূপ ছিল না। পরবর্তীতে এই সাহিত্যগুলোকে অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করার তাগিদেই লিখিত রূপে প্রকাশ করা হয়। লোকসাহিত্যের অন্তর্গত লোককথার অন্যতম শাখা উপকথা। জীবজন্তু ও পশুপাখির চরিত্র অবলম্বনে যেসব কাহিনি

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

রচিত হয় সেগুলোকেই উপকথা বলা হয়। জীবজন্তুর এসব কাহিনির অন্তরালে মানুষ নিজের কাহিনি ও স্বরূপকেই প্রকাশ করেছে। শুধু পশুপাখির চরিত্রই উপকথার বিষয়বস্তু নয়, মানবচরিত্রও এখানে উঠে এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে পশুপাখি রূপক মাত্র। লোককথার আরেকটি শাখা ব্রতকথা। ব্রতকথার উদ্দেশ্য দেবমাহাত্ম্যকীর্তন। বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর ব্রতের সঙ্গে সম্পর্কিত কাহিনী অবলম্বনে ব্রতকথাগুলো রচিত। এই ব্রতকথাগুলো থেকেই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি। মঙ্গলকাব্য হলো দেবদেবীর মাহাত্ম্যপ্রচারধর্মী ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য। ব্রতকথা থেকে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব হলেও অনেকসময় নতুন বিষয়বস্তু অবলম্বনেও মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। দেবদেবীর লীলামাহাত্ম্যপ্রচারধর্মী ধর্মবিষয়ক এই মঙ্গলকাব্যগুলোতে লোকসাহিত্যের নানা লোক-উপাদানের অস্তিত্ব বিরাজমান। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, “লোক-সাহিত্যের মৌখিক ধারা (oral tradition)-র উপর ভিত্তি করিয়াই মঙ্গলকাব্যের লিখিত (written) ধারার সৃষ্টি হইয়াছে। লোক-সাহিত্যের যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছে, তাহা প্রধানত ব্রতকথা হইলেও লোক-কথা (folk-tale)-র বহু বিভিন্ন উপাদানও আসিয়া কালক্রমে ইহাতে সংমিশ্রণ লাভ করিয়াছে” (৯৩)।

উপকথার গুরুত্ব

সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হিসেবে উপকথার মূল্য অপরিসীম। উপকথায় জীবজন্তুর কাহিনির আড়ালে মানবজীবনের কাহিনিই বর্ণিত হয়। “প্রাগৈতিহাসিক যুগেই মানুষের মনে যখন কাহিনীর উদ্ভব ঘটে, তখন সে কাহিনীর স্বাভাবিক নায়কত্ব আরোপিত হয় সিংহ, ব্যাঘ্র, শূগাল, বৃষ প্রভৃতি প্রাণীর উপর। এই সব আরণ্যক কাহিনী রচনার অনেক পরে প্রাকৃতিক শক্তিকে অবলম্বন করে অলৌকিক কাহিনীর উদ্ভব ঘটে, এরও অনেক পরে কাহিনীর মধ্যে মানুষই নিজে নায়ক সেজে বসে” (মুহম্মদ আবদুল খালেক, ৩৯৮)। উপকথার মাধ্যমে মানবসভ্যতার বিবর্তনের ধারায় মানুষের পাশবিক আচরণের পরিবর্তন ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের ইতিহাস উঠে আসে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ ও প্রাণীর জীবন-যাপন ও আচরণে তেমন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষ সভ্য হতে শেখে যার প্রভাব সাহিত্যেও পরিলক্ষিত হয়। আশ্রাফ সিদ্দিকীর মতে,

আদিম সমাজ প্রকৃতির নিকট সম্পর্ক ছিল বলে জীবজন্তুও তাদের কাছে অত্যন্ত আপন জন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। Animism বা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী আদিম মানবসভ্যতা স্বভাবতই জীবজন্তুর গল্পে নিজেদের প্রকৃতিকেই আরোপ করেছে। মানুষের বোকামি অসঙ্গতি তাই স্বভাবতই জীবজন্তুর কাহিনীতে স্থান করে নিয়েছে।... জীবজন্তু মানুষের গুণপ্রাপ্ত (২৪২)।

সেই হিসেবে উপকথাগুলো মানবজীবনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিরূপ। জনজীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিফলন ঘটে এই কাহিনিগুলোতে। উপকথার কাহিনিগুলোর আড়ালে সমকালীন সামাজিক অবস্থা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে জনজীবনের চালচলিত্রও অঙ্কিত হয়। সমাজবাস্তবতা সম্পর্কিত পাঠ বিশ্লেষণে উপকথাগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবজন্তুর চরিত্রে মানবিক গুণ আরোপিত হওয়ায় সমকালীন সমাজবাস্তবতার আলোকে মানবচরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও জানা যায়। সমকালীন সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন ঘটলেও ভারতীয় উপকথাগুলো বিভিন্ন দেশে প্রচার লাভ করেছে। উপকথাগুলোর পাঠভেদে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে। এসব উপকথাগুলোর বৈজ্ঞানিক তুলনামূলক আলোচনায় নৃতত্ত্বের নানা মূল্যবান তথ্য, ভারতবর্ষের সাথে বিভিন্ন দেশের ঔপনিবেশিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জানা যায় (আশ্রাফ সিদ্দিকী, ১৪)। এভাবেই লোকসমাজে জন্ম নেওয়া উপকথাগুলো দেশ-কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন হয়ে উঠে।

কালকেতু উপাখ্যান

মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলকাব্য অন্যতম। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের নরখণ্ডে দুটি উপাখ্যান আছে- (১) কালকেতু উপাখ্যান (২) ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। ‘কালকেতু উপাখ্যানে’ কালকেতু নামে এক ব্যাধের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর চণ্ডীদেবীর পূজাপ্রচারের উদ্দেশ্যে মর্ত্যে এসে এক ব্যাধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। মর্ত্যে তার নাম হয় কালকেতু। নীলাম্বর-পত্নী ছায়া মর্ত্যে এসে ফুল্লরা নামে পরিচিত হলো। মর্ত্যজীবনেও তারা স্বামী-স্ত্রী। ব্যাধ কালকেতুর জীবন ও জীবিকা অরণ্যে পশুশিকারের ওপর নির্ভরশীল। কালকেতুর পশুশিকারজনিত অত্যাচারে বনের পশুরা অতিষ্ঠ হয়ে চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হলো। চণ্ডীদেবী তাদেরকে অভয় প্রদান করে লুকিয়ে রাখলেন এবং নিজে একটি স্বর্ণগোধিকার রূপ ধারণ করলেন। কালকেতু বনে গিয়ে কোনো শিকার না পেয়ে স্বর্ণগোধিকাটি নিয়ে ঘরে ফিরল। ফুল্লরা ও কালকেতুর অবর্তমানে চণ্ডীদেবী কালকেতুর গৃহে ষোড়শী যুবতীর রূপ ধারণ করলেন। গৃহে ফিরে চণ্ডীর যুবতীরূপ দেখে সপত্নী আগমনের আশঙ্কায় ফুল্লরা ও কালকেতুর মধ্যে অনেক বাগ্বিতণ্ডা হলো এবং উভয়েই নারীরূপী চণ্ডীদেবীকে নিজগৃহে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানাল। অবশেষে দেবী নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে কালকেতুকে অনেক ধন-সম্পদ প্রদান করে গুজরাটে নগর পত্তন করতে বললেন। কালকেতু কর্তৃক গুজরাটে নগর পত্তনের পর দেবী তাকে গুজরাটের অধিপতি বানিয়ে দিলেন। গুজরাট নগরের অধিপতি হওয়ার পর ভাঁড়দত্ত নামে এক ধূর্তলোকের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কলিঙ্গরাজ কর্তৃক কালকেতু বন্দি হয়। অবশেষে চণ্ডীদেবীর কৃপায় সে মুক্তিলাভ করে এবং মর্ত্যলোকে চণ্ডীপূজা ও চণ্ডীমাহাত্ম্য প্রচার লাভ করে।

‘কালকেতু উপাখ্যানে’ অন্তরিত জনজীবন

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের ‘কালকেতু উপাখ্যানে’ কিছু পশ্চরিদ্র আছে যাদের আচরণে মানবচরিত্রের ছাপ পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, “কবির চিত্তে মনুষ্যসমাজ এত স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও গাঢ় বর্ণে মুদ্রিত ছিল যে,-জলে স্থলে, গুল্ম লতায় এবং ইতর জীবনসমূহের মধ্যেও তিনি সতত মানবীয় ভাবই প্রত্যক্ষ করিতেন” (৪৩৬)। ‘কালকেতু উপাখ্যানে’র কালকেতুর মৃগয়া, সিংহের নিকট পশুগণের নিবেদন, সিংহের নিকট বাঘিনীর আবেদন, পশুরাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ, পশুগণের ক্রন্দন, চণ্ডীর নিকটে পশুগণের দুঃখ নিবেদন, চণ্ডীর প্রশ্ন ও পশুগণের উত্তর প্রভৃতি অংশে পশুগণের যাপিত জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। ‘কালকেতু উপাখ্যানে’র পশুগণ যেন পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দিক থেকে মনুষ্যসমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। তারাও যেন মানুষের মতোই সমাজবদ্ধ জীব, পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ। পরিবারের সদস্যদের প্রতি যেন তারা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। কালকেতুর নির্যাতনে পরিবারের সদস্যদের হারিয়ে পশুগণের বিলাপের যে চিত্র মুকুন্দরাম এঁকেছেন তার আড়ালে মনুষ্যসমাজেরই পারিবারিক বন্ধনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। পশুগণের আকুতি ও ক্রন্দনের অন্তরালে মানবাত্মার আত্ননাদই প্রতিফলিত হয়েছে। মুকুন্দরাম সমকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষের ওপর অত্যাচারের কাহিনি পশুগণের রূপকে (Allegory) তুলে ধরেছেন। তাঁর কাব্যের বিভিন্ন পশু সমাজের এক একটা শ্রেণির প্রতিনিধি। পশুগণের ক্রন্দন অংশে পশুরাজ সিংহ থেকে শুরু করে বাঘ, শরভ, গণ্ডার, কোক (নেকড়ে), ভালুক, বরাহ, হাতি, বানর, হরিণ, শজারু, নকুল পর্যন্ত কেউই কালকেতুর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এই পশুগণ সবাই সেই সময়কার নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি। আর কালকেতু অবতীর্ণ হয়েছে অত্যাচারী শাসকের ভূমিকায়। পশুগণের এই ক্রন্দন যেন সেইসব শোষিত, নির্যাতিত মানুষেরই বিলাপ। কবির নিপীড়িত, নির্যাতিত জীবনের স্বীয় অভিজ্ঞতার বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় কাব্যের এই অংশে। পশুগণের যার যা কিছু সহায় সম্পদ বা যা কিছু ক্ষমতা সেটাই যেন তাদের জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াল। এটা যেন নিরীহ প্রজাদের জীবনের সেই চিত্র, যার যা কিছু সম্পদ আছে তা দিয়েই রাজকর পরিশোধ করতে হবে। রূপক

চরিত্রে প্রজানিপীড়নের বাস্তব চিত্র এটি। আবার সহায় সম্বলহীন সাধারণ পশুগণও নির্যাতনের হাত থেকে পরিদ্রাণ পায়নি সেকালের নিঃস্ব অসহায় প্রজার মতো।

‘কালকেতু উপাখ্যানে’ কালকেতুর শিশুবয়স থেকে পশুগণের সাথে তার বিভিন্ন ধরনের আচরণের চিত্র দেখা যায়। বাল্যকালেও সে খেলার ছলে পশুগণের ওপর অত্যাচার করত। বাল্যকাল থেকেই সে পিতার সঙ্গে শিকারে যেত। শিকার করার বিভিন্ন কৌশল তার আয়ত্তে ছিল। পশুগণের ওপর কালকেতুর বিভিন্ন ধরনের অত্যাচারের চিত্র ফুটে উঠেছে ‘কালকেতু উপাখ্যানে’র বিভিন্ন অংশে। কালকেতু যেন বৃহন্নলা অর্থাৎ ক্লীবত্বপ্রাপ্ত অর্জুনের মতো কুরুরাজসেনাতুল্য পশুসেনাদের বধ করে চলেছে। কালকেতুর পরাক্রমের চিত্র-

অনুদিন পশু বধে বীর মহাবল।

কুরুরাজ সেনা যেন বধে বৃহন্নল।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ২২)।

কালকেতুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ, বিপর্যস্ত পশুগণ ক্রন্দন করতে করতে তাদের মর্মবেদনা বর্ণনা করে গেছে। পশুসমাজে হাতির বড় নাম-ডাক। হাতি যখন বলে-‘বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর’ তখন একটা বিশালদেহী শক্তিশালী পালোয়ান টাইপ চরিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠে। কিন্তু সেও কালকেতুর শক্তি ও কৌশলের কাছে বিপর্যস্ত। হাতিকে তার মহামূল্যবান দাঁতের জন্য কালকেতুর নির্যাতনের শিকার হতে হলো। যমের বাহন হিসেবে মহিষের একটা আলাদা পরিচয় ও সম্মান আছে। তবুও মহিষ শিং-এর জন্য কালকেতুর নিপীড়নের শিকার হলো। মহিষের মর্যাদা ও ক্ষমতা কালকেতুর কৌশলের কাছে তুচ্ছ। চমরী গরুর শত্রু হলো তার নিজের লেজ। কালকেতু চমরী গরুর লেজ কেটে তা দিয়ে চামর বানিয়ে বিক্রি করে। চমরী গরু লেজের জন্য কালকেতুর নির্যাতনের শিকার হলো। গণ্ডারের দুঃখের কারণ তার খড়গ। গণ্ডারের খড়গ মানুষ তর্পণের জন্য কেনে। গণ্ডারের খড়গ-কোষে তর্পণের সময় জলদান করলে পিতৃলোকের (মৃত পূর্বপুরুষ) অনন্ত তৃপ্তি লাভ হয়। খড়গের জন্যই কালকেতু গণ্ডার শিকার করে। হাতি, মহিষ, চমরী, গণ্ডার প্রভৃতি পশু সামন্তশাসিত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধি। সামন্তশৃঙ্খলে আবদ্ধ প্রজাগণ যেমন তাদের সম্পদ দিয়ে রাজকর পরিশোধ করত, নইলে নির্যাতনের শিকার হতে হতো পশুগণও তেমনি তাদের সম্পদের জন্য কালকেতুর অত্যাচারের শিকার হলো। রাজশক্তির কাছে প্রজার জীবন, মান-মর্যাদা সবকিছুই তুচ্ছ ছিল। সামন্তশৃঙ্খলে আবদ্ধ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অবস্থা সম্পর্কে ক্ষুদিরাম দাস বলেন, “কবিকঙ্কণ সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রশাসন-ব্যবস্থা ও প্রজা-সম্পর্কের প্রায় পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সন্নিবেশ করেছেন... এতে নিঃসন্দেহে ষোড়শ শতাব্দীর বড় রাজা ও ছোট রাজা বা জমিদারদের প্রশাসন-কার্যাবলী ও প্রজাদের অবস্থা চিত্রিত হয়েছে।... প্রজা সম্পর্কে জমিদার প্রায় সার্বভৌম রাজার মতই থাকতেন। কিন্তু বড় রাজার কাছে তাঁকে কর পাঠাতে হ’ত, আর জমিদারিতে গুরুতর অন্যায় ঘটলে বা জমিদার তাঁর নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে কিছু অধিকার করলে রাজা সহ্য করতেন না” (৩৮)।

কালকেতু খড়গের জন্য গণ্ডকের স্বামী ও ভাইকে হত্যা করেছে। স্বামীহারা গণ্ডকের দুরবস্থার চিত্র-

স্বামীরে বর্ণিয়া কান্দে গণ্ডকি রঙিকা।

সদাই শোঙরে শুভা মঙ্গলচঙিকা।।

প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক।

উদরের জ্বালা আর সোদরের শোক।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ৩০)।

এখানে পুরুষতান্ত্রিক বাঙালি সমাজে নারীর দুর্গতির চিত্র ফুটে উঠেছে। তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থা মোটেও ভালো ছিল না। স্বামীকে হত্যা করায় বিধবা স্ত্রী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। স্বামী আর সহোদরকে

হারানোর শোকের পাশাপাশি তার এখন উদরের জ্বালাটা বড় হয়ে উঠেছে। তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক বাঙালি সমাজে পুরুষই ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। পুরুষের ওপর নারীর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা এবং নিরাপত্তার বিষয়টি এখানে উঠে এসেছে। যদিও কিছুক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন- ফুল্লুরা, নিদয়া, হিরা। এরা বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শ্রমজীবী নারী।

ভালুক চরিত্রে অসহায় নিরীহ সাধারণ প্রজার চিত্র ফুটে উঠেছে। সামান্য সাধারণভাবে আহার করে কোনো রকমে দিনাতিপাত করে সে। তারপরও তার দুর্গতির শেষ নেই। নিপীড়িত ভালুক বলে-

উই চারা খাই আমি নামেতে ভালুক।

নেউগী চৌধুরী নই না করি ভালুক।।

সাত পুত্র নিলা বীর বান্ধিয়া জাল পাশে।

সবংশে মজিনু মাতা তোমার আশ্বাসে।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ৩০)।

অনেক সমালোচক মনে করেন ভালুকের এই বর্ণনাটি লেখার সময় কবির তাঁর প্রভু গোপীনাথ নিয়োগীর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। গোপীনাথ নন্দী ছিলেন সজ্জন, প্রজাবৎসল ভালুকদার, যিনি রাজরোষে বিপাকে পড়ে বন্দি হন। ভূদেব চৌধুরীর মতে, “পশুজীবনে মানবাচরণের কাল্পনিক বাতাবরণ রচনার পছন্দ, মুকুন্দরামের অন্তর্ব্যথিত অভিজ্ঞতার স্মৃতি যেন এখানে কথা বলে ওঠে। ‘ভালুক’ধারী গোপীনাথ ‘নেউগি’-র দুর্দশার স্মৃতি!” (আশিসকুমার দে ও বিশ্বনাথ রায় সম্পা., ১৪৬)।

শরভ সিংহের চেয়ে বলবান এক প্রকার পৌরাণিক মৃগ। অন্য মৃগগণ যেখানে চার পা-বিশিষ্ট সেখানে শরভের আট পা। তার বিশেষ কুলগৌরব এটি। আট পা-বিশিষ্ট শরভ অতিশয় দ্রুতধাবনের ক্ষমতা রাখে। এই বিশেষ গুণ থাকা সত্ত্বেও সে কালকেতুর কাছে পরাজিত হয়। বারশিঙ্গা, তুলারু, ঘোড়ারু, ঢোলকান প্রভৃতি নানাজাতের হরিণেরও আলাদা আলাদা গুণ রয়েছে। তবু তারা কালকেতুর কাছে অসহায়। ধরায় লুটিয়ে অসহায় হরিণ আত্ননাদ করছে। বিধাতার ওপর তার অভিমান কেন বিধাতা এমন পাপবংশে তার জন্মগ্রহণ করালেন, যে বংশে পশুগণ নিজের মাংসের জন্য ভুবনের বৈরী অর্থাৎ শত্রুতে পরিণত হয়। হরিণের জিজ্ঞাসা-

কেন হেন জন্ম বিধি কৈল পাপবংশে।

হরিণ ভুবনে বৈরী আপনার মাংসে।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ৩১)।

চর্যাপদেও চিত্রটি দেখা যায়- ‘অপণা মাংসে হরিণা বৈরী’। হরিণের নিজের গুণ বা সম্পদই তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

বানর কেঁদে কেঁদে বলে যে তার বৃদ্ধ পিতামহ ছিল রামের সেনাপতি। রাম-রাবণের যুদ্ধে সমুদ্রের ওপর পাথর দিয়ে সেতু বানিয়ে সাগর বন্ধন করে তার বৃদ্ধ পিতামহ দলবল নিয়ে রামচন্দ্রকে সহায়তা করেছিল। সীতা উদ্ধারেও বানরদল রামকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু বিধির লিখনে তার কপালে এত দুঃখ যে কালকেতু তার সাত পুত্রকেই জালে বেঁধে নিয়ে গেল। পুত্রদের হারিয়ে তার কাছে সবকিছু অর্থহীন হয়ে গেল। মিরাস, বিষয়-সম্পত্তি কোনো কিছুতে আর তার আশ্রয় নেই। পিতামহ রাম-সেনাপতি, এই কুলগৌরবও যেন কালকেতুর বীরত্বের কাছে স্তান হয়ে গেল। বানরের দুঃখবর্ণনার চিত্র-

হুক হুক করি কান্দে বানর মর্কটে ।
মিরাসে নাহিক কাজ বীর সনে হটে ।।
বৃদ্ধ পিতামহ ছিল রাম-সেনাপতি ।
সাগর বান্ধিয়া কৈল শ্রীরামের হিতি ।।
কি মোর দারুণ বিধি লিখিল কপালে ।
সাত পুত্র মহাবীর বান্ধি নিল জালে ।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ৩১) ।

এটা যেন স্বজনহারা নির্যাতিত প্রজার বিষয়-সম্পত্তিতে আসক্তি ত্যাগের চিত্র । কৃষকপ্রজা মুকুন্দরামও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে সামন্তপ্রভুদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে কিংবা তাদের নির্যাতনের ভয়ে পূর্বপুরুষের ভিটে-মাটি ও বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়িয়েছিলেন । “কবি নিজের জীবন দিয়ে এবং উন্মুক্ত দৃষ্টিতে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাই তাঁর কাছে মূর্ত হয়েছে” (অরবিন্দ পোদ্দার ১৯৯৯, ৬৩) ।

বরাহের বেলায় দেখা যায়, বরাহ আদি বীর । বরাহ অবতারে বিষ্ণুদেব বন্য শূকরের রূপ ধারণ করেছিলেন । হিন্দুশাস্ত্র মতে, বিষ্ণুদেবতা বরাহ অবতারে হিরণ্যক্ষ নামক রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভূ-দেবী পৃথিবীকে উদ্ধার করেন । সেই আদি বীরের বংশধর হয়েও বরাহ কালকেতুর হাত থেকে নিস্তার পেল না । বরাহ জানায় যে, সে মুখাভোজী । আহাৰ্য বস্তুর জন্য তার কাউকে হিংসা করার প্রয়োজন পড়ে না । কালকেতুর অত্যাচারে তার বংশগৌরবও স্তান হয়ে গেল । সেও একে একে তার স্বামী, শাশুড়ি, ননদ, দেবর, ভাসুর, পুত্র সবাইকে হারাল । একমাত্র পুত্রের শোক সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না । তৎকালীন একান্নবর্তী পরিবারের চিত্রের পাশাপাশি স্বামী-পুত্র, পরিবার-পরিজন হারানো এক বিধবা অভাগীর হৃদয়বেদনা ও জীবন-যন্ত্রণা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে । নিপীড়িত বরাহের জীবনচিত্রে দেখা যায়-

ধরণী লোটায়ে কান্দে বীর আদি বরাহ ।
অরুণ লোচন-যুগে বহে জলধারা ।।
শাশুড়ী-ননদ মরে দেওর ভাসুর ।
পতি গেল রতিসুখ বিধি কৈল দূর ।।
ছিল মাত্র অভাগীর কোলে এক পো ।
পাশরিতে নারি গো তাহার মায়া মো ।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ৩১) ।

সম্ভ্রান্ত বংশীয় কিংবা শক্তিমান হলেও রাজনৈতিক কারণে অনেকেই যে সবংশে নির্বংশ হতো এটা যেন তারই চিত্র । উপকথায় শিয়াল (শিবা) চরিত্রের বিশেষ ভূমিকা থাকলেও কালকেতুর কাছে সে অসহায় । শিয়ালের মাংস থেকে বৈদ্যগণ শিবাঘৃত তৈরি করে যা উন্মাদ রোগের ঔষুধ । শিয়াল সেই মাংসের জন্যই কালকেতুর নির্যাতনের শিকার হলো ।

কালকেতুর অত্যাচারে নকুলও বৃদ্ধবয়সে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাইকে হারিয়ে শোকে কান্না করছে । শোকাক্ত নকুল বলে-

চারি পুত্র মৈল মোর মৈল চারি বি ।
মাগু মৈল বুড়া কালে জীয়া কাজ কি ।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ৩২) ।

বাঙালির জীবনে বৃদ্ধবয়সে পরিবার-পরিজনই একমাত্র আশ্রয় ও ভরসার স্থল । বৃদ্ধ বয়সে পরিবার-পরিজন হারিয়ে নকুল চরিত্রে অসহায়তার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ।

পবনের চেয়ে দ্রুতগামী খরগোশও কালকেতুর হাত থেকে নিস্তার পায় না। জীবন্ত খরগোশ ধরে ঘরে ঘরে বিক্রি করে সে, যেমন করে রাজকর্মচারীরা নিরীহ প্রজাদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের কার্যোদ্ধার করত। সজারু শশারুও কেঁদে কেঁদে ভূমিতে গড়াগড়ি খায়। গর্তের ভিতর লুকিয়ে থেকেও কালকেতুর হাত থেকে তাদের নিস্তার নেই। কালকেতু গর্তের ভেতর পানি ঢেলে দিয়ে তাদেরকে বের করে আনে। এরাও পরিবার-পরিজন নিয়ে কালকেতুর হাতে নির্যাতিত হয়েছে। শজারু বলে-

গাড়ের ভিতরে থাকি লুকি ভালে জানি।

কি করি উপায় বীর তথি দেয় পানী।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ৩১-৩২)।

এখানে কবির সমকালীন জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। প্রজারা যাতে পালাতে না পারে বা আত্মগোপন করতে না পারে সেই কারণে পেয়াদা সবার দুয়ারে হানা দিত। ঠিক তেমনি বনের পশুও যাতে গর্তের ভেতর আত্মগোপন করতে না পারে সেজন্য কালকেতু গর্তের ভেতর পানি ঢেলে তাদের বের করে আনে। ভূদেব চৌধুরীর মতে, “মুকুন্দরামের গভীর জীবন-অভিজ্ঞতা কত নিপুণ ভঙ্গিতে প্রচ্ছন্ন আভাসে সঞ্চারিত হয়ে আছে এ-সব চিত্র-রেখায়নে” (আশিস্কুমার দে ও বিশ্বনাথ রায় সম্পা., ১৪৬)।

আদি ক্ষত্রিয় বাঘও কালকেতুর বীরত্বের কাছে তুচ্ছ। কালকেতু বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে পশুশিকার করে। ফলে শক্তিশালী পশুগণও তার সঙ্গে পেরে ওঠে না। বাঘের নখ, ছাল প্রভৃতি কালকেতুর জীবিকা অর্জনের অবলম্বন। এসবের জন্য বাঘ কালকেতুর নিপীড়নের শিকার হলো। কালকেতুর অত্যাচারে রায়বার (রাজার বার্তাবাহক) কোকও ছেলেমেয়ে হারিয়ে কাঁদছে। কালকেতুর অত্যাচারে বনের সমস্ত পশুর জীবন বিপর্যস্ত। তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। জীবনের অসহায়ত্ব ও দুঃখ বর্ণনা ছাড়া তাদের মুখে যেন আর কোনো বুলি নেই। “কালকেতুর অত্যাচারে পশুদের ক্রন্দনের ভাষায়ও রাজকীয় অত্যাচারে পীড়িত ভূমিভিত্তিক মানুষের ক্রন্দন শ্রুত হয়েছে” (ক্ষেত্র গুপ্ত, ৪)।

অত্যাচার সইবার সীমা ছাড়িয়ে গেলে মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। কালকেতুর নির্যাতনে নিপীড়িত পশুগণের ক্ষেত্রেও এই চিত্র দেখা যায়। কালকেতুর অত্যাচারে নির্যাতিত পশুগণের সঙ্গে বাঘিনী এসে মৃগরাজ সিংহকে প্রশ্ন করে যদি সে প্রজাপালন করতে না পারে তাহলে কেন মৃগরাজ হলো। বাঘিনীর জিজ্ঞাসা-

যদি পশুগণ

না কৈলা পালন

কেনে হৈলা মৃগরাজ।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ২৬)।

এ যেন মধ্যযুগীয় প্রজার মুখে রাজশক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগের সুর; তৎকালীন শাসনব্যবস্থার প্রতি কবিমনের সুপ্ত জিজ্ঞাসার প্রতিফলন। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ যেমন নিজ প্রয়োজনে একতাবদ্ধ হয়ে সমস্যা সমাধান করে পশুগণও তেমনি তাদের সমস্যা সমাধানে একতাবদ্ধ হয়েছে। একালে নিরীহ প্রজাগণের রাজার কাছে অভিযোগ জানানোর সুযোগ না থাকলেও মুকুন্দের কাব্যের পশুগণ কিন্তু তাদের অভিযোগ একজোট হয়ে রাজার কাছে উত্থাপন করেছিল, যাতে পরবর্তীকালের গণতান্ত্রিক মনোভাব ফুটে উঠেছে। কবি নিজের জীবনে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন তার প্রতিকার তিনি করতে না পারলেও কবির কাব্যের পশুগণ কিন্তু আধুনিককালের প্রজাগণের মতো রাজার রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে ব্যর্থতার অভিযোগ পশুরাজের কাছে তুলে ধরেছিল। পশুগণের অভিযোগের এই চিত্রটিতে আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রজার মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য বলেন, “পশুকাহিনীতে

রাজশক্তির পঙ্গুত্ব বিবৃত হয়েছে। রক্ষক রাজশক্তি বিপদ থেকে উদ্ধার করে না। দুর্বল ও নিরপরাধীরা বিনা অপরাধে শাস্তি পায়” (আশিসকুমার দে ও বিশ্বনাথ রায় সম্পা. ১৬৫)।

বাঘিনী সিংহকে বলে-

শুন শুন রায় মাদ্রিয়ে বিদায়
ছাড়িব তোমার বন।
পাত্র অধিকারী না শুনে গোহারি
বিপাকে তেজি জীবন।।
নারীগণ সঙ্গে থাক লীলারঙ্গে
না কর দোষ বিচার।
বীর কালকেতু পশুবধ হেতু
নিত্য পাড়ে মহামার।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ২৬)।

পশুরাজ সিংহ রাজ্যশাসনে মন না দিয়ে ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদে মগ্ন থাকায় তার রাজ্য সুরক্ষিত ছিল না। ফলে বহিঃশত্রুর আক্রমণে তার রাজ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কালকেতুর অত্যাচারে নিপীড়িত পশুগণ যখন দেখল যে তাদের রক্ষাকর্তা কেউ নেই তখন তারাও বাধ্য হয়ে বনত্যাগের সিদ্ধান্ত নিল। এখানেও কবির ব্যক্তিগত জীবনে নির্যাতনের শিকার হয়ে পিতৃপুরুষের ভিটা পরিত্যাগের ছবি ফুটে উঠেছে। সমাজের উচ্চশ্রেণির ব্যক্তিবর্গ নানা লীলারঙ্গে, ভোগবিলাসে, আরাম-আয়েশে দিনাতিপাত করে। গরিব প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা, অভিযোগ শোনার মতো কেউ থাকে না। রাজারও প্রজাপালনের দিকে কোনো সুদৃষ্টি থাকে না। তখন নির্যাতনের শিকার গরিব প্রজারা বাধ্য হয়ে নিজের পরিচিত ভুবন, ভিটে-মাটি, বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ায়। অরবিন্দ পোদ্দারের মতে, “মেয়ে বাঘটির এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেই কালে সেই সমাজে বিচরণশীল মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা সংযুক্ত হয়েছে বলে মনে হয়; অথবা মানুষের অভিজ্ঞতাই এই উজির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বলা যেতে পারে। বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সমস্ত শ্রেয়বোধমুক্ত ক্ষয় ও অনাচার এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও শ্রেণীর হৃদয়হীন শাসন, এই উভয়ের চাপেই সাধারণ মানুষ ভয়বিষ্ময়ে অভিভূত” (৬৩)। রাষ্ট্রে যখন বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করে, রাজা যখন রাষ্ট্রপরিচালনা ও প্রজাপালনে উদাসীন থাকে তখন রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা ও ঐক্য বিনষ্ট হয়। তখন রাষ্ট্র বহিঃশত্রুর আক্রমণে সহজেই পরাস্ত হয় এবং জনজীবনে অসহনীয় দুর্ভোগ নেমে আসে।

পশুরাজ সিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগে বাঘিনীর মুখে যে শক্তিদ্রব বুলি উচ্চারিত হয়েছে তার ফলে সিংহের আচরণেও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। পশুরাজ কর্তব্যসচেতন হয়ে রাজ্যের খোঁজ-খবর নেওয়া এবং বহিঃশত্রুর হাত থেকে রাজ্যরক্ষায় তৎপর হয়ে ওঠে। সিংহ পশুদের দুঃখের বর্ণনা শুনে কালকেতুর সঙ্গে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু যুদ্ধে কালকেতুর রণকৌশলের কাছে পশুরাজও পরাজিত হলো। পরাজিত সিংহের অনুরূপ চিত্র দেখা যায় কবির তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর বেলায় যিনি কিনা রাজনৈতিক কূটকৌশলে বিপাকে পড়ে বন্দি হলেন এবং তাঁর দূরবস্থা দেখে কবিসহ গ্রামের অসহায়, নিরীহ অনেক প্রজা গ্রামত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই চিত্রে মনে হয়, কালকেতু যেন মুকুন্দরামের অঞ্চলের অত্যাচারী শাসক ডিহিদার মামুদ সরীপ, মৃগরাজ সিংহ যেন তালুকদার গোপীনাথ নন্দী এবং কবি নিজে যেন বনের অসহায় প্রজা পশুদের প্রতিনিধি। এখানে কবির সমকালীন অবস্থা ও ব্যক্তিগত দুর্ভোগের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। নীলিমা ইব্রাহিমের মতে- মামুদ সরিফ তার প্রজাদের যে অত্যাচার করেছেন পশুদের মুখ থেকে কালকেতু সম্পর্কে ঠিক অনুরূপ অভিযোগ পশুরাজ সিংহের কাছে আনা হয়েছে। যে স্বৈরতন্ত্রের শিকার কবি

নিজে হয়েছিলেন সেই মানবিক অনুভূতি ও সহানুভূতির দ্বারা তিনি পশুর দুঃখ বর্ণনা করেছেন (শিপ্রা সরকার, ৯৯)।

পশুদের জীবনিত কবি যেন নির্যাতিত মানুষের দুঃখগাথাই উপস্থাপন করেছেন। তারপর নির্যাতিত অন্য পশুদের সঙ্গে মৃগরাজ সিংহ কাঁদতে কাঁদতে চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হলো। চণ্ডীদেবী তখন জনে জনে তাদের দুঃখের কথা জানতে চাইলে তারা বলে যে কালকেতু মহাবীর। বিভিন্ন রকম কৌশল প্রয়োগ করে সে পশুশিকার করে। ফলে তার হাত থেকে ছোট-বড়, সবল-দুর্বল, ক্ষমতাবান-ক্ষমতাহীন কারোরই নিস্তার লাভ সম্ভব নয়। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র বলেন- দেবী চণ্ডীর নিকট পশুগণ কালকেতুর অত্যাচারের কথা করুণ ভাষায় নিবেদন করিতে লাগিল। পশুগণের এই ক্রন্দন ও বিলাপের মধ্যে একটু লক্ষ্য করিলেই তৎকালীন শোষিত ও উৎপীড়িত মানুষের করুণ ক্রন্দনের সুরটুকু শোনা যায় (শিপ্রা সরকার, ৯৯)।

কালকেতুর অত্যাচারে পশুসমাজের জীবনযাপনের স্বাভাবিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয় এবং তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে। বহিঃশত্রুর আক্রমণে একটা অঞ্চলের জনজীবন কীভাবে বিপর্যস্ত হয়, জীবনযাপনের স্বাভাবিক গতি কীভাবে থমকে যায় এবং জনজীবন অস্তিত্ব সংকটে ভোগে মুকুন্দের কাব্যের এই অংশ তারই সাক্ষ্য দেয়। কালকেতুর অত্যাচারে জর্জরিত বনের পশুদের এই অসহায়তার চিত্র যেন সামন্তপ্রভুর অত্যাচারে নির্যাতিত অসহায় প্রজাগণের বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। “মুকুন্দরামের তিক্ত অভিজ্ঞতার ছায়া পড়েছে পশুরাজ্যের বিবরণে।... মুকুন্দরাম নিপীড়িত, বিপদগ্রস্ত, অসহায় পশুজীবনের এক রসগ্রাহ্য বর্ণনা দিয়েছেন সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে। একটা উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারিত স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ছবি আঁকবেন, কবির তাই ইচ্ছা” (ওয়াকিল আহমদ, ৩১২)। বনের নির্যাতিত পশুগণ কালকেতুর অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভের আশায় চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হলে দেবী তাদেরকে আশ্বাস প্রদান করে বলেন-

আজি হইতে মনে কিছু না করিহ ভয়।

না বিধবে মহাবীর কহিনু নিশ্চয়।। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., ৩৬)।

পশুগণের চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হওয়ার এই চিত্র যেন নিজ রাজ্য ও অস্তিত্ব রক্ষায় উচ্চদরবারে আবেদন জানানোর চিত্র। দেবী পশুগণকে দেওয়া তার কথা রেখেছিলেন। তিনি কালকেতুকে নবনির্মিত গুজরাট নগরের অধিপতি করে দিয়েছিলেন। ফলে কালকেতুর আর পশুশিকারের প্রয়োজন পড়েনি।

মুকুন্দরাম বনের পশুদের ওপর কালকেতুর অত্যাচারের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে সামন্তপ্রভু কর্তৃক নির্যাতিত প্রজার জীবনচিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য বলেন, “তৎকালীন সমাজে দুর্বল নিরপরাধের ওপরে প্রবলের নির্বিচার অত্যাচার বিনা বাধায় সংঘটিত হত, পশুকাহিনীতে তারই ভূমিকা রচিত হয়েছে” (আশিসকুমার দে ও বিশ্বনাথ রায় সম্পা., ১৬৫)।

বনের পশুদের সাথে কালকেতুর আচরণ তাকে অতিশয় অত্যাচারী শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে ঠিকই কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত ছিল তার জীবন ও জীবিকার প্রশ্ন। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদেই যেন কালকেতু একজন অত্যাচারী শাসকে পরিণত হয়েছিল। সামন্তপ্রভুগণও তাদের ওপরের স্তরের রাজব্যক্তি ও কেন্দ্রীয় শাসকের অধীন ছিল। তাই তারাও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে অনেক সময় বাধ্য হয়ে কিংবা স্বার্থরক্ষার তাগিদে প্রজাপীড়ন করত। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই তৎকালীন ‘রাজায় রাজায় যুদ্ধ’ এমনকি বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। শুধু মানবসমাজ নয় সমস্ত জীবজগতের মধ্যেই এই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই বিরাজমান।

মুকুন্দরাম ‘কালকেতু উপাখ্যানে’ পশুকাহিনি অবলম্বনে রচিত উপকথায় পশুদের জীবনচিত্র আঁকতে গিয়ে সমকালীন সমাজের বাস্তবচিত্রই তুলে ধরেছেন প্রচ্ছন্নভাবে। পশুচরিত্রে আরোপিত হয়েছে মানবীয় বৈশিষ্ট্য। পশুচরিত্রের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে তৎকালীন জীবনবাস্তবতার চিত্র। সমালোচকের মতে, “‘উপকথা’র ভিত্তি যে বাস্তব জীবন, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই,... ‘উপকথা’র জীবন নিত্য মানুষের শাশ্বত জীবন— তা পশু-পাখি বা অন্য যে কোন রূপকের মাধ্যমেই প্রকাশিত হোক না কেন” (মুহম্মদ আবদুল খালেক, ৪০২)।

উপসংহার

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের ‘কালকেতু উপাখ্যানে’র পশুকাহিনি অংশে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল পশুচরিত্রগুলো মানবচরিত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। তৎকালীন সমাজবাস্তবতা, সামন্তপ্রভুদের অত্যাচার, প্রজার দুর্বিষহ জীবন, নারীর অবস্থা, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই প্রভৃতি বিষয়গুলো উঠে এসেছে উপাখ্যানের এই অংশে। এই পশুচরিত্রগুলো মানুষের মতোই কথা বলে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপন করে, কোনো বিষয়ে তাদের অভিযোগ তুলে ধরতে পারে, একতাবদ্ধ হয়ে আবার তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও করে। বাস্তবজীবনের করুণ চিত্রের পাশাপাশি তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরও শোনা যায়। পশুকাহিনিতে মধ্যযুগীয় সামন্তশাসিত নিপীড়িত প্রজার জীবনচিত্রের পাশাপাশি আধুনিক গণতান্ত্রিক নাগরিকের আচরণও পরিলক্ষিত হয়। এই কাহিনিতে প্রতিফলিত হয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি জীবনবাস্তবতার বিভিন্ন দিক। উপকথায় চর্চিত হয়েছে জনজীবনের নানা অনুষঙ্গ।

তথ্যসূত্র

- অরবিন্দ পোদ্দার। *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯।
- আশরাফ সিদ্দিকী। *লোক-সাহিত্য [প্রথম খণ্ড]*। ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮।
- আশিসকুমার দে ও বিশ্বনাথ রায় সম্পা। *কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল : আলোচনা ও পর্যালোচনা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬।
- ওয়াকিল আহমদ। *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*। ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৮।
- ক্ষুদিরাম দাস সম্পা। *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী [প্রথম খণ্ড]*। কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯৩।
- ক্ষেত্র গুপ্ত। *কবি মুকুন্দরাম*। কলিকাতা: গ্রন্থনিলয়, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।
- দীনেশচন্দ্র সেন। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [২য় খণ্ড]*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২।
- মুহম্মদ আবদুল খালেক। *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।
- মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা। *কালকেতু উপাখ্যান*। ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।
- শিপ্রা সরকার। *সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব : প্রসঙ্গ মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্য’*। ঢাকা: আজকাল প্রকাশনী, ২০০৭।
- শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*। কলিকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯।

New Way of Resolving Fact-Value Dilemma

Muhammed Amir Uddin *

Abstract: [Fact-value or *is-ought* dilemma is a vital issue of contemporary moral philosophy. British philosopher David Hume raised the issue at first. Moral philosophers have contributed each other interpreting Hume's '*is-ought*' passage in many ways. Some moral philosophers believe that there is no relation between factual statement and value statement. They argue that it is absolutely impossible to derive a value statement or moral statement from *factual* or *is statement(s)*. But others claim that value can be derived from fact.

We believe and shall argue that both these views are partially right. Those who believe that *value statement* cannot be derived from *factual statement(s)* are right in the sense that *value statement* cannot be derived from *factual statement(s)* formally or deductively. They are wrong in saying that *value* or *moral statement* cannot be derived from *factual statement(s)* at any way. Similarly, those who claim that *value statement* can be derived from *factual statement(s)* are partially right in the sense that there is a way to draw value or *moral statement* from *factual statement(s)*. We believe and will try to establish the fact that *value statement* can only be drawn from *is statement(s)* through informal logic.]

Introduction

There is an unresolved dilemma in meta-ethics as to whether one can arrive at *value* from *fact*. Naturalists and neo-naturalists believe that we can define or derive *value statement* from *factual statement(s)*. On the other hand intuitionists, radical subjectivist and prescriptivists reject any logical relation between *factual statement* and *value statement*. They claim that any attempt to drive *factual statement(s)* to *value statement* must commit *naturalistic fallacy*. It is worth noting that there is a historical debate between Searle and Hare in which they respectively say, "value can be derived from fact" and "value cannot be derived from fact." We are in agreement with Hare that formal deduction from *fact* to *value* is not possible, but we believe that there is a logical connection between *fact* and *value*. This belief is very important for us to break *fact-value* dilemma. To resolve this dilemma we shall adopt historical and analytic method. We shall make a survey and explore the writings of those moral philosophers who talked about *fact-value* relation. Furthermore, we shall also examine and analyze their arguments and counter arguments. Finally we shall use informal logic such as, conduction and legal reasoning as tools of resolving the *fact-value* dilemma.

Source of the dilemma:

The dilemma whether *value* can be derived from *fact* or in other words, *ought* can be derived from *is* originated from a famous passage of Hume - *A Treatise of Human Nature*, where he says,

* Associate Professor, Institute of Education & Research, University of Chittagong.

In every system of morality, which I have hitherto met with, I have always remarked that the author proceeds for some time in the ordinary way of reasoning and establishes the being of a God, or makes observations concerning human affairs; when of sudden I am surprised to find that, instead of the usual copulations of propositions *is* and *is not*, I meet with no proposition that is not connected with an *ought* or *ought not* this change is imperceptible but is, however, of the last consequence. For as this *ought* or *ought not* ...should be observed and explained; and at the same time that a reason should be given for what seems altogether inconceivable, how this new relation can be deduction from others. (Hume, III, i, 1).

This article is quoted many times by the philosophers in support of their views that *value* cannot logically be derived from *fact*, that is, no value statement follow from any statement of fact. R.M. Hare calls this impassibility between *fact* and *value* as **Hume's law**. The interpretation, which maintains it, is known as accepted interpretation. Hume is saying that some careless authors try to deduce *value* statement from *factual* statement through deduction and such kind of attempt seems altogether *inconceivable*, He is saying here that there is a logical gulf between *fact* and *value*, that is, no set of descriptive (*is*) statements can entail an evaluative (*ought*) statement without the addition of at least one evaluative (*ought*) premise.

Some philosophers challenge the accepted interpretation and offer a new interpretation. They argue that, in his passage Hume says that there is a logical connection between *factual* statement and *value* statement, which some philosophers fail to see. Thus there is no logical gulf between *fact* and *value*. We can deduce *value* statement from *factual* statement. When someone derives *value* from *fact* Hume just wants explanations and reasons regarding how the derivation is possible. For example, Hume writes, "For as this *ought* or *ought not* expresses some new relation or affirmation, it is necessary that it should be observed and explained; and at the same time that a reason should be given for what seems altogether inconceivable, how this new relation can be a deduction from others, which are entirely different from it". (Hume, III, i, 1).

Professor J.R. Searle in his article *How to derive ought from is* published in the philosophical review, 1964, where he claims, we can derive a value or moral conclusion from the premises absolutely factual. Let us see how Searle formulates his derivation:

Searle-Hare debate on Fact-value dilemma:

There are many writings on *Fact-value* dilemma. But here we will consider only Searle-Hare debate to have an understanding of the problem. Professor J. R. Searle tries to derive *ought* from *is* and R. M. Hare disagrees with him. In his article, Searle claims that we can derive an *ought* conclusion from *is* statement(s).

He depicts with a case of an evaluative (*ought*) conclusion derived exclusively from descriptive (*is*) premises, which he defends. Then he outlines a theory of language that generates an indefinite case of the type. Searle begins his five steps of derivation with a purely descriptive statement or brute fact such as, *Jones uttered the words, I hereby promise to pay...* and to continue by a series of reasoning moves to the institutional fact and finally reaches to pure evaluative conclusion 'Jones ought to pay....'

New Way of Resolving Fact-Value Dilemma

The proof discloses the relation between the utterance of certain words and the speech act of promising and then it turns promising into commitment that moves from obligation to 'ought'. He explains every step. He designs his argument as follows:

- 1) Jones uttered the words, "I hereby promise to pay you, Smith, five dollars".
- 2) Jones promise to pay Smith five dollars.
- 3) Jones placed himself under an obligation to pay Smith five dollars.
- 4) Jones is under an obligation to pay Smith five dollars.
- 5) Jones ought to pay Smith five dollars.

The relation between any statement and its successor, according to Searle, though not in every case one of *entailment* and same as a contingent relation, the supplementary statements are required to make the link one of entailment. Additional statements do not link with any evaluation, and don't need to invoke any evaluative statement or moral principle. No evaluations are suppressed in the additional premises. These statements are empirical, tautological and descriptions of word usages. Searle explains,

(1a) Under certain condition C any one who utters the words "I hereby promise to pay you, Smith, five dollars", promises to pay Smith five dollars.

For the act of promising the conditions must be empirical, such as the speaker and the hearer are both conscious, speak in English, speaking seriously; the speaker knows what he is doing, not under the influence of drugs, not hypnotized, or not acting in a play, not telling a joke or reporting an event etc.

(1b) Conditions C obtain.

From 1. (1a), and (1b) 2 is derived.

Between (2) and (3) Searle takes 'promise' by its definition: an act of placing oneself under an obligation. So, (2) entails (3) straight off. The tautological premise is:

(2a) All promises are acts of placing oneself under an obligation to do what are promised.

In the case of relation between (3) and (4), Searle offers the *ceteris paribus* clause. There may arise some unnecessary causes or situations which can void the obligation. So, *ceteris paribus* is necessary to secure the derivation. Thus we get another tautological premise for an entailment.

(3a) other things are equal.

(3b) All those who place themselves under an obligation are, other things being equal, under an obligation.

From (3), (3a) and (3b), (4) is derived.

The relation between (4) and (5) the additional statement is also tautological.

(4a) Other things being equal.

(4b) All those who are under an obligation to do an act 'ought', other things being equal, to do that act.

Thus Searle derives evaluative (*ought*) statement from factual (*is*) premises.

R.M. Hare analyses Searle's derivation in his book, *Promising game* (1964, 144). He mainly attacks the status of the extra premise, which Searle imports between (1) to (2) and (2) to (3) as an entailment. He says Searle's extra premise (1a) contains a synthetic evaluation or moral prescription. Hare connects the matter to the conception of *institutional fact*:

It may seem as if the 'brute fact' that a person has uttered a certain phonetic sequence entails the 'institutional fact' that he has promised, and that this in turn entails that he ought to do a certain thing. But this conclusion can be drawn only by one who accepts, in addition, the non-tautologies principle that one ought to keep one's promises. For unless one accepts this principle, one is not a subscribing member of the institution which it constitutes, and therefore cannot be compelled logically to accept the institutional facts which it generates in such a sense that they entail the conclusion,(Hare, 155).

Hare combines Searle's (1a) and (2a) into a single constitutive rule:

(1a*) *under certain condition C anyone who utters the words, "I hereby promise to pay Smith five dollars" place himself under an obligation to pay Smith five dollars.*

Hare argues that the statement (1a*) contains a synthetic evaluation or prescription not merely about word usages. He claims that (1a*) is not a tautology. Hare constitutes another proposition as follows which contains (1a*) and is clearly a tautological.

(1a*+) *According to the rules of an institution whose rules say "Under certain conditions C anyone who utters the words 'I hereby promise to pay you, Smith, five dollars' places himself under an obligation to pay Smith five dollars.*

Hare says, (1a*) itself is not a tautology. He alerts us "we must not be misled into thinking that, because it is a tautology that promising is an institution of which (1a*) is a constitutive rule, (1a*) itself is a tautology." (1969, 146).

Finally, Hare concludes that (1a*) is neither a synthetic statement nor a synthetic prescription about how English is or ought to be spoken. Introducing a word *promise*, we should not think that this makes (1a*) a tautology or a mere statement about word usage. It is an essence of a word like, *promise* that has a meaning only when certain synthetic proposition about how we should act is assented. Hare believes that (1a*) is a synthetic constitutive rule of institution of promising and the constitutive rules of promising are moral principle, so (1a*) is a synthetic moral principle. If (2a) is a tautology then (1a) either explicitly or implicitly contains a synthetic moral principle. Therefore, Hare concludes, Searle does not reach evaluative (*ought*) conclusion from exclusively factual (*is*) premises. He just draws an evaluative statement from premises of conceal evaluation.

We have seen how Searle tries to deduce *ought* from *is* and Hare rejected it. We believe that Hare is right in saying that Searle has not derived *value* from *fact* rather he derives *value* from *value*. Indeed *ought* cannot be derived from *is* deductively. According to deductive reasoning, no word or term can be drawn in the conclusion which is absent in the premise except addition. Any attempt to do so does commit a fallacy. But we do believe that there is a way called informal reasoning which allows the derivation of *value* from *fact*. Now let us see what informal reasoning is.

Informal reasoning

Generally, it is believed that any sort of reasoning must fall into either deductive or inductive categories. But recently, logicians disagree with this traditional view. They believe that there are some kinds of argument, which are neither deductive nor inductive. For example, in our day-to-day life conversation, in media reports, in legal debate, political debate and also in moral issues we frequently use arguments. But these arguments fall neither in the deductive nor in the inductive framework. They are not deductive, because their conclusion is not certain or conclusive. And they are not inductive, because their conclusion is not empirically verifiable. We apply this logic to ordinary situations and for decision making in daily circumstances without appeal to the details of formal logic. It aims at providing us with tools to assess and analyzes the ordinary kind of reasoning mentioned above. The informal logic tells us that it deals with our everyday practical logic which is not formal. This kind of logic started its journey in the late sixty's and early seventy's of the twentieth century and still it is flourishing. *Conduction* or *moral reasoning* and *legal reasoning* are two good examples of informal logic. Now we shall give an illustration of conduction and legal reasoning to grasp the nature of informal logic as well as to make it clear how *value statement* can be derived from *factual statement(s)* informally. In other words, legal reasoning and conduction will help us to understand how value or *ought* statement can be derived from factual or *is* statement(s).

Conduction

Carl Wellman advocates conduction. He defines conduction "as a kind of reasoning in which the conclusion about some individual case is drawn non-conclusively from one or more premise(s) about the same case without any appeal to other cases." (1970, 52). Conduction is one kind of value reasoning where a value or *ought* conclusion is drawn on the basis of some factual or *is* premises(s). So a discussion of conduction will help us to understand how a value statement can be derived from factual premises(s).

According to Wellman, there are three patterns of conduction. The first pattern consists of one premise and the conclusion. In this pattern other premises are not added because the reason given by the single premise is so clear and powerful that it alone is enough to draw the conclusion.

For example,

You promised to marry Smitha. (Factual statement)

Therefore, you ought to marry Smitha. (Value statement)

The second pattern consists of more than one premise to draw the conclusion. Here each premise provides independently positive reason for the conclusion, for example,

You are wealthy. (Factual statement)

You are generous. (Factual statement)

Your neighbor is poor. (Factual statement)

Therefore, you ought to help your neighbor. (Value statement)

In the third pattern of conduction the conclusion is drawn from both positive and negative premises(s). The positive premises provide favorable reasons for the conclusion and the negative premise(s) provide reasons against the conclusion.

For example,

He is impolite.	(<i>Factual statement</i>)
He is eccentric	(<i>Factual statement</i>)
He is honest.	(<i>Factual statement</i>)
He is kind.	(<i>Factual statement</i>)

Therefore he is good.	(<i>Value or ought statement</i>)

Here two premises are positive. They provide reasons for the conclusion. And two other premises are negative and provide reasons against the conclusion. But the reasons for are stronger than the reasons against. Thus the argument presents us a convincing evidence to tell the person well.

All the three patterns of argument, mentioned here consist of factual premise(s) and evaluative conclusion. In our day-to-day life we frequently use such types of arguments. But these arguments are neither deductive nor inductive, they are informal. They are not deductive, because their conclusion is not certain. For it is always possible that the additional information may make the conclusion false. Even if the original premise(s) remain true. But we know that in deductive argument the conclusion is always certain. So conduction does not guarantee the certainty of the conclusion-it only supports the conclusion to different degrees.

Conduction is neither inductive. Although its premise(s) are factual, its conclusion is not factual or empirical like the inductive argument. Further more, in induction, the probability of conclusion generally depends on the number of positive instances, but the acceptability of the conclusion of conduction depends on the relevance of the premise(s).

Thus we can conclude that conduction which provides us value statement on the basis of factual statement(s) is neither deductive nor inductive. It is informal. In other words, we can reach moral statement from factual statement(s) through conduction; i.e., through informal way.

Legal Reasoning

Legal reasoning is another branch of informal logic. Like conduction, legal reasoning also allows us to draw value (*ought*) conclusion from factual (*is*) premise(s). Let us consider the following example:

Suppose Rumi stole a gold ring from a shop. Now if the case goes to the court and the judge is convinced that it is true that Rumi stole the gold ring then the court will declare Rumi guilty.

New Way of Resolving Fact-Value Dilemma

Here judge pronounced a value (*ought*) judgment: 'Rumi is guilty' on the basis of a factual (*is*) statement(s), 'Rumi stole a gold ring from a shop'.

To make it more clear let us arrange the same argument in the following way to show how a value or *ought* statement is derived from *is* statement in legal reasoning.

Rumi stole a gold ring.	(Factual statement)
Rumi is guilty.	(Value statement)
Rumi committed wrong.	(Value statement)
Therefore, Rumi ought to be punished.	(Value statement)

Here the conclusion of legal reasoning 'Rumi ought to be punished' is not empirically verifiable. Thus legal reasoning is conceptual in the sense that here the conclusion is drawn on the basis of the meaning of the term(s) used in premise(s).

Legal reasoning is also different from deduction. We know that the conclusion of a deduction is always certain. On the other hand, the conclusion of a legal reasoning is not certain; its conclusion is only probable. The reason is that the conclusion of a legal reasoning is changeable. For example, if Rumi steals a gold ring and if the lower court declares him guilty or declares that 'Rumi is wrong' or 'Rumi ought to be punished', then Rumi can appeal to the higher court and the higher court may disagree with the verdict of the lower court.

From the above discussion we can say that legal reasoning is neither inductive nor deductive. But it is a genuine reasoning process, because according to Lemmon, legal reasoning is acceptable to all. Therefore it shows us how value (*ought*) statement can be drawn from factual (*is*) statement(s) informally. In legal reasoning the premise (e.g. Rumi stole a gold ring.) is factual or *is* statement; but the conclusion (Rumi is wrong) is value or *ought* statement, and the conclusion does not derive from the premise formally. As a result legal reasoning again helps us to derive *value* statement from *factual* statement(s).

Conclusion

The aim of this article is to resolve *fact-value* dilemma. Here we have shown how informal reasoning allows us to derive *value or moral statement* from factual or *is statement(s)*. For this, we inspect a passage of Hume in *A Treatise of Human Nature* which initiated the problem. And we have shown that there are mainly two interpretations of the passage, some believe that Hume wanted to say that the derivation of *value* from *fact* is impossible; while others believe that the derivation is possible but explanation is needed regarding how this derivation takes place. We accept the latter interpretation and have tried to provide reasons for 'value can be derived from *fact*'. Searle, however, tries to show how *value* can be deduced from *fact*. But we agreed with Hare that a formal deduction of *value* from *fact* is not possible. Rather we have claimed that the deduction is possible informally. Finally we have presented conduction and legal reasoning as examples. We have argued that in conduction and legal reasoning it has been shown how to resolve *fact-value* dilemma.

References

- Hare R. M. "The Promising Game" in *The Is-Ought Question*, Edited by W. D. Hudson, The Macmillan press Ltd. London.1969.
- Hume, David *A Treatise of Human Nature*, ed. by L. A. Selby Bigge, Oxford. 1964.
- Levi. H. Edward. *An Introduction to Legal Reasoning*, London, The University of Chicago press, 1970.
- Searle J. R. "How to derive ought from is?" in the *is-Ought Question*. Ed. by W. D. Hudson, The Macmillan press Ltd. London.
- Wellman. Carl. *Conduction, in challenge and Response: Justification in Ethics*, Carbondale: Southern Illinois University press, 1971.

Narrative Production of Bilingual Children from Class Three to Class Six: A Comparative Study between English and Bangla

Srabani Mallik *

Abstract: Oral narratives provide an index of children's cognitive and social abilities. Accordingly, to investigate communicative competence in children, narrative analysis is considered by researchers as an ecologically suitable way. Yet monolinguals are given preference in the design and norms of the most existing elicitation and assessment tools, and the designs and tools are not always applicable to cross-cultural issues but to only one of the child's languages. These facts play crucial roles in the research and assessments of the narrative abilities of multilingual children. This study examines macrostructural aspects of narrative skills in 10 bilingual Bangla- and English-speaking children aged 8–12 years. Elicited fictional story production tasks were administered in a parallel process in both English and Bangla using a translated and adapted Bengali version. Scores on MAIN were compared across languages; moreover, story structure components in the narratives and answers to probe questions were qualitatively analyzed. Age effects (8–9-year-old vs. 10–12-year-old) for macrostructure production were evident with, but no effect on language (Bangla/English).

Key Words: narrative, bilingual, multilingual, macrostructure, production

Introduction:

A narrative task taps into knowledge that goes beyond the specifics of a particular language (Gagarina, N., Klop, D., Kunnari, S., Tantele, K., V'alimaa, T., Bal'ci'unien'e, I. et al., 2012) and is therefore thought to be a less biased method of language assessment for bilingual children than many other norm-referenced tests (Paradis, Genesee, & Crago, 2010). The present study contributes to a growing body of literature studying narrative abilities of children with LI (e.g., Bishop & Donlan, 2005; Dodwell & Bavin, 2008) and bilingual children (e.g., Pearson, 2002; Uccelli & Paez, 2007). A narrative task provides rich information about the linguistic development of children in an ecologically valid way and is considered a valuable clinical tool (Botting, 2002). It may be especially valuable for the challenging identification of bilingual children with language impairment (LI). Research show that narrative tasks are often found to be problematic for children with LI and appear to remain problematic into adolescence and children with LI perform weak on various aspects, including morphosyntax, lexical richness and use of complex clauses, and this has also been found within a bilingual context. Language delays of bilingual children can arise not only from impairment but also from insufficient exposure to and, consequently, limited knowledge of the target language (Kohnert, 2010).

Narrative production and comprehension skills in bilingual and multilingual children have rarely been studied for each of the child's languages (Pearson, 2002; Schwartz & Shaul, 2013), as

* Associate Professor, Institute of Modern Languages, University of Chittagong, Chittagong, Bangladesh.

usually only one language of the child, typically the majority language, is investigated. There are yet no systematic studies of the narrative abilities of bilingual Bangla–English children. In a short language sample about a child's multiple linguistic skills, it is generally approved that narratives make available rich data and multiple linguistic abilities include story structure, complexity of structures, internal state language, morphosyntax, cohesion, and lexical diversity and efficiency.

To overcome some of these shortcomings, a new tool, the Multilingual Assessment Instrument for Narratives (MAIN; Gagarina et al., 2012) was developed and piloted for 17 different languages and language combinations within an EU-COST Action project on child multilingualism (<http://www.bi-sli.org>). The intent was to design a reliable assessment instrument for bilingual children that probe not only language-specific but also language-general narrative skills at the cognitive–linguistic interface. MAIN contains parallel sets of picture stimuli with different fictional characters and events but with identical macrostructure, that is, identical overall story and episode structure. Protocols for eliciting storytelling, retelling, and answers to story comprehension questions and scoring methods were designed to tap into the narrative abilities of multilingual children aged 4–10 in a parallel manner in each of their languages. The development of MAIN proceeded on the widespread assumption that narrative structure has universal characteristics and properties that hold across languages (culture-specific storytelling conventions notwithstanding) (Pearson, 2002). There appears to be a strong cognitive, language-general component to story structure and to the development of story structure in children. The working hypothesis is thus that story structure should be invariant across a bilingual child's two languages at a given age, with similar understanding of story events and causality and similar awareness of the intentions and goal-directed behavior of the protagonists. A bilingual child should readily carry over such language-general narrative abilities from one language to another and profit from them, even in cases where one language is weaker than the other regarding morphosyntax or vocabulary development, as is often the case in simultaneous and sequential bilinguals (Berman, 2001; Iluz-Cohen & Walters, 2012; Kupersmitt & Berman, 2001; Paradis, Genesee, & Crago, 2011; Pearson, 2002).

In the present study, different stimuli resources and a more comprehensive evaluation have been used and it is to be noted that to express macrostructural knowledge linguistically, some language aptitude is essential, even though in the literature, the least proficiency approach is not generally recapitulated (Pearson, 2002; Viberg, 2001). Using a more detailed and rigorously designed new assessment tool (MAIN), the current study investigates whether macrostructural knowledge in narrative production is invariant across a bilingual child's two languages at a given age and a comparison across languages.

Literature Review:

Employing MAIN, an adaptation of the story grammar model of Stein and Glenn (1979) is used in the present study. To elicit comparable narratives in the two languages of a bilingual child and depict stories of comparable complexity and plotline, parallel sets of picture stimuli were designed. A story with distinct animal protagonists is depicted by each set of picture stimuli and the picture stories are identical with global story structure and episode structure. In each picture story, there is a setting (e.g., once upon a time there were three goats in a meadow) which is

accompanied by three short episodes. Each episode in the picture stories includes the protagonist's goal, the protagonist's attempt to reach the goal, an outcome concerning the goal, an internal state (e.g., a cognitive or emotional condition), that brings about the goal, an internal state (e.g., a cognitive or emotional condition), which is the response to the result. For instance, in the Baby Goats story (Figure 1), in the first episode, the goal of the big goat is to help the baby goat out of the water; in the second episode, the goal of the fox is to catch or kill the baby goat; and in the third episode, the goal of the bird is to rescue the baby goat from the fox. While the actions of the protagonists are explicitly depicted, the perceptions, thoughts, emotions, motives, and goals of the story characters must be inferred from the pictures to tell a complete story.

Narrative study permits clinicians and linguists to make assessments of multiple linguistic features because a rich source of data about a child's language use in a moderately natural environment is provided by oral narratives and macrostructure (e.g., categories of story grammar such as goals, attempts and outcomes) and microstructure using relatively short language specimens (e.g., relational and referential devices, lexical diversity, complex syntax and morphosyntax) are included in multiple linguistic features (Heilmann, Miller, & Nockerts, 2010; Heilmann, Miller, Nockerts, & Dunaway, 2010). There are also suggestions in the literature that narratives may be less biased and more appropriate for bilingual children than other language assessment tools, because "language tasks that require a cognitive component might . . . be tapping into language-general capacities" (Paradis, Genesee, & Crago, 2010, 221).

Research on bilingual children's oral narrative development is only in the initial stages and is even more limited for Spanish/English bilinguals from low-SES families. The few studies that have studied narratives in this population suggest some interesting directions for inquiry and highlight the need for additional research (Gutiérrez-Clellen, 2002; Muñoz, Gillam, Peña, & Gulley-Faehnle, 2003; Pearson, 2002). Pearson compared the narrative performances of second and fifth graders in a cross-sectional sample of Spanish/English bilinguals and monolinguals from Miami, Florida. Using the wordless picture book *Frog, Where Are You?* (Mayer, 1969) as an elicitation procedure, Pearson examined narrative quality at two levels: (a) At the language level, lexical and grammatical elements were identified; (b) at the story level, the organization of the story was captured by assessing story elements (e.g., characters and events), story sequence, and narrators' perspectives. Results revealed effects of SES, grade, and lingualism (monolinguals vs. bilinguals) in English narrative quality, favoring high-SES, older students, and monolingual children. Larger differences were identified at the language level than at the story level, suggesting that these dimensions capture different patterns of change in bilingual skills. Also, bilingual children produced better performances in English than in Spanish, with larger differences on language elements than on story features. Interestingly, results revealed significant cross-language correlations at the level of story and complex syntax, but not at the level of specific language elements, such as lexicon or syntactic accuracy. The author interpreted these findings as evidence of positive "carry-over across languages," offering initial evidence that warrants further research on cross-linguistic associations (Pearson, 2002, 149).

Muñoz and colleagues (2003) collected English narrative skills from a cross-sectional sample of 4- and 5-year-old "predominantly English-speaking Latino children" also using the picture book

Frog, Where Are You? (Mayer, 1969). These authors documented developmental progress at the level of syntax and story organization but found that the length of children's narratives did not vary significantly by age. Length was calculated using two measures of narrative productivity—total number of words (TNW) and total number of different words (TDW). None of these measures was a sensitive indicator of English narrative development in their sample of young, low-SES Latino children. These authors suggest that measures of narrative productivity that are commonly used with English monolinguals might not be sensitive for Spanish/English bilinguals from low-SES (socioeconomic status) families.

Children are often already credited with full points for story structure when having mentioned the main protagonists, an initiating event, one attempt, and one outcome/consequence (e.g., Akinci et al., 2001; Møller, 2010; cf. Fiestas & Peña, 2004; and Lanza, 2001, for a scale of max 7 points). This may be partly due to the special recursive structure of the Frog story with its series of attempts to reach the goal (i.e., to find/retrieve the frog), which all fail except for the final attempt, the goal being repeatedly reinstated (Trabasso & Rodkin, 1994). With other stimuli materials too, story structure is often investigated on a scale of few points only (Iluz-Cohen & Walters, 2012).

Thus, with increasing age and cognitive maturity, there is a gradual move away from descriptive and action sequences and a development toward a more complex episodic organization with causal connections, where the thoughts, feelings, motives, and goals of protagonists, as well as their reactions to successful or failed outcomes, are made explicit for the listener. The development of certain narrative components and story complexity is often seen in relationship with the development of theory of mind, that is, the awareness of shared as opposed to unshared knowledge. As such, it forms part of children's cognitive development (Berman & Slobin, 1994; Nicolopoulou & Richner, 2007; Pearson, 2002; Shapiro & Hudson, 1991; Soodla, 2011; Tomasello, 2003; Westby, 2012). The ability to produce well-formed episodes (including GAO sequences) indicates understanding of underlying narrative schemas, causality, perspective taking, and the need to justify plans and actions (Shapiro & Hudson, 1991; Trabasso & Nickels, 1992; Trabasso & Rodkin, 1994). This development continues during the primary school years. By age 9–10, children's fictional narratives are said to resemble those of adults concerning macrostructure, with evaluative comments and frequent attributions of emotional states to protagonists (Berman & Slobin, 1994).

There is, however, a fair bit of variation concerning the exact age at which monolingual children are reported to be able to produce or regularly express certain narrative components and full GAO episodes. This is because studies have employed a wide variety of elicitation materials and data collection procedures with different task demands and analyzed their data according to slightly different story grammar models.

Method:

Participants:

The present study examines the macrostructural aspects of narrative skills in 10 bilingual Bangla - English speaking children in the age group 8–12 years. The children are divided into two sub-groups according to age: The first group consists of 6 children between 8-9 years and 4 children fall in the second age range of 10-12 years. Of these, 7 are girls and 3 are boys. The choice of subjects was restricted by the following factors: the first major factor was that the pandemic restricted the access to larger groups of children as well as children belonging to younger age groups as schools in Bangladesh were closed. I did try to contact teachers and parents to explore the possibility of conducting the study online, but the attempts did not meet with success. Thus, I was able to identify these 10 children who belonged to two similar age groups, socio-economic backgrounds, and a similar amount of exposure to the first language Bangla and the second language English. The second reason for choosing these age groups was that in urban areas in Bangladesh, children of this age range are exposed to a second language to a great extent not only as a classroom language but as a home language as well. This makes it possible for me to elicit narratives in both the languages that the children speak.

The younger group comprises children of class 3 and 4. 3 children in this group attended a school where both Bangla and English are media of instruction. Two of them are from English-medium schools and they are 9 years old, and 1 child aged 9 is studying in a Govt. primary school. The older group comprises children of class 5 and 6. In the older group, 2 children are 10 years old, 1 is 11 years old and 1 is 12 years old. One studies in Bangla English mixed- medium primary school, one is from an English medium school that follows a national curriculum where both English and Bangla are given the same preference. The 11-year-old child studies in class VI in a Govt. High school where both Bangla and English are used as the medium of instruction and the 12-year-old who is from an English-medium school. All the schools are in the urban area of Chattogram, the port city of Bangladesh.

The 10 children have been selected from the families where both Bangla and English are spoken on a regular basis. The parents of the participants have completed secondary and higher secondary levels and 50% of the families (5/10) have at least one parent who holds a Graduate or Post-Graduate degree. In 20% of the families, at least one parent has an undergraduate degree. Some criteria were followed to select the participants, and these are: They had to belong to the age groups that we were interested in, i.e., 8-9 or 10-12 years of age; they had to have no record of hearing impairment, language impairment, or cognitive disorder; they had at least 4 years of regular and recurrent exposure to each language, a good understanding of and fluency in both Bangla and English. To ensure that these criteria were met, I administered a language profile questionnaire that is a part of the Multilingual Assessment Instrument for Narratives (MAIN).

Tools Used for Data Collection:

In the current study, the English version of MAIN and its Bangla adaptation were used. Sets of 6 colored, wordless picture sequences are provided by MAIN as stimulants to elicit four stories with identical overall story and episode structure.

In contrast to conventional picture books, the MAIN stimulus materials were carefully constructed with story grammar as a theoretical base to allow clear identification of the story grammar elements generated by the child. By portraying three episodes in each picture sequence, children are provided with more than one opportunity to produce each element targeted for macrostructure analysis. Two of these picture stories were used in the present study: Baby Birds and Baby Goats (see Figure 1). These were designed for storytelling, with parallel plots and identical story structure. The picture sequences were used to elicit two narratives per child, one in each language (narrative production task).

Methodology:

In this study only two stories were used - Baby Birds and Baby Goats - as we were examining narrative abilities across two languages in the Telling mode only. Children were seen individually in a quiet room on two separate occasions. Each session was conducted entirely in one language, in Bangla or in English.

After an initial period of warming-up conversation or play, the children sat at a table facing the investigator and were presented with three envelopes, each containing an identical copy of one of the picture sequences as a six-picture strip (Baby Birds or Baby Goats). Following the standard MAIN procedure, the children were told that there were different pictures in the envelopes and that they were to choose one. After selecting an envelope, the children were asked to take out and unfold the pictures and look at them to familiarize themselves with the story. They were instructed to tell the story and the pictures were held in front of them so that the investigator could not see the pictures. This was done to minimize effects of shared knowledge and to discourage the use of pointing. After an initial previewing of all six pictures to minimize task demands, fold-out was used during the actual storytelling, with pictures presented in pairs of two (first two, then four, then all six pictures visible). Care was taken not to start the story for the children; they were encouraged to tell the story themselves. The investigator listened without interrupting much, except to provide back-channeling encouragement, to direct or help with the folding out of pictures, or when queried by the child for a word or the name of an animal. In cases when the child hesitated, the investigator used standard MAIN prompts (e.g., *Tell me more; Anything else?; Let's see what else happens in the story*). After the children had finished telling their story, the investigator asked the comprehension questions, with the entire picture sequence visible on the table. Finally, the children received stickers as a small thank-you gift.

Half the children did the task first in Bangla and then in English, and half vice versa, in randomized order, with a break in between. A 5- to 7-day interval between sessions for all children was maintained as recommended in the MAIN manual. The investigator counterbalanced for both languages (Bangla first vs. English first) and picture sequence (Baby Birds first vs. Baby Goats first). The narrative tasks were audio-recorded and transcribed by the investigator. Table 1 below shows the design employed in the elicitation of narratives across languages.

Narrative Production of Bilingual Children from Class Three to Class Six: A Comparative Study between English and Bangla

	Stories used across languages	
Age groups	Bangla	English
8-9 years	Baby Bird (SUB 1)/Baby Goat (SUB 2)	Baby Goat (SUB 1)/Baby Bird (SUB 2)
10-12 years	Baby Goat (SUB 1)/Baby Bird (SUB 2)	Baby Bird (SUB 1)/Baby Goat (SUB 2)

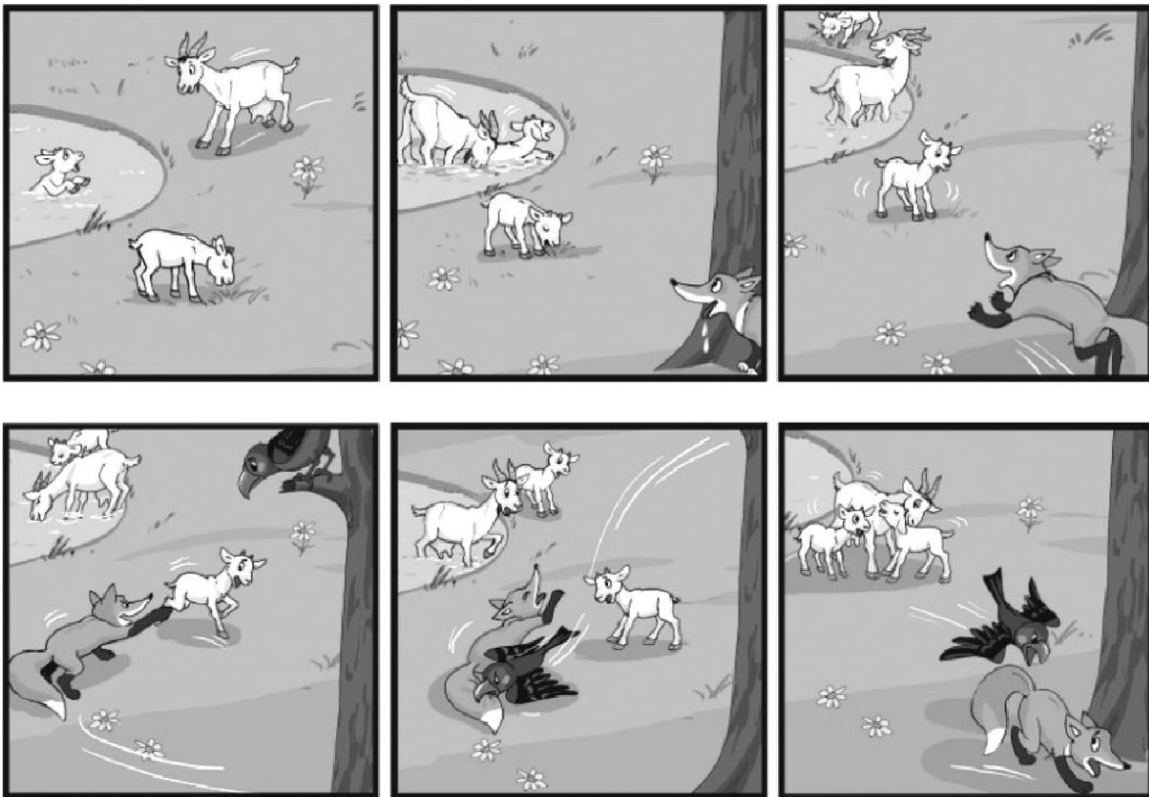


Figure 1. The picture stimuli for the Multilingual Assessment Instrument for Narratives Baby Goats story (originals are 9 × 9 cm-colored pictures in a folded strip).

Results and Discussion:

The results show overall findings between groups (First Group—8-9 years and Second Group—10-12 years) and languages (L1/L2) for narrative production.

Narrative Production:

First group (8- to 9-year-old)

The 12 narratives, 6 in Bangla and 6 in English elicited from the 8- to 9-year-old contained on average 6.41 (out of 17) story structure components as assessed by MAIN. No child achieved

more than 11 points. Broken down by language, the mean for Bangla ($M = 5.7$, $SD = 2.7$, range = 5–11 out of 17 points) was higher than for English ($M = 3.1$, $SD = 2.4$, range = 2–7 out of 17 points). The 8-9-year-old at group level scored nearly similar for macrostructure in both their languages. At an individual level, most children scored differently in their two languages. SUB8 who was 9 years old scored only 2 points in English but in Bangla that child scored 11 that was the highest score in Bangla among the 10 children. The child was a student at a Govt. primary school where Bangla, the mother tongue, is used more than English. Moreover, the parent of this child reported that the child preferred to use Bangla over English. This contrasts with SUB5, who scored 5 in both English and Bangla. This child was studying in a school where (s)he was exposed to both languages equally. SUB10 scored more in English than Bangla as the child was a student at an English medium school. In 5 out of 6 cases, though the children have exposure to both Bangla & English at school, Bangla is the predominant language of use in the home and environment of the children. This accounts for their higher language proficiency in Bangla than in English. The lower level of English language exposure and its use thus leads to the production of shorter narratives as well as the lower English scores. Further analysis with a larger sample is required to determine whether there is a relationship between a lower or higher production score on MAIN, age of first exposure, and language exposure and use at school. Despite the warm-up session, shyness, or hesitation to speak in English might be also one of the reasons for the lower performance.

Table-2 shows the distribution of story structure components across the two languages of the two groups.

Component	8-9 Years		10–12 Years	
	English	Bangla	English	Bangla
Setting (time & place)	2	4	3	4
A & O	7	8	8	3
Goal	2	8	3	4
GA/GO	2	6	2	4
GAO	0	3	1	0
IST as IE	3	9	3	5
IST as IR	6	2	3	2

Note: A & O as Attempt and Outcome, GA/GO as Goal-Attempt/Goal-Outcome, GAO as Goal-Attempt-Outcome

The first example below shows how the 9-year-old child's narrative was dominated by Attempt and Outcome and with little reflection about the feelings, intentions and goals of the protagonists involved in the story. The scorable attempts and outcomes are underlined and it is observed that instances of code-switching ('ghash' instead of 'grass') is also here. The narratives of this group contain passages where objects and characters are not sequentially narrated, and all make the identification of events and attempt them and connect these together.

Example-1: Two little goat and one big goat. One eat green ghash...they play in water. A fox run and they see fox. The fox, goat play and happy. There is flower...beautiful...flowers. A bird in tree. Black bird eat the tail...goat see. Goat are here...Bird fly ...fox runs...end.

(Baby Goats, English, 9-year-old child, MAIN story structure score = 2/17)

The second example reflect the 8-year-old child's several attempts and outcomes (underlined) and some internal states of the protagonists (in boldface), such as *the birds smile and happy*, when the mother bird brings food, or the *birds shout* seeing the cat goes up the tree to catch them. Such story structure elements are articulated by at least 4 8–9-year-old children in the first group and example 2 is the narrative with the highest score for story structure in the 8–9-year-old data.

Example- 2: A big tree is there and three bird live. It is big tree..birds are happy...playing...a little cat is there. ...the big bird bring food...bird smiles and happy and ...birds eats food. cat goes up treebird shout here...then a red dog comes.. Red dog bite the tail of cat..the bird see it. The cat runs...runs and also dog run . the bird play in tree..happy.

(Baby Birds, English, 8-year-old child, MAIN story structure score = 7/17)

There are only 3 full GAO episodes in Bangla and no GAO episodes in English because of the low frequency of overtly expressed Goals in the 8–9-year old's data. The internal state as reaction is higher in English than in Bangla and internal state as initiating event is lower in English than in Bangla. The attempts and outcomes are almost similar in both the languages (see Figure- 2).

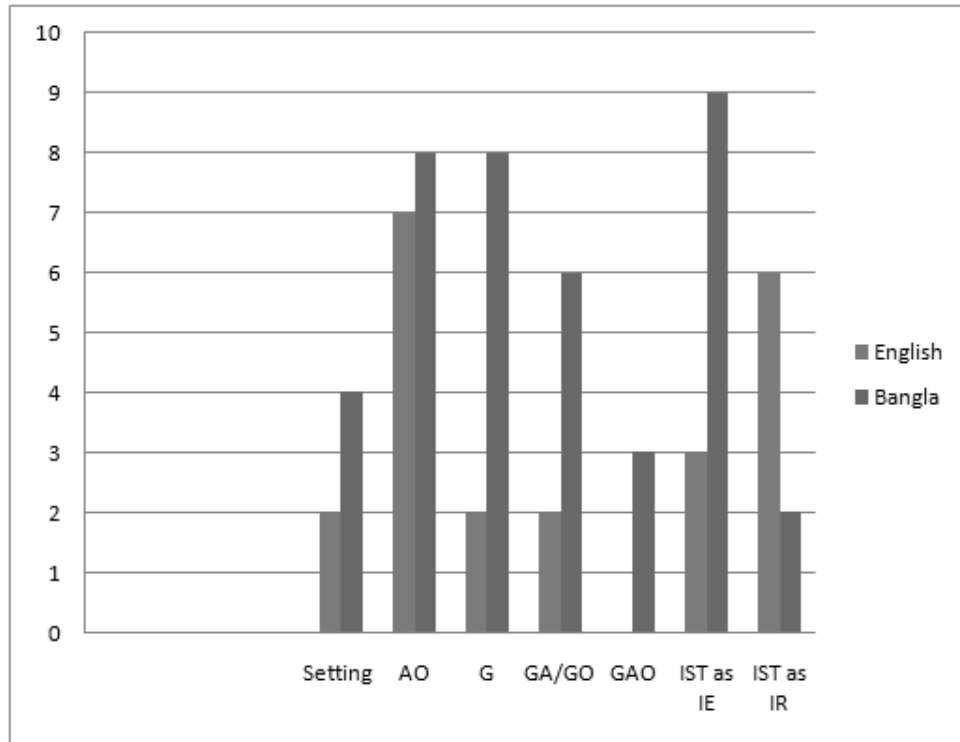


Figure-2: English & Bangla Structural Complexity & IST of Group 1

Second group (10- to 12-year-old):

The 8 narratives, 4 in Bangla & 4 in English, produced by the 10- to 12-year-old contained on average 7.25 (out of 17) Main story structure components, which is about 1 point higher than the first group. None of the children got more than 10 points, which shows that for story grammar elements, their narratives were all in the middle range. Broken down by language, the mean for Bangla ($M = 3.1$, $SD = 1.7$, range = 5–10 out of 17 points) was virtually similar with English ($M = 3.3$, $SD = 2.2$, range = 6–9 out of 17 points). The 10- 12-year-old at group level scored almost the same for macrostructure in both their languages.

At an individual level, most children scored differently in their two languages. SUB3 who was 11 years old, scored 9 points in English and 10 points in Bangla and that child scored the highest score in English among the 4 children. The child was a student at a Govt. high school where exposure to both Bangla and English almost similar. SUB7 who was 12 years old scored 8 in English and 6 in Bangla and the child scored more in English than Bangla as the child was a student at an English medium school. Nearly the same result is identified with SUB2, an 11-year-old child who scored 7 in English but got only 5 in Bangla and the child was from a school where both English and Bangla are the medium of instruction. In this group, two children scored higher

in English than Bangla and the other two scored better in Bangla in comparison with English. Consulting the information from the background questionnaire, in each of the four cases, the high score in English indicates that the children's language preference, that is, they prefer English than Bangla, age of first exposure not only in the home but in the school premises also, estimated amount of exposure, and language use at school show relationship with production of scores.

Example 3 illustrates the highest score (9/17) for story structure of the 10–12-year-old narratives. Setting is provided and in addition to attempts and outcomes (underlined), the goal of the protagonist is mentioned (in boldface). Internal state as reaction is mentioned too (in capitals), such as, the dog saves the baby birds and mother crow is happy by having her children.

Example-3: There is a tree and live a bird family. Mother bird is flying sky. Mother bird want food for her child. And a cat climb up that tree and the cat catch the bird. The dog sees it. The mother bird is afraid. Dog catch the cat. And the cat is afraid and running. The dog save back. The mother crow have her children.

(Baby Birds, English, 12-year-old child, MAIN story structure score = 9/17)

There is only 1 full GAO episode in English and no GAO episodes in Bangla though the 10-to-12-year old's data show that the children attempted goals in both English and Bangla. The internal state as reaction is higher in English than in Bangla and internal state as initiating event is lower in English than in Bangla. The attempts and outcomes are the highest in English, (see Figure-3).

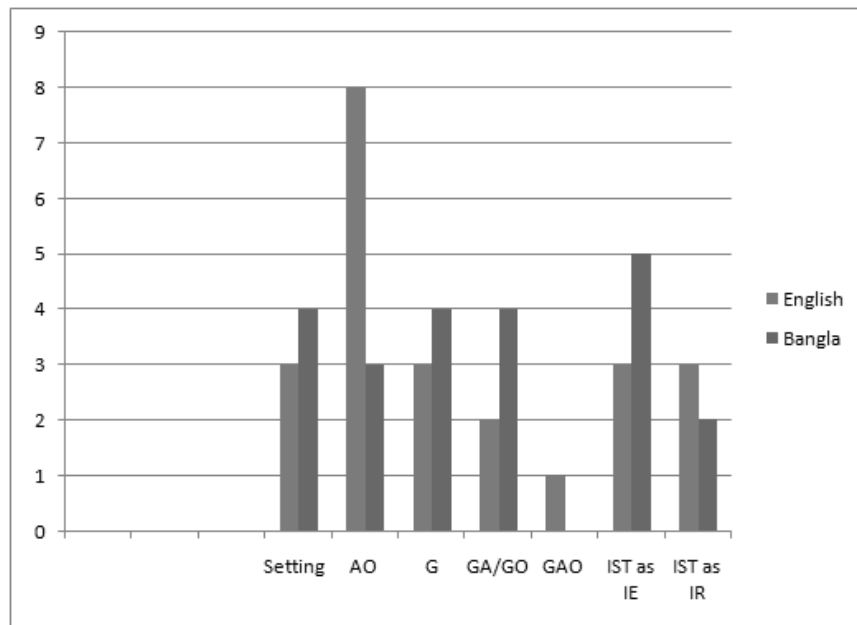


Figure 3. English & Bangla Structural Complexity & IST of Group 2

Narrative Production across Group 1 and Group 2:

The 8-9-year-old's narratives contained on average 7 story structure components ($M = 4.4$, $SD = 2.6$, range = 2–7 out of 17), in comparison with 7 components in the 10- to 12-year-old's narratives ($M = 3.2$, $SD=1.9$, range=6-7 out of 17). The difference between the two age groups is not statistically significant. This suggests that macrostructural discourse competence in production does not improve from age 8 to 12. All story grammar components do not become more frequent from age 8 to age 12, though some seem to develop more than others, (see Figure 4)

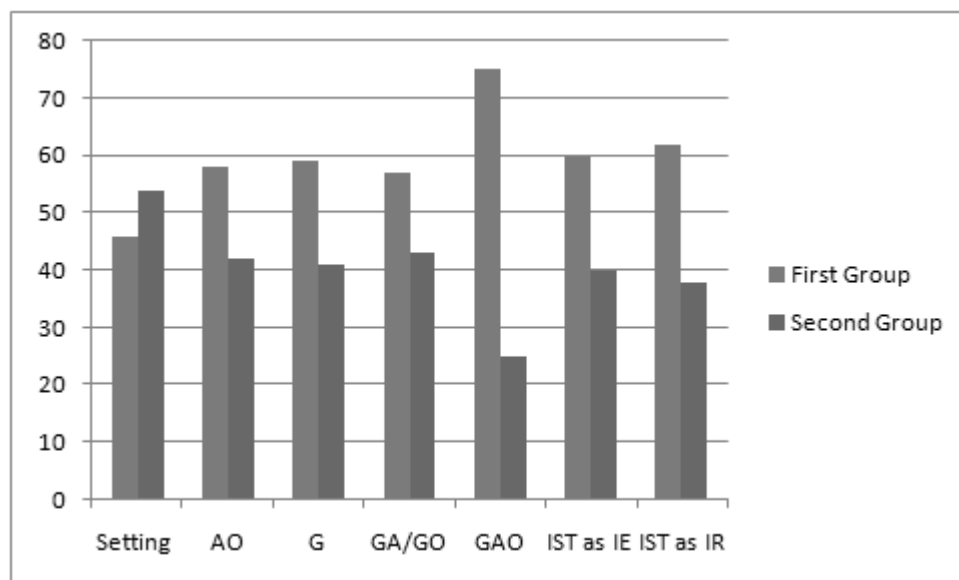


Figure 4. Narrative Production across Group 1 and Group 2

Regarding time and/or place of the story, settings familiarize the listener and in the narratives of the 8–9-year-old, settings are mentioned in 46% and in the majority (54%) of the stories told by the 10–12-year-old children. These setting statements are conventional fairytale openings or fragments. Besides macrostructural information, they refer to an increasing familiarity with storytelling conventions and formulaic storybook expressions specific to English and Bangla (e.g., *There was a tree in a jungle. There was a nest on that tree ...*, *There are three goats in field... One day three animals play together...*, *Akta khub shundor jangal chilo, shakhane onek poshu pakhi bashobash korto...* [There was a very beautiful jungle Many animals lived there], *Akdi akta chagol panite pore gelo ...* [One day a goat fell into the water...], *Anek anek din ager kotha , ak bot gache akti pakhir basha chilo...*[Long day ago, there was a bird's nest upon a banyan tree...]). Such settings are infrequent in the 8–9-year-olds, instead of they often start their story by directly started telling the picture description (e.g., *A baby goat eats grass. They play...*; *Two baby birds and mother are here; Akti pakhir akti chana chilo*[A bird had chicks]; *Duita pakhi ache . Bacchagulo ha kore ache ...*[There are two birds. The chicks open their mouth...]). There is no clear-cut difference observed between the two age groups and an 8–9-year-old child's

narrative includes a setting component and several narratives by the 10–12-year-old do not have the components of setting.

In the episodic system, the first group expressed 59% of the goals of the protagonists and group two expressed it at a rate of 41%. There is no development over age regarding goals from age 8 to 12 though there are not many complete episodes (GAO). This objective of narrative development appears to be managed to master by the average 8–9-year-old children when telling a story elicited by MAIN.

For other story structure components, we see some age differences and similarities also. Internal states as initiating events are greater in 8-9 years (60%) than 10-12 years (40%). Such explicit internal state terms are helpful when listeners are trying to follow the child's story and deduce what the (implicit) goal of the protagonist might be (e.g., *He is catching goat*). Attempts and outcomes of events increase in frequency, though from a much higher level of 42% at age 10 to 12 to 58% at age 8–9. Most episodes end abruptly with an outcome statement (e.g., *Crow attack fox and the fox is run away, The dog was watching it and it bite the cat and the cat run away from there*), spelling out the internal reaction or affective response of the story characters to that outcome (e.g. goat happy; the crow is happy; the bird is happy; Akta chagol dariya ache . Are bhoy pacche [A goat stands there and becomes scared]). Such internal states as reactions are mentioned by 8–9-year-old: 62% and 10-12-year-old: 38%), and the repertoire of such states is limited (*satisfied, relieved, screamed, surprised*).

The result for narrative production from 10 Bangla and English-speaking children from third to six grade age 8 to 12 such that story structure is not similar across a bilingual child in two languages. For the 8–9-year-old, story structure scores for Bangla ($M = 5.7$) were higher than for English ($M = 3.1$), which could be due to Bangla being the major language for these children growing up in Bangladesh and in some cases also the slightly stronger language, as rated by the parents. For the 10- to 12-year-old, story structure scores in English and Bangla were almost the same ($M = 3.1$ and 3.3 , respectively). The younger children scored significantly higher on MAIN (8–9-year-old, $M = 4.4$) than the older ones (10–12-year-old, $M=3.2$). This suggests that macrostructural narrative skills measurably do not improve between the ages of 8-9 and 10-12. When we analyzed individual performance, all 8–9-year-old fell into the lower range on MAIN (2-7 out of 17) and the 10–12-year-old into the low to middle range (2-9 out of 17). The scores differed to a great extent for several children though composite scores in the two languages were often close. This happened though all children had received at least 4 years of frequent and regular exposure to Bangla and English and were using both languages regularly. Thus, the participants could reasonably be expected to have enough language-specific knowledge to express macrostructural knowledge in both the languages.

Conclusion:

It could be suggested that, for explorative research on narrative skills in bilingual children, the usefulness of MAIN mainly lies in the possibilities it provides through the composite scores by

the children though the MAIN composite story structure scores do not tell us all, such as whether the participants include a setting statement like time and place in their production or all story structure components. It has been shown in this study that MAIN is a helpful tool to bring out and evaluate narrative macrostructure in two languages. Although most children could not employ this scheme in telling, they applied a similar degree of level of story complexity and structure to the same levels in both languages and employed a more inclusive fundamental scheme for story understanding. Thus, it can be concluded that between ages 8 and 12 in Bangla-English bilinguals, aspects such as macrostructural discourse capability develop based on language-general and language-specific narrative skills in children across languages.

Acknowledgement:

This research has been done as a requirement of MA TESL degree in The English and Foreign Languages University, Hyderabad, India. I would like to convey my sincere thanks and gratitude to my supervisor Dr. Madhavi Gayathri Raman, Assistant Professor, Department of Materials Development, Testing and Evaluation, School of English Language Education, The English and Foreign Languages University, Hyderabad, India. Her instruction and supervision helped me to complete the research within time successfully. I am paying my heartfelt appreciation to the children and parents for their acceptance to take part in this research and for their collaboration in the success of the present research work.

References

- Akinci, M.-A., Jisa, H., & Kern, S. Influence of L1 Turkish on L2 French narratives. In L. Verhoeven & S. Strömqvist (Eds.), *Narrative development in a multilingual context* (pp. 189–208). Amsterdam: John Benjamins. 2001.
- Berman, R. A. Narrative development in multilingual contexts: A cross-linguistic perspective. In L. Verhoeven & S. Strömqvist (Eds.), *Narrative development in a multilingual context* (pp. 419–428). Amsterdam: John Benjamins. 2001.
- Bishop, D.V.M. and Donlan, C. The role of syntax in encoding and recall of pictorial narratives: Evidence from specific language impairment. *British Journal of Developmental Psychology*, (2005) 23(1), 25–46.
- Botting, N. Narrative as a tool for the assessment of linguistic and pragmatic impairments. *Child Language Teaching and Therapy*, (2002) 18(1), 1–21.
- Dodwell, K. and Bavin, E.L. Children with specific language impairment: an investigation of their narratives and memory. *International Journal of Language and Communication Disorders*, (2008) 43(2), 201–18.
- Fiestas, C. E., & Peña, E. D. Narrative discourse in bilingual children: Language and task effects. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, (2004) 35, 155–168.
- Gagarina, N., Klop, D., Kunnari, S., Tantele, K., Valimaa, T., Balciunienė, I., et al. *Multilingual Assessment Instrument for Narratives (MAIN)*. ZAS papers in linguistics 56. Berlin: ZAS, 2012. Retrieved from <http://www.zas.gwz-berlin.de/zaspil56.html>
- Gutiérrez-Clellen V. Narratives in two languages: Assessing performance of bilingual children. *Linguistics and Education*; (2002) 13:175–197.

Narrative Production of Bilingual Children from Class Three to Class Six: A Comparative Study between English and Bangla

- Heilmann, J., Miller, J. F., & Nockerts, A. Sensitivity of narrative organization measures using narrative retells produced by young school-age children. *Language Testing*, (2010) 27, 603–626.
- Heilmann, J., Miller, J. F., Nockerts, A., & Dunaway, C. Properties of the narrative scoring scheme using narrative retells in young school-age children. *American Journal of Speech–Language Pathology*, (2010) 19, 154–166.
- Iluz-Cohen, P., & Walters, J. Telling stories in two languages: Narratives of bilingual preschool children with typical and impaired language. *Bilingualism: Language and Cognition*, (2012) 15, 58–74.
- Kohnert, K. Bilingual children with primary language impairment: issues, evidence and implication for clinical actions, *Journal of Communication Disorders*, (2010) 43(6), 456-473.
- Kupersmitt, J., & Berman, R. A. Linguistic features of Spanish–Hebrew children’s narratives. In L. Verhoeven & S. Strömquist (Eds.), *Narrative development in a multilingual context* (pp. 277–371). Amsterdam: John Benjamins. 2001.
- Lanza, E. Temporality and language contact in narratives by children bilingual in Norwegian and English. In L. Verhoeven & S. Strömquist (Eds.), *Narrative development in a multilingual context* (pp. 15–50). Amsterdam: John Benjamins. 2001.
- Mayer, M. *Frog, where are you?*. New York: Dial Press. 1969.
- Möller, C. *Coherence and cohesion in early immersion students’ L2 narratives: Implications for cognitive and linguistic development*. Unpublished doctoral dissertation, Universität Paderborn. 2010.
- Muñoz ML, Gillam RB, Peña ED, Gully-Faehnle A. Measures of language development in fictional narratives of Latino children. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools* ; (2003) 34:332–342.
- Nicolopoulou, A., & Richner, E. R. From actors to agents to persons: The development of character representation in young children’s narratives. *Child Development*, (2007). 78, 412–429.
- Paradis, J., Genesee, F. and Crago, M. *Dual language development and disorders: A handbook on bilingualism and second language learning* (2nd Edition). Baltimore, MD: Brookes. 2010.
- Paradis, J., Genesee, F., & Crago, M. B. *Dual language development and disorders* (2nd ed.). Baltimore, MD: Paul. H. Brookes. 2011.
- Paradis, J., Genesee, F., & Crago, M. B. *Dual language development and disorders: A handbook on bilingualism and second language learning* (2nd ed.). Baltimore, MD: Paul H. Brookes. 2010.
- Pearson, B.Z. Narrative competence among monolingual and bilingual school children in Miami. In: Oller, D.K., Eilers, R.E. (Eds.). *Language and literacy in bilingual children* (Clevedon, UK: Multilingual Matters), (2002) pp. 135-174.
- Saha, Anwar & Raman & Mandal. Bengali version, translated and adapted (Based on the revised version in English). 2021.
- Schwartz, M., & Shaul, Y. Narrative development among language-minority children: The role of bilingual versus monolingual preschool education. *Language, Culture and Curriculum*, (2013) 26, 36–51.
- Shapiro, L. R., & Hudson, J. A. Tell me a make-believe story: Coherence and cohesion in young children’s picture-elicited narratives. *Developmental Psychology*, (1991) 27, 960–974.
- Soodla, P. *Picture-elicited narratives of Estonian children at the kindergarten school: Transition as a measure of language competence*. Unpublished doctoral dissertation, Tartu University. 2011.

Stein, N. L., & Glenn, C. G. An analysis of story comprehension in elementary school children. In R. O. Freedle (Ed.), *Advances in discourse processing: Vol. 2. New directions in discourse processing* (1979) (pp. 53–120). Norwood, NJ: Ablex.

Tomasello, M. *Constructing a language: A usage-based theory of language acquisition*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2003.

Trabasso, T., & Nickels, M. The development of goal plans of action in the narration of a picture story. *Discourse Processes*, (1992) 15, 249–275.

Trabasso, T., & Rodkin, P. C. Knowledge of goal/plans: A conceptual basis for narrating “Frog where are you?” In R. A. Berman & D. I. Slobin (Eds.), *Relating events in narrative: A cross-linguistic developmental study* (1994) (pp. 85–106). New York: Psychology Press.

Uccelli, P. and Paez, M. Narrative and vocabulary development of bilingual children from kindergarten to first grade: Developmental changes and associations among English and Spanish skills. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, (2007) 38(3), 225-236.

Viberg, A° . Age-related and L2-related features in bilingual narrative development in Sweden. In L. Verhoeven & S. Strömquist (Eds.), *Narrative development in a multilingual context* (2001) (pp. 87–128). Amsterdam: John Benjamins.

Westby, C. E. Assessing and remediating text comprehension problems. In A. G. Kamhi & H. W. Catts (Eds.), *Language and reading disabilities* (2012) (3rd ed., pp. 163–225). Boston: Pearson.

منهج جامع البيان في تاويل القرآن للإمام ابن جرير الطبري

[“জামিউল বয়ান ফী তাবিলিল কুরআন” রচনায় ইমাম তাবারীর অনুসৃত পদ্ধতি]

ড. মোহাম্মদ আমির হোসাইন*

প্রতিপাদ্যসার: আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (৮৩৯-৯২৩ খ্রি./২২৪-৩১০ হি.) ছিলেন একজন প্রতিথযশা তাফসীর বিশারদ ও ইতিহাসবেত্তা। তাকে ইলমে তাফসীর ও ইসলামের ইতিহাসের জনক বলা হয়। তিনি তাফসীর, হাদিস, ফিকহ, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে ‘জামিউল বয়ান ফী তাবিলিল কুরআন’ একটি সুবিন্যস্ত তাফসীরগ্রন্থ। তিনি তিরিশ হাজার পৃষ্ঠায় তাঁর তাফসীরগ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু আয়ুষ্কালের স্বল্পতা অনুধাবন করে এবং বিস্তৃত গ্রন্থ অধ্যয়নে পাঠকদের নিরুৎসাহ উপলব্ধি করে তিনি গ্রন্থটি তিন হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করেন। তাঁর এ তাফসীরগ্রন্থটি পরবর্তীকালের তাফসীরকারকদের নিকট প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লামা সুযুতী (১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), ইব্ন তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮ খ্রি./৬৬১-৭২৮ হি.), ইমাম ইব্ন খুযাইমা (২২৩-৩১১ হি.) প্রভৃতি মনীষীগণ আল্লামা ইব্ন জারীর তাবারীর তাফসীর গ্রন্থটির শ্রেষ্ঠত্ব অকপটে স্বীকার করেছেন। আরবি ভাষাশৈলী, রচনাপদ্ধতি, আরব বাকরীতি ও আল-কুরআনের অলংকারশৈলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি তাফসীর গ্রন্থটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। এ তাফসীর গ্রন্থটি বর্তমানে প্রায় সারা বিশ্বের বিভিন্ন মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। বক্ষমান প্রবন্ধে ‘জামিউল বয়ান ফী তাবিলিল কুরআন’ রচনায় তাঁর মানহায বা পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

مقدمة :

إن الإمام ابن جرير الطبري كان من أشهر الأعلام الإسلامية، وكان قد جمع العلوم العربية والفنون الإسلامية من التفسير والحديث والفقه والتاريخ، وكان عالماً باللغة العربية وعلومها من النحو والصرف والفصاحة والبلاغة والشعر والأدب، إضافة إلى ما وهبه الله من مواهب فطرية كالذكاء والفطنة والنبوغ، تمكن بها من التأويل والاستنباط والاستدلال. وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله، ومن أشهر مؤلفاته تفسيره "جامع البيان في تاويل القرآن" الذي نحن في صددده، وقد أجمع العلماء على أنه لم يؤلف في التفسير مثله. (السيوطي، ١٩٧٤ : ٤/٢٤٤) وقال النووي : كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله. (السيوطي، ١٩٧٤ : ٤/٢٤٤) وهو المرجع الأول عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلي، وإن كان في الوقت نفسه يعتبر مرجعاً غير قليل الأهمية من مراجع التفسير العقلي، نظراً لما فيه من الاستنباط، وتوجيه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، ترجيحاً يعتمد على النظر العقلي، والبحث الحر الدقيق. وقد اعتبر

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

الطبري أبا للتفسير، كما اعتبر أبا للتاريخ الإسلامي، وذلك بالنظر بما في هذين الكتابين من الناحية العلمية العالية. (الذهبي، د.ت: ٢٠٦/١)

حياته الوجيزة :

هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، الأملي، البغدادي. (الزركلي، ٢٠٠٢م: ٦٩/٦؛ ابن خلكان، د.ت: ١٩١/٤م) يكنى بأبي جعفر مع أنه لم يتزوج، ولم يكن له ولد، لأن الكنية من السنة. ولد الطبري -رحمه الله تعالى- في مدينة "أمل" من أعمال طبرستان، أكبر المدن فيها سنة ٢٢٤هـ. (ابن خلكان، د.ت: ١٩١/٤م) نشأ فيها وتربي في أخضان والديه تربية حسنة، وكان أبوه رجلاً صالحاً، فأراد أن يعلم ابنه العلوم العربية والفنون الإسلامية، فالتحقه في مدرسة حفظ القرآن، فحفظه حين عمره سبع سنين، فتلقى العلم على علماء بلده، فاجتهد في أقل وقت حتى صلى بالناس إماماً وهو ابن ثماني سنين وكتب الحديث وهو ابن تسع سنين. (الخالدي، ٢٠٠٢م: ٣٤٣) وله شوق عميق ورغبة شديدة في طلب العلوم والفنون من النحو والصرف والبلاغة والتفسير والتاريخ وغيرها، فارتحل إلى الري والبصرة والكوفة والشام ومصر وغير ذلك من البلاد التي فيها العلماء الشهيرة والفضلاء الماهرة، و من أساتذته محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وأحمد بن منيع البغوي وأحمد بن حميد الرازي وأبو همام الوليد بن شجاع وأبو كريب محمد بن العلاء وغيرهم. وبعد ذلك رجع إلى بغداد واستوطن ببغداد وأقام بها إلى حين وفاته.

قسم الإمام الطبري ليله ونهاره بين التصنيف والتدريس والعبادة والنوم : فكان ينام قيلولة قبيل الظهر، ثم يصلي الظهر، ثم يشتغل بالتصنيف إلى العصر، ثم يخرج لصلاة العصر، ويجلس للناس في المسجد إلى صلاة المغرب، ثم يدرس الناس إلى صلاة العشاء، ويعود بعد العشاء إلى منزله، ويشتغل بالتصنيف، ولا يسمح لأحد بالدخول عليه إلا لأمر هام. (الخالدي، ٢٠٠٢م: ٣٤٥)

وكان الطبري قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظاً لكتاب الله -عز وجل-، عارفاً بالقرآن، بصيراً بالمعاني، فقيهاً بأحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، عارفاً بأيام الناس وأخبارهم. وكان من الأئمة الكرام الذي يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفة وفضله. (الحموي، ١٩٩٣م: ٦/٦٤٤٣)

توفي الإمام ابن جرير الطبري ٢٦ شوال ٣١١هـ على الصحيح، (الزحيلي، ١٩٩٩م: ص ٣٣). وذلك في عصر الخليفة العباسية مقتدر بالله (٨٩٥-٩٣٢ م)، ودفن في داره الكائنة برحبة يعقوب ببغداد، ((الحموي، ١٩٩٣م: ٤٠/١٨؛ ابن خلكان، د.ت: ١٣٢/٣م) وقيل أنه توفي عام ٣١٠هـ. (الذهبي، د.ت: ٢٠٥/١).

منهج جامع البيان عن تأويل القرآن للإمام ابن جرير الطبري

جامع البيان في تأويل القرآن (عمر بن رضا بن محمد راغب، د.ت: ١٤٧/٩) أو جامع البيان عن تأويل آي القرآن (البغدادي، ١٤٠٨هـ: ٤٨٠). أو جامع البيان في تفسير القرآن. (الزركلي، ٢٠٠٢م: ٦٩/٦؛ الأثري، د.ت: ٣/٣) المعروف بتفسير الطبري للإمام محمد بن جرير الطبري هو من أشهر التفاسير القديمة الذي كتبه على المنهج الجامع من

التفسير بالمأثور القائم على النقل والرواية والتفسير البياني القائم على اللغة والبيان. ولهذا يقوم منهجه على ثلاثة قواعد : الأثر، واللغة، والنظر. وله مميزات خاصة التي فصلته على التفاسير القديمة التي بين يديه من تفاسير التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم، كما كان بين يديه التفاسير البيانية، وهنا أقدم المنهج الذي سلك عليه المفسر العلام من خلال تفسيره القرآن الكريم كما يلي :

أولا : تفسير القرآن بالقرآن

علما منا بأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وكان الإمام الطبري حريصا على تفسير القرآن بالقرآن، فيجمع الآيات القرآنية المنتشرة في السور ولو تعددت وكثرت، فيفسر البعض ببعض، وهذا من أحسن الطرق لتفسير القرآن الكريم، قد أمثلاً تفسير الطبري بالآيات المفسرة التي فسر بها الآيات القرآنية التي بين يديها. و الأستاذ محمود شاكراً أقام جدولاً لهذه الآيات الذي يزيد على خمس صفحات أحيانا. (الخالدي، ٢٠٠٢م : ٣٦٦)

فمثلاً نجده في تفسيره لقوله تعالى : ﴿يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون﴾ (سورة البقرة : ٤٠) قال الطبري : فالمراد بالنعمة في قوله تعالى : ﴿اذكروا نعمتي﴾ هي نعمة الإيمان والإسلام، لأنه لا نعمة أفضل من الإسلام، والنعم الأخرى تابعة لها، واستشهد على هذا بقوله تعالى : ﴿يؤمنون عليكم أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين﴾ (سورة الحجرات : ١٧) وتذكير الله بهذه الآية من نعمه على لسان رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-، كتذكير موسى -عليه السلام- بنبي إسرائيل على عهده، الذي أخبر الله عنه أنه قال لهم، واستشهد على هذا بقوله تعالى : ﴿واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين﴾ (سورة المائدة : ٢٠) وقوله تعالى : ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ (سورة المائدة : ٧) قال الطبري : "المغضوب عليهم" هم اليهود واستدل بالآية : ﴿قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل﴾ (سورة المائدة : ٦٠) وقال : "الضالين" هم النصارى، واستدل بالآية الكريمة : ﴿قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل﴾ (سورة المائدة : ٧٧) وذكر في معناه أحاديث كثيرة. (الطبري، ٢٠٠٠م : ٩٠/١-٩٥) ثانيا : تفسير القرآن بالسنة المطهرة

إذا أمعنا النظر إلى تفسير الطبري يتضح لنا بأنه فسر القرآن الكريم بالسنة المطهرة، ويورد الأحاديث المتعلقة بالآية القرآنية في انكشاف معانيه بأسانيد كما يذكر طرق كل رواية مهما تعددت واختلفت. فمثلاً قوله تعالى : ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ (سورة الفاتحة : ٢) فسر المفسر العلام ابن جرير الطبري "رب العالمين" رب الجن والأنس، فاستشهد على قوله : ﴿رب العالمين﴾ عشرة أحاديث بشتى الطرق والرواية، ذكرها بأسانيدها، نذكر منها ثلاثة أحاديث وترك البواقي خوف الطوال وهي كما يلي : (الطبري، ٢٠٠٠م : ٧٤/١)

الحديث الأول : حدثني محمد بن سنان القزاز، قال حدثنا أبو عاصم، عن شبيب، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿رب العالمين﴾ : الجن والإنس.

الحديث الثاني : حدثني علي بن الحسن، قال: حدثنا مسلم بن عبد الرحمن، قال: حدثنا محمد بن مصعب، عن قيس بن الربيع، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قول الله -جل وعز- ﴿رب العالمين﴾ ، قال: رب الجن والإنس.

الحديث الثالث : حدثنا أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا قيس، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير: قوله: ﴿رب العالمين﴾ ، قال: الجن والإنس.

وفي تفسير قوله تعالى : ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ (سورة الفاتحة: ٧) جمع الطبري في تفسير "الضالين" أربعة عشر حديثا، وذكر كل حديث بالسند. (الطبري، ٢٠٠٠م: ٩٣/١-٩٦)

وجدير بالذكر بأن التفسير للطبري هو تفسير مملوء بالأحاديث المرفوعة حتى بلغ عددها سبعة عشر حديثا بالتمام، وهذه الأحاديث منتقاة من وسط أحاديث كثيرة، منها الصحيح المكرر، ومنها الحسن، ومنها الضعيف، ومنها المردود. (الخالدي، ٢٠٠٢م: ٣٦٧)

ثالثا : تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين

كان الإمام الطبري حريصا إلى أقوال الصحابة والتابعين في تفسيره للقرآن الكريم. وكان يورد أقوالهم مستندة، ويورد طرقا عديدة للقول الواحد، وإذا اختلفت أقوال الصحابة والتابعين في التفسير يوردها ويذكر أدلتهم وبراهينهم، ويرجح منها الرأي المناسب، ويستدل له.

فمثلا قوله تعالى : ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾ (سورة البقرة: ٢٣٨) فسر الطبري هذه الآية الكريمة وذكر فيها اختلاف الصحابة والتابعين في تعيين الصلاة الوسطى، وهي فيما يلي: (الطبري، ٢٠٠٠م: ١٦٩/٥)

(1) فقال بعضهم : هي صلاة العصر، وأورد فيها ثلاثة وأربعين أثرا، كله مستند، كما أورد ستا وعشرين طريقا ورواية لهذه الأحاديث المرفوعة التي صرح فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. (الطبري، 2000م: 198-5/182).

(2) وقال آخرون : هي صلاة الظهر، أورد فيها ثلاث عشرة رواية وطريقا. (الطبري، 2000م: 198-5/207).

(3) وقال البعض : هي صلاة المغرب، وهذا قول قبضة بن ذؤيب.

(4) وقال بعضهم : هي صلاة الفجر، وأورد سبع عشرة رواية وطريقا مستندة لهذا القول.

(5) وقال بعضهم : هي إحدى الصلوات الخمس، لا نعرفها بعينها، وأورد ثلاث روايات مستندة لهذا القول.

وبعد ذلك رجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، قال : والصواب من القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبار

عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي ذكرناها قبل في تأويله: وهو أنها العصر. (الطبري، ٢٠٠٠م: ٢٢١/٥)

وهكذا نرى بأن الإمام الطبري قد فسر الآية القرآنية بأحاديث مرفوعة وموقوفة، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، كما نرى أن الروايات التي أوردها في تفسيره مئة وتسع عشرة رواية وفق تحقيق محمود شاكر -رحمه الله- (الخالدي، 2002م: 372) رابعا : تفسير القرآن بلغة العرب

إدراكا منا بأن تفسير القرآن الكريم مبنى على ثلاثة أركان : الأثر واللغة والنظر. لقد كان الإمام الطبري متبحرا من اللغة العربية، متذوقا لأساليبها، فلذا نراه يفسر القرآن بلغة العرب من نحوها وصرفها وبلاغتها وبيانها واشتقاقها وتصريفها وشواهدا وتوجيهاتها بجانب النقول المأثور ويجعلها مرجعا موثوقا به عند تفسيره ويترجح بعض الأقوال على بعض.

فمثلا قوله تعالى : ﴿حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل﴾ (سورة هود : ٤٠) قال ابن جرير : اختلف أهل التاويل في معنى "التنور". فقال بعضهم : التنور وجه الأرض. وهذا قول ابن عباس وعكرمة والضحاك. وأورد أقوالهم بالأسانيد.

وقال بعضهم : هو تنوير الصبح، من قولهم : "نور الصبح تنويرا". وهذا قول علي بن أبي طالب. وأورد خمس روايات مستندة في ذلك. وقال بعضهم : "التنور" أشرف الأرض. والمعنى : وفار أعلى الأرض وأشرف مكان فيها بالماء. وهذا قول قتادة وأورد له روايتين مستندتين. وقال بعضهم : هو التنور الذي يختبئ فيه. وهذا قول ابن عباس والحسن البصري ومجاهد والشعبي والضحاك. وأورد عشر روايات مسندة لهذا القول.

ثم قال الإمام الطبري بعد أن يفرغ من هذا كله : وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله : (التنور) ، قول من قال : "هو التنور الذي يخبئ فيه"، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب، إلا أن تقوم حجة على شيء منه بخلاف ذلك فيسلم لها. وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به، لإفهامهم معنى ما خاطبهم به. (الطبري، ٢٠٠٠م: ٣٢١/١٥-٣١٧)

خامسا: تفسير القرآن بأشعار العرب

كان الإمام الطبري يفسر القرآن الكريم بأشعار العرب، لأنها ديوانهم، كما قال ابن عباس : إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدر ما تفسيره فليلتزمه في الشعر فإنه ديوان العرب. (البيهقي، ١٣٤٤ هـ: ٢٤١/١٠). وقال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. فنرى الطبري يرجع إلى أشعار العرب لاستخراج المعنى الأصلي. و من الأمثلة :

قوله تعالى : ﴿فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون﴾ (سورة البقرة : ٢٢) قال الطبري: والأنداد جمع ند، والند: العدل والمثل، كما قال حسان بن ثابت :

أتَهْجُوهُ وَلَسْتُ لَهُ بَنْدٌ؟ ... فَشَرَكْنَا لَخَيْرِكَمَا الْفَدَاءُ

يعني بقوله: "ولست له بند"، لست له بمثل ولا عدل. وكل شيء كان نظيرا لشيء وله شبيها فهو له ند. فنهاهم الله تعالى أن يشركوا به شيئا، وأن يعبدوا غيره، أو يتخذوا له ندا وعدلا في الطاعة. وأورد في هذا القول ست روايات مسندة. (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١٦٨)

ومثلا قوله تعالى : ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ (سورة الفاتحة :٦) قال الطبري: أجمعت الأمة جميعا على أن "الصراط المستقيم"، هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وكذلك في لغة جميع العرب، فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي: (الأستاذ مجيد طراد، ٢٠٠٣م: ٣٤٢).

أمير المؤمنين على صراط ... إذا اعوج الموارد مستقيم
يريد على طريق الحق. ومنه قول الهذلي أبي ذؤيب:

صبحنا أرضهم بالخيال حتى ... تركناها أدق من الصراط

والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى. ثم تستعير العرب "الصراط" فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته، والمعوج باعوجاجه. (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١٦٦)

سادسا : الاهتمام بالمسائل النحوية

علما منا بأن الإمام الطبري اهتم بالمسائل النحوية من خلال تفسيره، فيتعرض كثيرا لمذاهب النحويين من البصريين والكوفيين في النحو والصرف، ويوجه أقوالهم، تارة على المذهب البصري، والأخري على المذهب الكوفي، فمثلا قوله تعالى : ﴿قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين﴾ (سورة هود : ٤٠) قال الطبري : قال بعض الكوفيين، "الزوجان"، في كلام العرب: الاثنان. قال : ويقال "عليه زوجا نعال"، إذا كانت عليه نعلان، ولا يقال: "عليه زوج نعال". وقال بعض البصريين من أهل العربية : "الزوجين"، "الضربين"، والمراد بها الذكور والإناث. وقال آخر منهم: "الزوج"، اللون. (الطبري، ٢٠٠٠م: ١٥/٣١٧)

وفي قوله تعالى : القول في تأويل قوله: ﴿وكفلها زكريا﴾ (سورة آل عمران : ٣٧) بين الطبري قراءة قوله : "وكفلها" فقال : قراءة أهل الحجاز والمدينة والبصرة: (وكفلها) خففة "الفاء". بمعنى: ضمها زكريا إليه، اعتبارا بقول الله -عز وجل-: ﴿يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم﴾ (سورة آل عمران : ٤٤) وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفيين : (وكفلها زكريا) مشددة "الفاء"، بمعنى: وكفلها الله زكريا. ثم بين الراي الصواب عنده، فقال : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك هي قراءة من قرأ: (وكفلها) مشددة "الفاء"، بمعنى: وضمها الله إليه. (الطبري، ٢٠٠٠م: ٦/٣٤٥)

سابعا : موقفه من القراءات

إذا أمعنا النظر إلى تفسير الطبري نراه يذكر القراءات المختلفة، وإنه كان من علماء القراءات المشهورين حتى إنهم ليقولون عنه: إنه ألف فيها مؤلفا خاصا في ثمانية عشر مجلدا، ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك وشرحه، واختار منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور، وإن كان هذا الكتاب قد ضاع بمرور الزمن ولم يصل إلى أيدينا، شأن الكثير من مؤلفاته. (الذهبي، د.ت: ٤/٢٦) بين الطبري القراءات المختلفة، ثم ذكر رايه ورجحه على الأراء كله، فمثلا

وقوله تعالى : ﴿وقولوا للناس حسناً﴾ (سورة البقرة : ٨٣) قال الطبري : اختلفت العلماء في قراءة "الحسن". فقرأ عامة قرأة الكوفة غير عاصم : (وقولوا للناس حسناً) بفتح الحاء والسين. وقرأته عامة قراء المدينة : (حسناً) بضم الحاء وتسكين السين. وقد روي عن بعض القرأة أنه كان يقرأ : "وقولوا للناس " حسنى " على مثال "فعلى". فأختار الطبري قراءته بفتح الحاء والسين، على قراءته بضم الحاء وسكون السين. (الطبري، ٢٠٠٠م : ٢/٢٩٤)

وقوله تعالى : ﴿مالك يوم الدين﴾ (سورة الفاتحة : ٤) قال الطبري : القراء مختلفون في تلاوة (مالك يوم الدين) فبعضهم يتلوه " ملك يوم الدين "، وبعضهم يتلوه (مالك يوم الدين) وبعضهم يتلوه (مالك يوم الدين) بنصب الكاف. ولاخلاف بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب، أن الملك من "الملك" مشتق، وأن المالك من "الملك" مأخوذ. فتأويل قراءة من قرأ ذلك : (مالك يوم الدين)، أن لله الملك يوم الدين خالصاً دون جميع خلقه، الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكاً جبابرة ينازعونه الملك، ويدافعونه الانفراد بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية. فأيقنوا بقاء الله يوم الدين أنهم الصغرة الأذلة، وأن له دونهم، ودون غيرهم الملك والكبرياء، والعزة والبهاء، كما قال تعالى : ﴿يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار﴾ (سورة الغافر : ١٦) فأخبر تعالى ذكره أنه المنفرد يومئذ بالملك دون ملوك الدنيا، الذين صاروا يوم الدين من ملكهم إلى ذلة وصغار، ومن دنياهم في المعاد إلى خسار. (الطبري، ٢٠٠٠م : ١/١٤٨)

قوله تعالى : ﴿ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين﴾ (سورة الأنبياء : ٨١) فقرأ عامة قراء الأمصار (الريح) بالنصب على أنها مفعول لسخرنا المخدوف، وقرأ ذلك عبد الرحمن الأعرج (الريح) رفعا بالكلام في سليمان على ابتداء الخبر. فقال الطبري : والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها في ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه. (الطبري، ٢٠٠٠م : ١٨/٤٨٢)

ثامنا : موقفه من الإسرائيليات

وقد اعتمد أهل التفسير في حكاية أقاويل أهل الكتاب على قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي أباح به ذلك حيث قال : " بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار". (أحمد بن حنبل، ١٩٩٨م : ٢/١٤٩) ففي تفسير ابن جرير الطبري روايات إسرائيلية، يرويها بإسناده إلى كعب الأبحار، ووهب بن منبه، وابن جريج والسدي وغيرهم كما نراه ينقل عن محمد بن اسحاق. فمثلاً

قوله تعالى : ﴿قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً﴾ (سورة الكهف : ٩٤) يسوق هذا الإسناد : حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة قال : حدثنا محمد ابن إسحاق قال : حدثني بعض من يسوق أحاديث الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلم، مما توارثوا من علم ذى القرنين أن ذا القرنين كان رجلاً من أهل مصر، اسمه مرزبا بن مردبة اليوناني من ولد يونس بن يافث بن نوح. (الطبري، ٢٠٠٠م : ١٨/١٠٤)

وهكذا يكثر ابن جرير من رواية الإسرائيليات، ولعل هذا راجع إلى ما تأثر به من الروايات التاريخية التي عالجها في بحوثه التاريخية الواسعة. (الذهبي، د.ت: ١/١٥٤) ولكنه ذكر السند في كل رواية، وبذلك قد خرج من العهدة. تاسعا: موقفه من الأسانيد

إذا أمعنا النظر إلى تفسير الطبري نراه يذكر الروايات بأسانيدها كما هو مقرر في أصول الحديث بأن من اسند لك فقد حملك البحث عن رجال السند ومعرفة مبلغهم من العدالة أو الجرح، وبذلك قد خرج من العهدة. مثلاً قوله تعالى: ﴿وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (سورة البقرة: ٦٦) ففي تفسير "للمتقين" ذكر ابن جرير الطبري سبع روايات بأسانيدها، وهي كما يلي:

الأول: حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثمان بن سعيد قال، حدثنا بشر بن عمارة قال، حدثنا أبو روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: (وموعظة للمتقين)، يقول: للمؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعتي. الثاني: حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة قال، حدثني ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس في قوله: (وموعظة للمتقين)، إلى يوم القيامة. الثالث: حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: (وموعظة للمتقين)، أي: بعدهم. الرابع: حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة مثله. الخامس: حدثنا موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي: "أما موعظة للمتقين"، فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

السادس: حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: (وموعظة للمتقين)، قال: فكانت موعظة للمتقين خاصة. السابع: حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسن قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج في قوله: (وموعظة للمتقين)، أي لمن بعدهم.

وفي بعض الأحيان نجد أن ابن جرير يرد الرواية التي لا يثق بصحتها، ويصرح برأيه بما يناسبها كما يقول: "وفي أسناده نظر"، (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/٧٦) أو "وفي نقله نظر". (الطبري، ٢٠٠٠م: ١٨/١٠١) عاشرا: الاهتمام بدراسة آيات الأحكام

اهتم ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان في تفسير القرآن المسائل الفقهية حيث ذكر فيه أقوال العلماء ومذاهبهم مع بيان الرأي الصواب عنده الذي رجحه بالأدلة القيمة والبراهين الساطعة، فمثلاً

قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة النحل: ٨) نجد الإمام الطبري بأنه ذكر أقوال العلماء والفضلاء في حكم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير بالأسانيد، ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله أهل القول الثاني، وذلك أنه لو كان في قوله تعالى ذكره (لتركبوها) دلالة على أنها لا تصلح، إذ كانت للركوب للأكل - لكان في قوله (فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للأكل

والدفع للركوب. وفي إجماع الجميع على أن ركوب ما قال تعالى ذكره (ومنها تأكلون) جائز حلال غير حرام، دليل واضح على أن أكل ما قال (لتركبوها) جائز حلال غير حرام، إلا بما نص على تحريمه أو وضع على تحريمه دلالة من كتاب أو وحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فأما بهذه الآية فلا يحرم أكل شيء. وقد وضع الدلالة على تحريم لحوم الحمر الأهلية بوحيه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلى البغال بما قد بينا في كتابنا، كتاب الأطعمة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، إذ لم يكن هذا الموضع من مواضع البيان عن تحريم ذلك، وإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدل على أنه لا وجه لقول من استدلل بهذه الآية على تحريم لحم الفرس. (الطبري، ٢٠٠٠م: ١٧/١٧٢)

الحادي عشر : الجواب من السؤال المقدر تحت عنوان "فإن قال لنا قائل"

إذا أمعنا النظر إلى تفسير الإمام ابن جرير الطبري يتضح لنا بأنه أجاب السؤال المقدر تحت عنوان "فإن قال قائل". ففي جوابه استعمل لفظة "قيل". مثلاً

قوله تعالى : ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ (سورة الفاتحة : ١). قال الطبري : فإن قال لنا قائل : وما وجه إدخال الألف واللام في الحمد؟ وهلا قيل : حمدا لله رب العالمين؟ قيل : إن لدخول الألف واللام في الحمد، معنى لا يؤديه قول القائل "حمدا"، بإسقاط الألف واللام. وذلك أن دخولهما في الحمد منبئ عن أن معناه : جميع المحامد والشكر الكامل لله. ولو أسقطنا منه لما دل إلا على أن حمد قائل ذلك لله، دون المحامد كلها. إذ كان معنى قول القائل : "حمدا لله" أو "حمد لله" : أحمد الله حمداً، وليس التأويل في قول القائل : (الحمد لله رب العالمين)، تالياً سورة أم القرآن : أحمد الله، بل التأويل في ذلك ما وصفنا قبل، من أن جميع المحامد لله بألوهيته وإنعامه على خلقه بما أنعم به عليهم من النعم التي لا كفاء لها في الدين والدنيا، والعاجل والآجل. (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١٣٨)

وفي موضع آخر قال الطبري : فإن قال قائل : فإن ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ (سورة الفاتحة : ١) فاصل بين ذلك. قيل : قد أنكر ذلك جماعة من أهل التأويل، وقالوا : إن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وإنما هو : الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين ملك يوم الدين.

وفي قوله تعالى : ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ (سورة الفاتحة : ٦) قال : وفقنا للثبات عليه. فإن قال قائل : وأنى وجدت الهداية في كلام العرب بمعنى التوفيق؟ قيل له : ذلك في كلامها أكثر وأظهر من أن يحصى عدد ما جاء عنهم في ذلك من الشواهد. فمن ذلك قول الشاعر :

لا تحرمني هداك الله مسألتي ... ولا أكونن كمن أودى به السفر

يعنى به : وفقك الله لقضاء حاجتي. ومنه قول الآخر :

ولا تعجلني هداك المليك ... فإن لكل مقام مقالا

فمعلوم أنه إنما أراد : وفقك الله لإصابة الحق في أمري.

الخاتمة :

قد اهتم علماء الإسلام وفقهاء الأنام بتفسير القرآن الكريم وشرح غريبه وكشف دقيقه منذ العصر الأول وحتى هذه العصور المتأخرة ومنهم من كان يختص بشرح لفظه ومنهم من يزيد على المعنى ومن أقدمهم محمد بن جرير الطبري الذي جمع ما نقله الأصحاب الكرام في تفسير الآيات العظام ورتبه على شكل المصحف الكريم واكتشف فيه لما حواه الكتاب المجيد من تشريع وتهذيب، وأحكام وأخلاق، وتربية وتوجيه، وهو يبقى فينا جيلا بجيل لتفسيره العزيز وهو لا يزال بحرا لجا، يحتاج إليه من يغوص في أعماقه، لاستخراج كنوز القرآن الثمينة، واستنباط روائع القرآن وأساره. ومن نتائج البحث هي :

- اهتمام الإمام الطبري بالتفسير بالرواية.
- عنايته بآيات الأحكام وذكر الحكم فيها.
- اعتماده على أسلوب الترجيح أو التصحيح أو الجمع لكثير من الخلافات والوجوه التي يوردها.
- فادعو الله - عز وجل - أن ينفعنا وإياه في الدارين كليهما، والله لا يضيع أجر المحسنين.

المصادر والمراجع :

- السيوطي، جلال الدين، *الإتقان في علوم القرآن*، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1974م.
- الذهبي، الدكتور محمد حسين، *التفسير والمفسرون*، الناشر: دار الكتب الحديثة، د.ت.
- الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، *الأعلام*، الناشر: دار العلم للملايين، 2002م.
- ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر، *وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان*، بيروت: دار صادر، د.ت.
- الخالدي، الدكتور صلاح عبد الفتاح، *تعريف الدارسين بمناهج المفسرين*، دمشق: دار القلم، 2002م.
- الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي، *معجم الأدباء*، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1993م.
- الدكتور محمد الزحيلي، *الإمام الطبري شيخ المفسرين وعمدة المؤرخين ومقدم الفقهاء المحققين*، دمشق: دار القلم، 1999م.
- عمر بن رضا بن محمد راغب، *معجم المؤلفين*، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- البغدادي، أبو عبد الله محمد بن سعد، *الطبقات الكبرى*، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ١٤٠٨هـ.
- أكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثري، *المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري*، القاهرة: دار ابن عفان، د.ت.
- الطبري، محمد بن جرير، *جامع البيان في تأويل القرآن*، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، 2000م.
- الطبري، الإمام أبي جعفر بمحم بن جرير، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، *سنن الكبرى*، حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف النظامية، 1344هـ.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال، *الإتقان في علوم القرآن*، تحقيق: سعيد المندوب، لبنان: دار الفكر، 1996م.
- الأستاذ مجيد طراد، *شرح ديوان جرير*، بيروت: 2003م.
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، *مسند أحمد بن حنبل*، بيروت: عالم الكتب: 1998م.

ویژگی‌های ادبیات معاصر فارسی

(Features of contemporary Persian literature)

ড. মো. নূরে আলম*

Abstract: From the constitutional movement of Iran, the literature is now called 'contemporary literature'. The most important feature of contemporary literature is the emergence of new styles of poetry and the fundamental changes in its elements. Contemporary poetry and prose are like ancient horns of ancient literature. To find the root of the young seedling, one must discover its hidden characteristics. Contemporary poetry is like individual seedlings. The beginning of the contemporary period; The beginning of its history; The course and characteristics of literature and prose literature; The place of contemporary poets and writers, remarkable developments in Persian literature; Describe Contemporary Persian Literature; Transformation in the thought of contemporary Persian poets and writers; The strengthening of science, language, literature, culture and spirituality as a result of literature changes in this article. A description of the familiarity of Persian - speaking poets in this era with the new sciences and techniques of European nations; The publication of the newspaper; Translated by scientific, literary, historical texts of foreign languages, examining the involvement of European poets with different classes of people and the language and literature of both countries around the world in this article discussed. Expanding literature in terms of storytelling, novels, comparative literature, etc.; The beginning of the new age for the emergence of Nima in Persian poetry; Expanding the cultural elements of the contemporary world and highlighting the tendency of some Persian poets to European culture after the use of past Islamic culture is the purpose of this article. Types of contemporary Persian poetry; In addition to writing beautiful poetry in the style of predecessors in contemporary times; Expressing the talents, skills and interests of contemporary poets; Its specific rules and criteria in new poetry, introduction of new style poets and the characteristics of the poetry; The development of the printing industry under the influence of contemporary literature; Promoting journalism; Introduction to European Literature, Translating and publishing European literature; Transformation in the social sphere; Impact on prose and order; Prose easier; Changes in the content of literature; Fact of life; Social and political pain; Introducing new ideas in order and prose; Detail of humor and critical literature; Topics such as synonyms, dry and unfamiliar words, and difficult tasks eliminated from contemporary literature were included in this article. The written language closer to the human speech language; The critique of the ruling, new ideas in prose and order, dynamics, freshness and independence of contemporary poetry content, in line with the constitutional movement in the matters of the homeland, law, labor and contemporary poetry process after Nima, etc. were discussed in this article. Poets who fought the traditional principles and principles of Persian poetry and stepped in to change the view of poetry were introduced in this essay. A report on Iran's political and social developments from the pre -constitutional era with a review of the opening of new ways of modern Persian language and literature in the field of translation and "Characteristics of Contemporary Persian Literature" at this article was examined.

* সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

واژگان کلیدی: معاصر، ادبیات، نثر، نظم، نواندیشی، داستان کوتاه

مقدمه: ادبیات و هنر آمیزه‌ای از عواطف عرفانی انسان و احساسات معنوی انسان و تعاملات اجتماعی و محیطی، باورها، آداب و رسوم و کنش‌ها و واکنش‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه‌ای است و این هنر و ادبیات در همه ابعاد دخیل است. زندگی و جایگاه آن هنر است «حقیقتی اصیل، مقدس و نجات بخش که رسالتی فوق عینی و متعالی دارد و صد در صد انسانی است». ادبیات بیان جامعه است و آثار ادبی اسناد اجتماعی هستند و هنرمندان نیز دارای جایگاه اجتماعی خاصی هستند که بدون مخاطب صحبت نمی‌کنند و نوع ارتباط آنها با مخاطب تعیین کننده جایگاه و جایگاه اجتماعی آنهاست. نویسندگان و هنرمندان بزرگ معمولاً فیلسوفان، متفکران و عارفان برجسته‌ای هستند. زیرا ورود به دنیای هنر نیازمند عمق و تأمل قابل توجهی در این وادی است. نثر فارسی در عصر جدید و عصر معاصر که قلبش انقلاب مشروطیت است، با همه وقایع روزگار و جهت‌گیری عامیانه نثرنویسی، از مبارزه و رشد، تعالی و تداوم بیرون نرفته است، بلکه مدام تجدید شده است. از آن دمید و از آن استفاده کرد و از قوانین و روش‌های جدید جان بیشتری گرفت و در عرصه رقابت با شعر قوی‌تر شد. به وضوح می‌توان دریافت که نویسندگان عصر جدید ایران، هر کدام تحت تأثیر افکار، آراء و شرایط درونی و بیرونی سعی در بیان افکار و عقاید خود داشتند، حتی برخی از آنها با واژگان و واژه‌ها کار می‌کردند. آنها در مقایسه با آرایه‌ها به محتوا توجه زیادی نداشتند. همچنین برای آگاهی مردم و مخاطبان و درک محتوای آثار این دوره به تدریج از وزن نثر کاسته شده و نثر به زبان انسانی نزدیک‌تر می‌شود.

ادبیات ایران را از مشروطیت تا امروز، «ادبیات معاصر» نامیده‌اند. صنعت چاپ موجب شد که روزنامه نویسی گسترش یابد؛ ایرانیان با ادبیات اروپایی آشنا شوند؛ آثار اروپایی ترجمه و منتشر شود. ضمناً تأسیس دارالفنون هم در دگرگونی ادبیات مؤثر بوده است. در شئون اجتماعی تحوّل ایجاد شد و در شعر و نثر هم اثر گذاشت چنان که نثرها ساده شد. این تحولات بدین قرار است؛ (۱) زبان نثر به خلاف گذشته ساده شد و مثلها و اصطلاحات قصّه‌ها و زندگی مردم عادی به ادبیات راه یافت؛ (۲) محتوای ادبیات هم تغییر کرد. واقعیات زندگی، دردهای اجتماعی و سیاسی و افکار نو در شعر و نثر وارد شد؛ (۳) کار تحقیقات علیم در زمینه ادبیات و علوم نظری تحت تأثیر شرق شناسان ایجاد شد؛ (۴) طنز و لطیفه‌های انتقادی افزایش یافت و کسانی چون دهخدا این راه را هموار کردند؛ (۵) کلمات مترادف و خشک و نا آشنا و تکلفات سخت از ادبیات دور شد. همراه با این تحولات در نثر، در موضوع و سبک شعر فارسی هم تحولاتی ایجاد شد و مطالبی چون آزادی، وطن، قانون، کارگران و ... در آن مطرح شد و با قیام مشروطیت همراه شد. عشقی، لاهوتی، دهخدا، اشرف الدین حسینی و ایرج میرزا کوشیدند تا راهی نو در شعر بکشایند.

بعد از آن‌ها تقی رفعت، شمس کسمایی، جعفر خامنه‌ای و لاهوتی اشعاری فارغ از تساوی مصراع‌ها و قافیه بندی‌های معمول سرودند و سرانجام نیمایوشیج با سرودن افسانه در ۱۳۰۱ تحولی بزرگ ایجاد کرد و در ۱۳۱۶ ققنوس را سرود که فارغ از قید وزن، تخیل و قافیه بود. در این مقاله، زمینه ادبیات نوین فارسی؛ سهم شاعران و نویسندگان ادبیات معاصر فارسی؛ ویژگی‌های ادبیات معاصر فارسی؛ داستان کوتاه فارسی مدرن؛ نتیجه‌گیری و مراجع و غیره برجسته شده است.

زمینه ادبیات جدید فارسی:

مدرنیسم در ادبیات فارسی از نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شد. به ویژه در زمان سلطنت قاجار سلطان ناصرالدین شاه (۱۸۴۸-۱۸۹۶م) نهضت رنسانس در ایران آغاز شد. در این زمان، به دلیل سیاست‌های لیبرال نصیرالدین، مردم ایران این فرصت را پیدا کردند که با جمعیت اروپا ارتباط برقرار کنند. زیرا ناصرالدین شاه اولین فرمانروای خاندان قاجار بود که از اروپا دیدن کرد. او با دولت‌ها و سازمان‌های مختلف در اروپا قراردادهای مختلفی منعقد کرد (خان، ۵). اوضاع سیاسی ایران در آغاز قرن بیستم متلاطم بود. در اثر حماقت و نادانی، انسان عادی در تاریکی خرافه فرو رفت. آنها به دلیل تغییرات سیاسی ترسیده و مضطرب بودند. آنها مشتاق فرار از ناآرامی اداری بودند. تأثیر این مسائل در ادبیات جدید فارسی وجود دارد. ناصرالدین شاه در سال ۱۸۵۲م «دارالفنون» را تأسیس کرد. در آنجا به دانش آموزان علوم نظامی، انگلیسی، روسی و فرانسوی آموزش داده می‌شد. این اولین موسسه آموزشی در نوع خود در ایران بود. جوانان ایرانی که در این مؤسسات تحصیل کرده بودند، در مورد آموزش، فرهنگ و تمدن غرب و اروپا آگاهی یافتند و جذب تفکر مدرن شدند. ۴۲ دانش آموز در سال ۱۸۵۸م برای دریافت آموزش مدرن به اروپا فرستاده شدند. (منظور العلم خان، ۳۳) هدف نهضت رنسانس در ادبیات فارسی از بین بردن کلاسیک گرایی نبود، بلکه با تغییر شکلی تازه به آن بخشید. از جمله این تغییرات، تازگی موضوع، تازگی در شیوه یا سبک و سادگی زبان و روان بودن بیان و تولید ادبی به تقلید از غرب بود. این تلاش در اوایل قرن بیستم و در جریان نهضت مشروطیت ایران قوت گرفت.

ادبیات نوین فارسی:

جنبش مشروطیت ایران در سال ۱۹۰۵م جنبش ارتجاع و تحول فرهنگ جهانی، ایران را در قرن بیستم به شدت تکان داد. دوره ۱۹۰۵م تا ۱۹۲۱م اوج شکوفایی ادبیات جدید فارسی بود. تحولات ادبی جامعه‌ی ایران را از زمان امضای فرمان مشروطیت تا به امروز ادبیات معاصر می‌گویند. این دوره دوران ناآرامی سیاسی در ایران بود. در این مدت تغییرات سیاسی در ایران یکی پس از دیگری رخ داد. در مرکز این تغییر، برخورد رژیم‌های خودکامه با هنر، شاعران، نویسندگان و روشنفکران قرار داشت. تشکلهای و روزنامه‌های

مختلف ادبی در آن راه اندازی شد. نشریات ادبی مانند از جمله صور اسرافیل (۱۹۰۷ م)، بهار (۱۹۰۹ و ۱۹۲۰ م)، ارمغان (۱۹۱۹ م) و غیره قابل توجه هستند. این نشریات نقدی بر ادبیات کهن و ترجمه‌هایی از ادبیات اروپا منتشر کردند که تأثیر زیادی بر ادبیات جدید فارسی گذاشت.

ظهور نیروهای جدید در شرق‌شناسی، تلاش برای گسترش جهان‌شمولی ادبیات، کشف نکات جدید و بهره‌برداری از یافته‌های متفکران کشورهای دیگر موجب ظهور و گسترش ادبیات مدرن شده است. مهم‌ترین زمینه‌هایی که در گسترش و جهانی شدن این دانش مؤثر است، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از دوران پیش از مشروطیت است که متأثر از تحولات فراوانی بوده است.

علت به وجود آمدن ادبیات معاصر: دگرگونی‌های پی در پی و شتابناک سیاسی، روابط اجتماعی و فرهنگی ورود عناصری تازه در قلمرو اندیشه و آشنایی با مکاتب فکری و ادبی اروپا باعث شکل‌گیری ادبیات معاصر شد.

سهم شاعران و نویسندگان ادبیات معاصر فارسی:

برخی از شاعران سبک جدید نه تنها در عصر معاصر با شعر گفتن به سبک پیشینیان مخالف نیستند، بلکه شعر زیبایی و شایستگی سروده‌اند، مهارت و علاقه خود را بیان کرده‌اند. نیمایوشیج، احمد شاملو، نادر نادرپور، امیرھوشنگ، ابتهاج، نصرت رحمانی، سیاوس کسرایی، فروغ فرخزاد، اخوان ثالث، یدالله رؤیایی، اسماعیل خویی، علی باباچاهی، شمس لنگرودی، محمدعلی سپانلو، منوچهر آشتی، خسرو گل‌سرخ، سهراب سپهری، مفتون امینی، محمد زهری، سید علی گرم‌رودی و برخی دیگر از شاعران نوسرایان در این گروه حضور دارند.^۱

جمعی از شاعرانی چون تقی رفعت، جعفر خامنه‌ای، بانو شمس کسمایی و... بر ضد قواعد و اصول سنتی شعر فارسی قیام کردند. تقی رفعت و محمدعلی جمالزاده از نویسندگان مهم این دوره بودند. تقی رفعت از حامیان پرشور و جدی نوسازی ادبی و اجتماعی در ایران و سردبیر روزنامه تجدد تبریز بود. او با کار در مجلات تجدد و اسدستان (۱۹۲۰ م) و جمالزاده در نشریه کاوه کار کرد و ادبیات مدرن را ترویج داد (میرعابدینی، ۷۵) این شاعران در شعر از تغییر و توسعه دیدگاه گام برداشتند.

محمدعلی جمال زاده (۱۸۹۷-۱۸۹۲)، پدر ادبیات نوین فارسی، ایرانیان را با داستان کوتاه فارسی آشنا کرد. او استاد نثر ساده بود. او با استفاده از اصطلاحات عامیانه داستان‌های فارسی مدرن را برای مردم عادی قابل درک کرد. پس از دهخدا، جمالزاده اولین نویسنده‌ای بود که در نثر فارسی زمینه جدیدی را ایجاد کرد. او تصویر اجتماعی ایران معاصر را در کتاب «یکی بود یکی نبود» ارائه کرد. او در نوشته‌های خود از

^۱. دکتر سید سکندر عباس زیدی : <http://sedayeadab.blogfa.com/post/132>

هرج و مرج جامعه، دروغ، ریا، خودخواهی، درماندگی، خودسری، جانبداری، جنایت، مصرف مواد مخدر و غیره یاد می‌کند. استفاده از الفاظ عامیانه، واژه‌های متناسب با ذائقه و طبع مردم و سبک ساده از ویژگی‌های اصلی ادبیات او بود. او خودش راوی داستان‌ش است. او در هر داستان، آشفتگی اجتماعی، هرج و مرج سیاسی، ناهنجاری‌های مختلف را به زبان طنز توبیخ می‌کرد (خان، ۲۰).

فارسی شکر آست نوشته محمدعلی جمال زاده اولین داستان کوتاه منتشر شده به زبان فارسی مدرن به شمار می‌رود. با توجه به زمان آهنگسازی، درد دل ملا کربانعلی اولین اثر اوست. داستان درد دل ملا کربانعلی به نقد نظام اجتماعی کهن ایران می‌پردازد. (خان، ۲۵) دیگر داستان‌های کوتاه مدرن او عبارتند از؛ دوستی خاله خرسه (۱۹۱۵م)، مورد طنز سیاسی در رجل سیاسی است. در این داستان نیز مانند فارسی شکر آست نگاه منفی به وضعیت اجتماعی ایران بیان می‌شد. محتوای این داستان، جامعه آشفته، آشفته و بی‌ثبات عصر مشروطه ایران را توصیف می‌کرد.

صادق هدایت (۱۹۰۲-۱۹۵۱م) یکی از داستان نویسان مدرن فارسی است که به دنیای درونی شخصیت‌های داستان نگریست. شهود نویسی از ویژگی‌های ادبیات اوست. بی‌عدالتی نسبت به جامعه، بی‌عدالتی، نفرت از حاکم ستمگر از ویژگی‌های داستان‌های او است. (خان، ۳۸-۳۹) داستان‌های کوتاه قدرتمند او جوانان داستان کوتاه فارسی مدرن را مجذوب خود کرده است. (خان، ۹) تعداد کل داستان‌های صادق هدایت در چهار کتاب ۳۴ داستان کوتاه دارد. در کتاب داستان اول زنده بگور ۸ داستان وجود دارد. در هر یک از داستان‌های آن، یأس عمیق، کابوس، ناامیدی از زندگی یک فرد تنها که در راه مرگ است، بیان می‌شد. (خان، ۴۰) صادق هدایت یکی از مروجین برجسته سوررئالیسم در ادبیات ایران بود. فضای سوررئالیستی بارها و بارها در داستان‌های او بازگشته است. (خان، ۴۵).

شهرت هدایت بویژه ناشی از گروه چهارم آثار تخیلی او، یعنی آن مجموعه از داستان‌های اوست که روان داستان‌های هدایت است: بوف کور: سه قطره خون، زنده به گور، مردی که نفسش را کشت، عروسک پشت پرده، هوسباز، فردا، و خیلی دیگر. از نظر تکنیک کمی از این آثار ویژگی‌های مدرنیستی دارند ولی بیشترشان به رئالیسم سنتی نزدیک‌ترند. (کاتوزیان، ۴۸)

صادق هدایت در داستان‌های خود سبک زندگی و حس زندگی مردم عادی را با دلسوزی فراوان به تصویر می‌کشید. او تحول بزرگی را در سیر ادبیات فارسی از نظر ارائه داستان، سبک نگارش و مهارت ایجاد کرد. او دنیایی را در داستان خود خلق کرده است که در آن مردی وحشت زده از مرگ بر او مسلط شده است. (صبور، ۱۱)

جلال آل احمد (۱۹۶۹-۱۹۲۲) نثرنویس مدرن مشهور بود. او داستان کوتاه، رمان، داستان سفر، مقاله، زندگی‌نامه نوشت. او داستان‌هایی از غم‌ها و دردهای افراد پرمشغله ترتیب داده است. او مبارزه زندگی کارگران عادی را به تصویر کشیده است. او در نوشته‌های خود از زبان گفتار مردم عادی استفاده می‌کرد. (خان، ۱۰).

ترجمه راه جدیدی در زبان و ادبیات فارسی جدید گشوده است. در این دوره ادبیات فرانسه پیشرفت زیادی کرد. در نتیجه رمان ترجمه وارد فرهنگ ایرانی شد. به دلیل نفوذ آن، غوغایی در جامعه تحصیل کرده و آگاه به وجود آمد. در این مورد، ترجمه محمد بکر از رمان میرزا خسروی شمس و طغرا، رمان تاریخی فتوحات کورش کبیر و انتقام خواهان مزدک نوشته شیخ موسی کبودر جهانگیر و غیره قابل توجه هستند. این آثار متأثر از سبک نگارش الکساندرا دوما، اوزونسو و برناردان دوسان و غیره بوده است (خان، ۵-۶).

داستان کوتاه مدرن برای اولین بار از طریق ترجمه وارد ادبیات فارسی شد. نویسندگان ادبی مانند سعید نفیسی، پاینده شهرزاد، فرزاد، حکمت، گانی اعتصامی و... داستان‌های خوب ادبیات انگلیسی، فرانسوی، روسی و... را به زبان فارسی ترجمه کردند. داستان‌های ترجمه شده آنها برجسته‌ترین نقش را در مجله ادبی بهار ایفا می‌کرد. در ابتدا پیرو غرب بودند، اما پس از مدتی به هویت خود بازگشتند و خود را وقف آثار اصیل ایرانی به سبک مدرن کردند. (بهارلو، ۷-۸) شعر این دوره با پویایی و تازگی محتوا و طرح مسائلی همچون آزادی، وطن، قانون، کارگران توانست با جنبش مشروطیت همگام شود.

مهمترین عوامل مؤثر بر تحول ادبی ادبیات معاصر عبارتند از الف) آمدن صنعت چاپ به ایران؛ ب) گسترش روزنامه نویسی؛ ث) آشنایی ایرانیان با ادبیات اروپایی؛ ج) تاسیس مدرسه دارالفنون است. توسط زین العابدین مراغه‌ای، عبد الرحیم طالبوف، علی اکبر دهخدا و سید محمد علی جمال زاده در ادبیات معاصر با پیشگامی متحول می‌شدند.

تغییرهای حاصل در نثر دوره‌ای معاصر:

الف. در این زمان زبان نوشتاری در کتابها؛ گفتار انسان به زبان نزدیکتر می‌شود. یعنی تفاوتی بین زبان نوشتاری و گفتاری وجود ندارد.

ب. موضوع و محتوای نوشته‌ها نیز زیر و رو شد واقعیات زندگی و دردهای اجتماعی بحث درباره‌ی حکومت و اندیشه‌های نو بر فضای نثر و شعر تاثیر گذاشت.

ث. طنز و لطیفه‌های انتقادی در ادبیات این دوره افزایش یافت و کسانی چون دهخدا راه را برای نویسندگان روزنامه‌ها و مجله‌ها و داستان‌های خنده‌دار انتقادی گشودند.

ج. دیگر در نوشته‌ها از مترادف و واژه‌های خشک و ناآشنا استفاده نمی‌شد و بیان صریح به بلاغت‌های خسته کننده پایان می‌داد.

شعر معاصر پس از نیمه در شیوه ذیل ادامه یافت: الف) شعر آزاد یا نیمایی وزن دارد اما جای قافیه در آن مشخص نیست مثل مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری، قیصر امین پور؛ ب) شعر سپید که آهنگ دراد وزن عروضی ندارد. جای قافیه‌ها در آن مشخص نیست مثل علی موسوی گرمارودی؛ ث) موج نو که نه آهنگ دارد نه قافیه و نه وزن عروضی. شعر موج نو به دشواری و پیچیدگی مشهور است مثل احمد رضا احمدی.^۲

ویژگی‌های ادبیات معاصر فارسی:

بحث در مورد ادبیات معاصر مستلزم ریشه‌یابی واژه‌های معاصر و جستجوی معنای کلمه از فرهنگ لغت است. کلمه معاصر از کلمه عصر گرفته شده است. یعنی عهد و زمان و عصر. بنابراین معاصر یعنی زمان حال و عصر حاضر. ادبیات معاصر به ادبیات زمان حال اطلاق می‌شود. ادبیات معاصر فارسی گسترش زیادی یافته است. پایان امپراتوری قاجار و نهضت مشروطیت شاهد تجدید حیات دوران معاصر بود. بسیاری از ادبیات کهن به اولی می‌پردازد که هیچ ارتباط منطقی با دوران معاصر ندارد. قانون، آزادی، برابری، توسعه، تمدن، دانش، هنر از طریق تکامل اجتماعی در ادبیات معاصر ایجاد می‌شد. این جنگ علیه خرافات بود، نگرشی برای کمک به ستمدیدگان. این مسائل در ادبیات کلاسیک دیده نمی‌شود. بنابراین نویسندگان و شاعران به دنبال ساختار ادبی جدیدی هستند که مناسب مسائل معاصر باشد. شاعرانی چون اشرف الدین حسینی، عارفه قزوینی، میرزاده عشقی و ادیب الممالک فراهانی به این سبک شعر سروده‌اند. اهمیت این سبک نوشتاری در روندهای جدید اجتماعی نهفته است.

از نظر زبانشناسی از زبان روزمره مردم عادی آن زمان استفاده می‌کردند. در نتیجه واژگان فاخر و نامتعارف ادبیات از ادبیات معاصر حذف شد. از نظر فلسفی به مسائل سیاسی و اجتماعی اهمیت می‌دادند. سبک جدیدی از آهنگسازی به تدریج در شعر فارسی شکل گرفت و تغییر کرد. (سراجی و عیسی شاهی، ۱۰۶).

مهم‌ترین ویژگی ادبیات معاصر، پیدایش سبک‌های جدید شعر و تغییرات اساسی در عناصر آن است. تازگی زبان و قالب شعری، طرح مطالب نوین توجه به مسائل بشر امروز است. ادبیات منشور فارسی معاصر نوعی نثر واقع‌گرایانه است. سادگی و عمل‌گرایی به طور گسترده‌ای در این ادبیات حاکم است. این نویسندگان از زبان ساده عوام در ادبیات استفاده کرده‌اند. مجموعه چرند و پرند دهخدا نمونه به ارز آن است. ویژگی

^۲ مهدی پویان، گردآوری: مجله اینترنتی دلگرم؛ <https://www.delgarm.com/poetry-and-literature/115404>

ادبیات منثور فارسی مدرن این است که رئالیسم اروپایی قرن نوزدهم میلادی را به یاد می‌آورد. شرایط و موقعیت‌های اجتماعی، مسائل فردی و خانوادگی در این ادبیات در قالب رمان به کار رفته است. در این زمان از داستان‌ها و ادبیات اروپایی استقبال شد. (سراجی و عیسی شاهی، ۶۸).

رمان‌های اولیه فارسی در دوره معاصر با مضامین انتقادی احساسی، عاشقانه و عاشقانه به تقلید از ادبیات اروپا نوشته می‌شد. رمان‌هایی چون *تهران مخوف* از مشفق کاشانی و *زیبا* از محمد حجازی وجود داشت. علاوه بر این رمان‌ها، نوعی رمان به نام «رمان تاریخی» وجود داشت (سراجی و عیسی شاهی، ۶۹).

در دوران نهضت مشروطیت در ایران و در اوایل قرن حاضر، این داستان توسط شاخه‌ای از روانشناسی ادبی پیش رفت که در آثار ادبی صادق هدایت به اوج خود رسید. صادق هدایت جدای از سبک ادبی پویا و خوش ذوق، با به کارگیری اطلاعات و ویژگی‌های جدید، آثار ادبی بی‌دل و بی‌نظیری نوشت. مانند «بوفه کور»، «سه قطره خون»، «سگ ویلگرد» و غیره (سراجی و عیسی شاهی، ۶۹) او از عناصری مانند زبان، فرهنگ، ادبیات عامیانه، میهن پرستی، رئالیسم اجتماعی و کنایه استفاده کرد. آثار ادبی متفاوت از دیگران می‌باشد. جمالزاده با برجسته کردن روحیه طنز و مشکلات اجتماعی در کتاب «یکی بود یکی نبود» متمایز از ادبیات معاصر فارسی را غنی کرد. (سراجی و عیسی شاهی، ۷۰)

شعر معاصر فارسی با رویدادها و چالش‌های فراوانی پیش رفته است. از شاعران معاصر فارسی عارف قزوینی که شاعر طنزپرداز و سیاسی و ایرج میرزا که جسورانه مسائل سیاسی و اجتماعی را با زبانی ساده بیان می‌کرد، فرخی یزدی که ادبیات عامه پسند را بسط داده و... به ویژه مورد توجه است. میرزاده عشقی با شعر انتقادی و صریح، پروین اعتصامی با شعر اجتماعی و اخلاقی و محمدتقی بهار با شعر الهام بخش این روند را ادامه دادند. این شاعران نخستین شالوده ادبیات مشروطه را گذاشتند. (سراجی و عیسی شاهی، ۷۰). تغییراتی که در تمام جهان در طول جنگ جهانی دوم رخ داد و همه جنبه‌های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داد، در عرصه ادبیات نیز نقش مهمی ایفا کرد. داستان، رمان، ادبیات تطبیقی و غیره در حوزه‌های مختلف ادبیات گسترش یافته و با آمدن نیما دوران جدیدی در شعر آغاز شده است. مؤلفه فرهنگی جهان معاصر کم و بیش گسترش یافته است. برخی از شاعران فارسی، اردو و بنگالی این دوره از فرهنگ اسلامی گذشته بهره برده و به فرهنگ اروپایی نیز متمایل شده‌اند.

در میان شاعران معاصر، نیما یوشیج شاعری با کیفیت و سنت است. او را پدر شعر نو فارسی می‌گویند. او با ارائه اطلاعاتی در مورد بدنه اصلی اشعار عروض و قافیه، با فلسفه‌ای جدید، تحولی در ادبیات کلاسیک ایجاد کرد. او اشعاری مانند «قصه رنگ پریده»، «افسانه»، «خانواده‌ای سرباز» و ... را با سبکی جدید سروده است. شعر افسانه نیما در سال ۱۳۰۱ انتشار یافت سر آغاز شعر نو دانسته‌اند. سبک نوین شعر فارسی نیما یوشیج

مورد استقبال شاعرانی چون اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، احمد شاملو، منوچهر آتشی قرار گرفت. (سراجی و عیسی شاهی، ۷۱) شعر معاصر به دو دسته تقسیم می‌شود. شعر سنتی و شعر نو. به همین ترتیب شاعران معاصر را نیز می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. شاعران قدیمی و شاعران امروزی. دو مکتب فکری در ادبیات معاصر فارسی شکوفه شد:

۱) همسویی اندیشه‌های نو با ساختارهای متعارف: این موضوع ادامه شعر در دوره مشروطه و مرمت به شمار می‌رفت. مالک الشعراى بهار، رشید یاسمی، پروین اعتصامی و بعدها شاعرانی چون دکتر صورتگر و دکتر حمیدی را در این ژانر می‌توان دید.

۲) تغییر در سبک آهنگسازی با ظهور نیمایوشیج نشان می‌دهد. این ژانر شعر به «شعر نو» (شعر مدرن) معروف شد. در این سبک نویسندگی تغییری در زبان شعری، ادبیات و اندیشه وجود دارد. نتیجه یک تضاد بی‌سابقه با دوره‌های گذشته است. این سبک جدید از نگارش با زبان، اندیشه و محتوای متناقض بیان شده است. نیمایوشیج این موضوع را در سال ۱۹۲۲م با سرودن شعر «افسانه» مطرح کرد. در ظاهر این سبک نوشتاری بین شعر متعارف و سنتی با چتره تفاوت وجود داشت. (سراجی و عیسی شاهی، ۱۰۶-۱۰۷)

تقسیم دوره شعر نیمایی: عصر شعر نیمایی به چهار دوره تقسیم می‌شود:

۱. دوره‌ی اول از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ هـ.ش (آغاز حکومت محمد رضا پهلوی)؛ شهرت نیما بود و جنگ بر سر شعر نو یا کهنه.

۲. دوره‌ی دوم از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲؛ تأثیر نیما بر شاعران و انتشارات مجلات ادبی: روزگار نو، پیام نو و مجله‌ی سخن که محتوای آن‌ها نقد و تحلیل و چاپ آثار بود. اولین کنگره‌ی نویسندگان که به نیما تمایل داشتند تشکیل شد و شعر منثور (سپید) پیدا شد.

۳. دوره‌ی سوم از ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲؛ شعر نو عاشقانه (تغزلی) پیدا شد و زبان رمزگونه، ادبیات اجتماعی و حماسی پیدا شد که مورد پسند حکومت نبود. در این شعرها موضوعات غیر اخلاقی و بی‌ارزش و یأس و ناامیدی مطرح می‌شد و افکار غیر مذهبی در شعر پیدا شد.

۴. دوره چهارم از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ (انقلاب اسلامی)؛ دوره‌ی کمال جریان‌های ادبی بود. زبان شعر بارورتر و شفاف‌تر شد و مسایل اجتماعی کاملاً رواج یافت: مهدی اخوان ثالث و سهراب سپهری شعراى سنت‌گرا نیز حضور فعالی داشتند. پس از پیروزی انقلاب مضامین جدیدی با الهام از اسلام و انقلاب و عضوها فضای شعر را در برگرفت: شهریار، مهرداد اوستا، موسوی گرمارودی، حمید سبزواری (اینها به هر دو دوره متعلق بودند)، علی معلم، نصر الله مردانی، سلمان هراتی، قیصر امینپور، حسین حسینی و سپیده‌ی کاشانی اشعار جالبی سرودند.

داستان‌های کوتاه فارسی مدرن:

داستان کوتاه فارسی بخش بزرگی از ادبیات جدید فارسی را به خود اختصاص داده است. علاقه به شنیدن داستان یک ویژگی طبیعی انسان است. انسان‌ها پیشگام تمدن‌ها بوده‌اند، فرهنگ‌های پیشرفته را توسعه داده‌اند، خط‌ها را اختراع کرده‌اند، حماسه سروده‌اند، اما علاقه به گوش دادن به داستان‌ها کم نشده است. از دوران باستان تا دوران معاصر، بیشتر آنچه که بشر نوشته است، داستان کوتاه است. داستان کوتاه را کوچکترین فرزند ادبیات معاصر می‌نامند. (خان، ۱)

داستان کوتاه نوعی شکل داستان کوتاه است که به نثر نوشته می‌شود که عبارت آن روان و لطیف است. داستان کوتاه یک داستان کوتاه است تا یک رمان منشور، با تعداد کلمات حداکثر ۱۵۰۰ کلمه می‌باشد. داستان کوتاه یک رویداد مرکزی یا مرتبط دارد. (خان، ۳) به گفته رابیندرانات تاگور، داستان کوتاه شکلی کلامی از زندگی و درد کوچک است. (تاگور، ۲۶).

محتوای داستان کوتاه مدرن متنوع است، ارائه آن نیز متنوع و چند بعدی است. گاهی شخصیت، گاهی اتفاق، گاهی فقط فضا و ظرافت محور داستان کوتاه می‌شود. گاهی نحوه گفت و گو، گاهی زنده بودن روایت، گاهی دلالت بر داستان‌های کوتاه برجسته می‌شود. داستان کوتاه در ادبیات جهان در قرن نوزدهم به وجود آمد. اما داستان‌های کوتاه در دهه سوم قرن بیستم توسط محمدعلی جمالزاده در ادبیات فارسی ظاهر شد. (خان، ۳-۴).

داستان *کلیله و دمنه* ترجمه‌ای از متن سانسکریت هندی «پنجتنتر» پدر داستان کوتاه فارسی محسوب می‌شود. چاپ اول «پنجتنتر» به دستور انوشیروان امپراتور ساسانی (۵۳۱-۵۷۹م) از طریق پزشک شخصی خود «برزویه» از هند به ایران رسید. او آن را از سانسکریت به زبان پهلوی ترجمه کرد. در دوره عباسیان، ابن المقفع نویسنده عرب این کتاب را در سال ۷۵۰م به عربی به نام «کلیله و دمنه» ترجمه کرد. کلیله و دمنه به دستور فرمانروای ساسانی ابونصر بن احمد در قرن دهم از عربی به فارسی ترجمه شد و نام قبلی آن کلیله و دمنه باقی ماند. شاعر رودکی بعداً شکل شعری خود را داد. (سیف الاسلام و خان، ۱۱۲)

شاعر کاشفی در دهه پایانی قرن پانزدهم آن را به زبانی ساده با عنوان «انوار سهیلی» بازنویسی کرد. اما اکبر امپراتور هند (۱۵۵۶-۱۶۰۶م) به این امر راضی نبود. او به ابوالفضل، مؤلف عین اکبری، دستور داد تا نسخه اصلاح شده و بزرگ شده کتاب را منتشر کند. ابوالفضل نسخه اصلاح شده و بزرگ شده کتاب را به سرپرستی سلطان به عنوان عاثره دانش (سنگ دانش) منتشر کرد. این کتاب با هر نامی که منتشر شد، اولین قدم در داستان کوتاه فارسی بود. (عبد الستار، ۱۱۳) پس از «کلیله و دمنه» نام *گلستان* شیخ سعدی و *بهارستان* عبدالرحمن جامی را می‌توان نام برد.

تأثیر ادبیات معاصر در بنگلادش:

شاعران و نویسندگان مختلف بنگلادش تحت تأثیر ادبیات معاصر فارسی کتب متعددی نوشته و از فارسی به زبان بنگالی هم ترجمه نمودند که به عنوان گنجینه‌ای گرانبها از کلمات، معنا، حکمت، فلسفه، پند و غیره برای آیندگان به یادگار گذاشته است. استفاده از این منبع، نوشتن ادبیات و انتشار کتاب در پرتو آن برای نسل کنونی بنگلادشی‌ها آسان شده است. نویسندگان و ادبای بنگالی امروزی از آثار متأثر از فارسی شاعران و ادبای بنگالی الهام می‌گیرند. در پرتو این امر، علم، زبان، ادبیات و فرهنگ این کشور سعی در تقویت بعد معنوی دارد. نویسنده مشهور بنگلادش دکتر عبد الصبور خان بسیاری از کتابهای معاصر فارسی به زبان بنگالی ترجمه نمود.

در این دوره شاعران بنگالی و فارسی با علم و فنون جدید و پیشرفت کشورهای اروپایی آشنا می‌شدند، روزنامه چاپ می‌کردند و متون علمی، ادبی، تاریخی را از زبان‌های خارجی ترجمه می‌کردند، شاعران از هر مردم دو کشور با طبقات مختلف در ارتباط بودند. در این میان زبان و ادبیات هر دو کشور در حال شناخته شدن و محبوبیت در سراسر جهان است.

نتیجه: با توجه به بحث فوق می‌توان گفت که شعر معاصر دارای قواعد، معیارها و ویژگی‌های خاص خود است. در مقایسه با درخت منشعب شعر معاصر، نثر، ادبیات کهن، مانند نهالی جوان است. برای یافتن ریشه نهال جوان باید ویژگی‌های پنهان آن را بیشتر حفر کرد. شعر معاصر یک نهال منفرد است و ریشه‌های آن گیاه قدیمی‌تر به هم پیوند خورده است، موضوع مطالعه گسترده‌ای است. ادبیات جدید نه با انکار ادبیات کهن بلکه با استخراج آن از ادبیات کهن سرچشمه می‌گیرد. با تغییر دوران، نیازهای مردم نیز تغییر می‌کند. بنابراین ادبیات مدرن با توجه به نیاز مردم نوشته شده است. در آن اندیشه‌ها، غم‌ها، دردها، امیدها و انتظارات انسانی در ادبیات نوین فارسی جای گرفته است.

منبع و مأخذ:

- بهارلو، محمد. *داستان کوتاه ایران*. انتشارات هما، ۱۹۹۴.
- تاگور، رابیندرانات. *کلیات ربیندرانات*. *شونار تاری*. جلد دوم. انتشارات بیششابهاروتی، ۱۴۰۲.
- خان، عبد صبور. *برگزیده داستان‌های کوتاه جلاله آل احمد*. شرکت بین المللی انتشارات الهدی، ۲۰۰۶.
- خان، عبد صبور. *داستان‌های کوتاه فارسی مدرن: مضامین، اشکال هنری، زندگی تصویر شده و جامعه*. آکادمی بنگلا داکا، ۲۰۰۹.
- خان، عبد صبور. *برگزیده داستان‌های کوتاه صادق هدایت*. انتشارات شوبها، ۲۰۱۸.

منظورالعلم خان. / ایران مدرن. آکادمی بنگلا، ۱۹۹۳.
عبد الستار. گاهشماری ادبیات فارسی. بنیاد اسلامی، ۱۹۸۷.
سراجی و عیسی شاهی، دکتر طارق ضیاء الرحمن و دکتر محمد. تاریخ ادبیات فارسی. (مترجم). شرکت
بین المللی انتشارات الهدی، ۲۰۰۷.
سیف الاسلام و خان، ک. م. و محمد عبد الصبور. مجله آکادمی بنگلا. پیدایش و توسعه داستان کوتاه فارسی
مدرن. آکادمی بنگلا داکا، ۱۹۹۹.
صبور، شاکر. بوف کور. (مترجم). انتشارات رودلا، ۲۰۱۵.
قبادی، دکتر حسینعلی. بنیادهای نثر معاصر فارسی. پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۳
کاتوزیان، دکتر محمد علی همایون. صادق هدایت و مرگ نویسنده. نشر مرکز، ۱۳۸۴
میرعابدینی، حسن. صد سال داستان نویسی ایران. انتشارات حیدری، ۱۹۹۸
اطلاعات اینترنتی:

<http://sedayeadab.blogfa.com/post/132/>

<https://www.delgarm.com/poetry-and-literature/115404>

مقاومة العنف ضد المرأة في ضوء الإسلام: دراسة تحليلية

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ: একটি বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা

ড. মুহাম্মদ সোলাইমান *

প্রতিপাদ্যসার: পুরুষ আর নারীর সমন্বয়ে তাবৎ বিশ্বের সমাজব্যবস্থা পরিচালিত। উভয়েই পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য। কেউ কারো শত্রু নয়। কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থায় যুগে যুগে নারীরা অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার। জীবন নদীর প্রতি বাঁকে বাঁকে নারীরা শোষিত হয়। খুন, ধর্ষণসহ নানান নির্যাতনের কবলে পড়ে দিশেহারা নারীসমাজ। শত আইন করেও নারী নির্যাতন কিছুতেই রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। সৃষ্টিগত ভাবে পারস্পরিক বৈপরিত্ব থাকা সত্ত্বেও সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে উভয়ের গুরুত্ব অনিবার্য। নারী একাধারে মা, বোন, স্ত্রী, চাচী, ফুফী, দাদী, নানীসহ নানান পদমর্যাদায় বিভূষিত। কিন্তু সামাজিক মূল্যবোধের ক্রান্তিকালে নারীসমাজ প্রতিনিয়ত সহিংসতার শিকার হয়। ঘরে কিংবা বাইরে সর্বদা নিগৃহীত হয়। জাহিলি যুগে নারীরা নির্যাতিত হতো অতীব ভয়াবহতার সাথে। ছিল না কোনো তাদের সামাজিক মর্যাদা। পুরুষের ভোগের সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হতো। জীবন্ত কবর দেয়া হতো কন্যাসন্তানকে। পবিত্র ইসলাম নারী জাতিকে জাহিলিয়াতের নির্মমতা হতে মুক্ত করে সমাসীন করেছে মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে। বৈধভাবে মহরের মাধ্যমে বিবাহরীতি প্রতিষ্ঠা করে কদর দিয়েছে তাদের। সুখী ও কল্যাণময় দাম্পত্য জীবনের প্রতি অনুপ্রাণিত করে দিয়েছে দিকনির্দেশনা। কোনো ক্ষেত্রেই তারা যাতে সহিংসতা ও নির্মমতার শিকার না হয়, সে জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে বিধিবদ্ধ আচরণবিধি। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আল-কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্দেশনা। আলোচ্য প্রবন্ধে মহত্বপূর্ণ আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদীসের আলোকে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আমাদের করণীয় কী হওয়া উচিত তার একটি বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

التقديم:

الحمد لله الذي خلق الناس من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والصلوة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد

فإن العصر الحديث هو العصر الذي انكسرت فيه مرابطة الأسرة، وهلكت المواساة الاجتماعية بين الناس، حتي صاروا حاسدين بعضهم بعضا، وأن الإسلام كرم بني آدم كما قال الله تبارك وتعالى " ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا"¹ فالرجال والنساء مرتبطان بسلسلة واحدة، وهما أساسان قويان لبناء الأسرة. فسلامة الأسرة مدار عليهما. كما كرم الإسلام الرجال هكذا كرم النساء، وأقام حقوقهما بالعدل والإحسان، ولم يظلم على أحدهما ولو فضل بعضهم على بعض. فشرع القوانين التي تجعلهم مكرمة في موقعهم على حدة، وجعل بينهما مودة ورحمة واحتراما. ولكن العنف ضد المرأة يزيد هائلا في المجتمع الراهن في العالم حتي يرخي قيد الودة الأسرية، ويكسر الحياة الازدواجية بالطلاق آخرًا.

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

فالمرأة تكون مظلومة في كل مجال الحياة بالعنف الشديد، وتواجه الأخطار والمشاكل حتي كادت أن تنتحر أو تقع في الانتحار. هذا عار للإنسان والإنسانية. وينبغي لقواد المجتمع أن يأخذوا الخطوات لمقاومة العنف ضد المرأة كي تقيموا الراحة والسلامة بدورهم.

تعريف العنف لغة

العنف مثلثة العين: بالضم والفتح والكسر، وهو الشديد في القول والفعل، ضد الرفق، قال ابن منظور: "العنف: الخرق بالأمر، وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق، عنف به وعليه، يعنف عنفا وعنافة، وأعنفه، وعنفته تعنيفا، وهو عنيف إذا لم يكن رفيقا في أمره، واعتنفالأمر: أخذه بعنف، والتعنيف: التعبير واللوم"^٢
وقال الفيروزبادي: "العنف: مثلثة العين، ضد الرفق، عنف ككرم عليه وبه، وأعنفته أنا وعنفته تعنيفا، والعنيف من لا رفق له بركوب الخيل، والشديد من القول"^٣.
من هنا يتضح أن العنف في اللغة، يطلق ضد اللين والرفق.

قيل العنف هو "السلوك الذي يستخدم الإيذاء باليد أو باللسان أو بالفعل أو بالكلمة، في الحقل التصادمي"^٤.
وقال أحمد زكي البدوي تعريفا بالعنف " الإكراه أو استخدام الضغط أو القوة استخداما غير مشروع، أو غير مطابق للقانون، من شأنه التأثير علي إرادة فرد ما، أو مجموعة من الأفراد"^٥.

الآيات الدالة على نهي العنف ضد المرأة

إن الله تبارك وتعالى منع في القرآن الكريم في عدة مواضع عن قذف العنف والإيذاء تجاه المرأة، وأكد على تكريم المرأة، ونهي عن إيذائها. فمن تلك المنهيات
ينهي الله تعالى عن الإيذاء عمومًا حيث قال الله تبارك وتعالى: "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثما مبينًا"^٦
قال العلامة الألوسي في تفسير روح المعاني: "وعن الضحاك . والسدى . والكلبي أنها نزلت في زانة كانوا يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن وكانوا لا يتعرضون إلا للإماء ولكن ربما يقع منهم التعرض للحرائر جهلا أو تجاهلا لاتحاد الكل في الزي واللباس ، والظاهر عموم الآية لكل ما ذكر ولكل ما سيأتي من أراجيف المرجفين ، وفيها من الدلالة على حرمة المؤمنين والمؤمنات ما فيها"^٧.
ينهي الله تبارك وتعالى عن العنف ضد المرأة قولاً حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون"^٨. تؤكد الآية الكريمة على صون المرأة من الكلام الفاحش والبذيء والسخرية. إن الله منع المؤمنين والمؤمنات عن السخرية، لأن الناس عادة يسخرون بعضهم بعضا. فالسخرية هي من جنس العنف.

وينهي الله عزوجل عن إيذاء المرأة في سمعتها، وهذا أيضا من قسم العنف كما وعد الله تعالى بقوله: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون."^٩ فالآية الكريمة تبين على عظيم هذا الجرم ، لما فيه من عظيم الضرر على المرأة ، ولذلك كانت العقوبة عظيمة في حق من يعتدي على سمعة المرأة تناسب مع عظيم تلك الجريمة.

وينهي الله تبارك وتعالى أيضا عن الظلم وأمر المؤمنين بإقامة العدل عند التزويج حيث قال: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا).^{١٠}

قال الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: "وإن خفتم، يا معشر أولياء اليتامى، أن لا تقسطوا في صداقهن فتعدلوا فيه، وتبلغوا بصداقهن صدقات أمثالهن، فلا تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرهن من الغرائب اللواتي أحلهن الله لكم وطيبهن، من واحدة إلى أربع، وإن خفتم أن تجوروا= إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة= فلا تعدلوا، فانكحوا منهن واحدة، أو ما ملكت أيمانكم. وكان الرجل يتزوج العشر في الجاهلية فما دون ذلك، وأحل الله أربعاً، وصيرهم إلى أربع، يقول: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، وإن خفت أن لا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك."^{١١}

(ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين).^{١٢}

هذه الآيات الكريمة كلها تدل على عدم العنف ضد المرأة في كل مجال من الحياة، فلا ينبغي لكل فرد من المجتمع أن يعنفوا على المرأة، كي يكون المجتمع حسنا برابطة جميلة بين الرجال والنساء.

بل أشار القرآن الكريم على ذم قبيح القول في التعريض بسوء السمعة : كما جاء حكاية عن اليهود في قوله تعالى " يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا"^{١٣}

مكانة الرجل والمرأة في الإسلام

ينبغي لنا أن نتفهم أولا فضل الرجل والمرأة ومنزلتهما في ضوء الإسلام قبل الخوض في البحث. ونحن نعلم أن الأسرة الاولى بنيت بالرجل والمرأة يعني آدم وحواء عليهما السلام كما أشار اليه القرآن الكريم

١. «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا»^{١٤}

أمر الله تبارك وتعالى خلقه بتقواه، ونبه لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة، وهي آدم وحواء عليهما السلام، خلقت من ضلعه الأيسر، من خلفه ، وهو يائمه، فاستيقظ فرأها فأعجبته، فأنس إليها ، وأنست إليه.^{١٥}

٢. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى^{١٦}

يقول تعالى مخبرا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها، وهما آدم وحواء

٣. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة.^{١٧}
- يعني: النساء، خلق من آدم زوجته حواء. وقيل: "من أنفسكم" أي: من جنسكم أزواجا.
٤. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.^{١٨}
٥. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.^{١٩}
٦. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.^{٢٠}
٧. السارق والسارقة.^{٢١}
٨. الزانية والزاني.^{٢٢}

فنبت أنهما جزءان هامان في المجتمع الإنساني، وتبني الأسرة بهما. فالإسلام اهتم بالنساء وإن كن من قبله لمن المظلومين والمهملين، وأخرجهن من ظلمات الظلم إلى نور العدالة، وأقام حقوقهن الفردية، والأسرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والتعليمية والدينية. ولكنهن في هذا الزمان يقعن دائما أبدا في العنف الشديد بالبيئة الكراهية.

المرأة والأسرة

للمرأة دور كبير في بناء الأسرة وتحسينها، ولها ذمة عظيمة لصيانتها من التآكل والتدهور. فاهتم الإسلام بمكانة المرأة في الأسرة، والاجتماع، ودورها لحفظ العلاقة الأسرية. أما الحياة الأسرية تبدأ بالحياة الازدواجية، وهي تنثق بالمحبة والمودة، كما قال الله تبارك وتعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة"^{٢٣} فالنكاح يقيد الزوج والزوجة بقيد المودة والمحبة، والراحة والسلامة، وينمو بينهما الشخصية نموا كاملا، كي يعيشوا متممين ومساعددين عيشة راضية دون الوقوع في المصادمة والمشاجرة. قال الله تبارك وتعالى: "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"^{٢٤} قال العلامة سيد قطب في ظلال القرآن: فهي صلة النفس بالنفس، وهي صلة السكن والقرار، وهي صلة المودة والرحمة، وهي صلة الستر والتجمل. وإن الإنسان ليحس في الألفاظ ذاتها حنوا ورفقا، ويستروح من خلالها نداوة وظلا. وإنها لتعبير كامل عن حقيقة الصلة التي يفترضها الإسلام لذلك الرباط الإنساني الرفيق الوثيق.^{٢٥}

قال الشعراوي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: إن الآية هي الشيء العجيب الذي يقف عنده العقل مندهشا دهشة تورث إعجابا، وإعجابا يورث يقينا بحكمة الخالق. من هذه الآيات العجيبة الباهرة { أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني: من جنسكم ونوعكم. فلم يشأ سبحانه أن يحدث التكاثر مثلا بين الإنسان وبقرة، لا إنما إنسان مع إنسان، يختلف معه فقط في النوع، هذا ذكر وهذه أنثى، والاختلاف في النوع اختلاف تكامل، لا اختلاف تعاند وتصادم، فالمرأة للرق واللينة والحنان، والرجل للقوة والخشونة، فهي تفرح بقوته ورجولته، وهو يفرح بنعومتها وأنوثتها، فيحدث التكامل الذي أَرَادَهُ الله وقصده للتكاثر في بني الإنسان.^{٢٦}

وخص الاسلام المرأة بمكانة اجتماعية رفيعة وأعطائها أهمية كبيرة لما تتحمله من مشقة في حمل أبنائها وتربيتهم فقد قال سبحانه وتعالى: «ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا»^{٢٧}

"وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما* واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"^{٢٨}

أدلة تحريم العنف ضد المرأة في الإسلام بالقرآن الكريم:

ثبت تحريم العنف ضد المرأة بآيات عديدة كما ذكر في الذيل

قال -تعالى-: (وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا).^{٢٩}
إن ولي المرأة كان إذا زوجها فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها لا قليلا ولا كثيرا ، وإن كان زوجها غريبا حملوها إليه على بغير ولا يعطيها من مهرها غير ذلك فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى أهله.^{٣٠}
قال -تعالى-: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتينتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا).^{٣١}
حفظ الله تبارك وتعالى النساء من الظلم، وأقام حقوقهن منعا المؤمنين عن الوراثة جبرا وكرها .
قال -تعالى-: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه).^{٣٢}

قال -تعالى-: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف).^{٣٣}

قال -تعالى-: (وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا).^{٣٤}
قال -تعالى-: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما).^{٣٥}

قال -تعالى-: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين).^{٣٦}

تدل هذه الآيات الكريمة جميعا على تحريم العنف ضد المرأة، وأوضح الله تبارك وتعالى للرجال سبل السلام بحسن المعاشرة والمعاملات مع النساء بغير العنف عليهن، كي يدب في المجتمع نسيم السكونة والراحة، ويكون الناس ذا ثقافة عالية بإصلاح أخلاقهم الفضيحة. والجدير بالذكر أن المرأة كانت مهملة في الجاهلية، ليس لها قدرا في المجتمع، كانت سلعة تباع وتشترى، يتشاهم منها وتزدرى، تباع كالبهيمة والمتاع. ويقال بالاختصار ماكان لهن مكانا في المجتمع الجاهلي، بل كن مظلومات في أيدي الرجال حتي تبيح للوالد بيع ابنته، بل له حق قتلها ووأدها في مهدها، ثم لا قصاص ولا قصاص فيمن قتلها ولا دية، إن بشر بها ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون، أم يدسه في التراب. ولكنها احتلت منزلة رفيعة بعد طلوع شمس الإسلام. فالقرآن الكريم والسنة النبوية صلى الله عليه وسلم اهتمتا بها غاية الاهتمام حتي خرجت من ظلمات الجاهلية إلي نور الحضارة الإسلامية. فصارت المرأة أما محترمة، وزوجة مكرمة، وأختا

عزيرة، وبتنا شفيقة من صنوف المنزلة في الأسرة. وأنزل آيات متعددة في سور مختلفة، وليس هذا فحسب، بل أنزل الله فيها سورة كاملة منفردة باسم سورة النساء، وخصها بأحكام خاصة، وكرمها، وطهرها، واصطفها، ورفع منزلتها، ووعظها، وذكرها، وجعلها راعية ومسؤولة.

أدلة تحريم العنف ضد المرأة في الإسلام بالأحاديث الشريفة:

منع النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه الجليل أبا بكر الصديق رضي الله عنه من ضرب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

عن النعمان بن بشير، قال: استأذن أبو بكر رحمة الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها، وقال: ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر «كيف رأيته أنقذتك من الرجل؟» قال: فمكث أبو بكر أياما، ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتما في حربكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قد فعلنا قد فعلنا»^{٣٧} فيه دليل على دفع العنف ضد المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أبا بكر رضي الله عنه من ضرب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند ما غضبت ورفعت صوتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم.

تحضيض النبي صلى الله عليه وسلم علي حرمة المرأة وصيانة كرامتها:

عن سليمان بن عمرو بن الاحوص قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندهن ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إلا أن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حق فأما حقوقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون إلا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.^{٣٨} في هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بحسن المعاشرة مع النساء، وأذن لهم للمنع عن المجامعة إذا وقعن في الفاحشة، وهكذا أذن لهم للضرب غير جرح. فإن أطعن بعلهن فلا يجوز لبعولتهن أن يختاروا سبيل الظلم والعدوان عليهن، بل عليهم أن يحسنوا إلي أزواجهن في الكسوة والطعام.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وأن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا ".^{٣٩} قال القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري " (فاستوصوا) أي أوصيكم (بالنساء خيرا) فأقبلوا وصيتي واعملوا بها، قال الغزالي، وللمرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وأن يحسن خلقه معها قال: وليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها والحلم عن طيشها وغضبها اقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقد كان أزواجه يراجعنه الكلام وتهجره إحداهن إلى الليل قال: وأعلى من ذلك أن الرجل يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة فهي التي

تطيب قلوب النساء فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق حتى روي أنه كان يسابق عائشة في العدو فسبقته يوما فقال لها: هذه بتلك.^{٤٠} عن عائشة، قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا»^{٤١} وهذا دليل على تعامل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وأنه لم يضربهن أبدا، ولم تمتد يده إلى إحداهن حتى إن أغضبته وعصيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب واحدة من زوجاته أو ملك يمينه، بل كان نموذجا للرجل المسلم في كيفية حسن المعاشرة مع النساء.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما النساء شقائق الرجال» أي: نظائرنهم وأمثالهم في الأخلاق والطباع، كأنهن شققن منهم، ولأن حواء خلقت من آدم عليهما السلام.^{٤٢}

رفع النبي صلى الله عليه وسلم شأن المرأة، فروي عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»^{٤٣} فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب وخير مرب؛ لأن الأهل أحق بحسن الخلق من غيرهم. ولا ينبغي أن يكون حسن الخلق مع الناس، ويكون سوء الخلق مع أهله. وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن تكون مع أهلك حسن الخلق ومع غيرهم أيضا، لكن هم أولى بحسن الخلق من غيرهم. ولهذا لما سئلت عائشة: ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان في مهنة أهله. أي يساعدهم على مهمات البيت، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلب الشاة لأهله، ويخفف نعله، ويرقع ثوبه، وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون من خير الأصحاب لهم.

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ولدت له ابنة، فلم يدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها - يعني الذكر - أدخله الله بها الجنة»^{٤٤}

وهكذا اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم العنف ضد المرأة في عدة أحاديثه الشريفة، كي ينقذ النساء من أيدي الظالمين والطغاة، ويحفظ حرمتهم في المجتمع كاملا. فعلينا أن نكون من المهتمين بشأن العنف ضد المرأة.

العلاج النبوي صلى الله عليه وسلم لسد باب العنف

إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة لدفع العنف إلى طرق عديدة فمنها

١. **الرفق واللين** حضض النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الرفق واللين وترك العنف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا عائشة» إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه»^{٤٥}

عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه»^{٤٦}

فهذه قاعدة أساسية وعامة، فكل شيء يدخله العنف فهو مشين ! فالرفق بأن الإنسان يكون رفيقا بغيره، والرفق عكسه العنف، والعنف: الشدة. فحشنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخذ سبيل الرفق واللين اجتنابا عن العنف.

٢. النهي عن الضرب:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء بقوله عليه السلام " لا تضربوا إماء الله"^٧ وقد نهى عن ضرب النساء، فجاءه من يشكو إليه نشوز امرأته وتمرداها فرخص بشروطه قائلا في الذين يضربون زوجاتهم " ليس أولئك بخياركم"^٨ وقال في تبغيض هذا الفعل: فروي عن عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم أما يستحيي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخره أما يستحيي"^٩

3. النهي عن الغضب:

الغضب ينشأ العنف إلي من يغضب، فعلى المرء أن يحبس نفسه عند الغضب للاحتفاظ عن العنف، فروي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
٥٠"

إن الرجل الكريم يكرم زوجته في كل حال، كلا لا يخزيها أبدا. فأشار إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه فيما رواه ابن عساکر " ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم "^{١٠} فالكريم هو الذي يوقر النساء، ولا يسلمهن وينتهك حرمتهم، وأما اللئيم من يضيع حرمة النساء، ولا يحترمن، بل ربما يمد إليهن يد الظلم والشدة حتي يقتلن.

الخاتمة:

إني أقول في الخاتمة إن العنف ضد المرأة مرض قديم، لأنها ضعيفة جسما ونفسا، وبالعكس الرجل قوي طبعا ازاء المرأة. فالقوي يظلم الضعيف مدي الأيام، وهذا أمر عام، يجري عبر القرون قليلا كان أو كثيرا حتي الآن. فعلى سادة المجتمع أن يأخذوا خطوات لدفع هذه القضية المؤلمة الشديدة. فأخيرا أقدم بعض التوصيات لدفع العنف ضد المرأة كي تقام السلامة والراحة في المجتمع. فمنها أن يعلم الناس حكم الشريعة الإسلامية حول العنف ضد المرأة، ويخوفهم عقوبات الجنايات ليجتنبوا أنفسهم من الجرائم، وأن يعلم المرأة آداب الحياة الإسلامية خاصة أهمية الحجاب، وأهمية ضرر الاختلاط مع الرجال في العصر الراهن مباشرة أو بالانترنت، وأن يرغبهم إلى العلوم الإسلامية التي تنبهم حول العنف ضد المرأة في المؤسسات الدينية. وهكذا ينبغي لدعاة الإسلام أن يعظوا في خطبة الجمعة أرباب البنين والبنات ليحفظوا أولادهم عن سيطرة الاستعمار اليهودي والنصارى وغيرهم من الأمم الضالة والفرق الباطلة ، أو أن يقيموا حفلة مستقلة اسبوعيا أو شهريا ودوريا وسنويا في كل منطقة من البلاد. ويجب على حكام الدولة أن يؤكدوا تماما عقوبات المعنفين حيث يتعد المعنفون عن جريمة العنف في الأسرة، والمجتمع، والدولة. وأن ينفذوا الحدود والعقوبات التي تحمي المرأة من العنف الشديد ضدها.

مقاومة العنف ضد المرأة في ضوء الإسلام: دراسة تحليلية
ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রতি সংহিংসতা প্রতিরোধ: একটি বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা

১. القرآن : سورة الإسراء، الآية، ১৭ .
২. - ابن منظور، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، د ت)، ج ৯، ص. ২৫৮-২৫৭.
৩. - الفيروز أبادي، القاموس المحيط، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، ج. ৩، ص. ২২.
৪. خليل أحمد خليل، معجم المصطلحات الاجتماعية، (بيروت: دار الفكر، ১৯৯৫م)، ص. ২৮১.
৫. أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، (بيروت: مكتبة لبنان، ১৯৮৬)، ص. ৪৪১.
৬. القرآن: سورة الأحزاب، الآية، ৫৭ .
৭. الألوسي، شهاب الدين محمود ابن عبدالله الحسيني، روح المعاني، (بيروت: دار الكتب العلمية، ১৪১৫هـ)، ج. ১১، ص. ২৬৩.
৮. سورة الحجرات: ১১ .
৯. سورة النور: ৪ .
১০. سورة النساء: ৩ .
১১. الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ২০০০م)، ج. ৭، ص. ৫৩৯، ৫৩১.
১২. سورة البقرة: ২২২ .
১৩. سورة مريم: ২৮ .
১৪. سورة النساء: ১ .
১৫. ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، (بيروت: دار طيبة، ১৯৯৯م)، ج. ২، ص. ২০৬.
১৬. القرآن: سورة الحجرات، ১৩ .
১৭. سورة النحل: ৭২ .
১৮. سورة النحل: ৯৭ .
১৯. سورة التوبة: ৭১ .
২০. سورة النور: ২৬ .
২১. سورة المائدة: ৩৮ .
২২. سورة النور: ২ .
২৩. سورة الروم: ২ .
২৪. سورة البقرة: ১৮৭ .
২৫. سيد قطب، في ظلال القرآن، (مصر: دار الشروق، ২০১১م)، ج. ৭، ص. ২৩১.
২৬. الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي، (<http://www.mawsoah.net>)، ج. ১৮، ص. ১১৩৫৬.
২৭. سورة الأحقاف: ১৫ .
২৮. سورة بني إسرائيل: ২৩-২৪ .
২৯. سورة النساء: ৪ .

٣٠. علاء الدين علي بن محمد 'تفسير الخازن'، (بيروت: دار الفكر، ١٩٧٩م)، ج. ١، ص. ٤٧٧.
٣١. سورة النساء: ١٩.
٣٢. سورة البقرة: ٢٣١.
٣٣. سورة النساء: ١١.
٣٤. سورة النساء: ٧.
٣٥. سورة النساء: ١٢٩.
٣٦. سورة البقرة: ٢٣٦.
٣٧. أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، (بيروت: المكتبة العصرية، د.ت)، ج. ٤، ص. ٣٠٠.
٣٨. ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، سنن ابن ماجه، (بيروت: دار الفكر، د.ت)، ج. ١، ص. ٥٩٤.
٣٩. محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧م)، ج. ٥، ص. ١٩٨٧.
٤٠. القسطلاني، أحمد بن محمد المصري، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، (مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، ١٣٢٣هـ)، ج. ٨، ص. ٧٩.
٤١. ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، (المرجع السابق)، ج. ١، ص. ٦٣٨.
٤٢. العيني، بدر الدين محمود بن أحمد، شرح سنن أبي داود، (الرياض: مكتبة الرشد، ١٩٩٩م)، ج. ١، ص. ٥٢٧.
٤٣. أبو بكر البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣م)، ج. ٧، ص. ٧٧٠.
٤٤. ابن حنبل أحمد بن محمد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١م)، ج. ٣، ص. ٤٢٦.
٤٥. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، صحيح مسلم (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت)، ج. ٤، ص. ٢٠٠٣.
٤٦. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، صحيح مسلم (مرجع سابق)، ج-٤، ص-٢٠٠٤.
٤٧. أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، (بيروت: المكتبة العصرية، د.ت)، ج. ٢، ص. ٢٤٥.
٤٨. أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، (مرجع سابق)، ج. ٢، ص. ٢٤٥.
٤٩. أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٣هـ)، ج. ٩، ص. ٤٤٢.
٥٠. محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، (المرجع السابق)، ج. ٥، ص. ٢٢٦٧.
٥١. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الجامع الصغير، (بيروت: دار الفكر، د.ت)، ج. ٢، ص. ١٣٣.